ফাঁসীর মঞ্চে গেয়ে গেল যারা

ভারতের বিপ্লব কাহিনী

দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

২০৬, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

উৎসর্গ

পরম স্নেহভাজন

শ্রীমান দেবেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্যের

করকমলে—

ভূমিকা

ভারতের বিপ্লব কাহিনীর প্রথম খণ্ড পাঠকবর্গের সমাদর লাভ করিতে সমর্থ হওয়ায় দ্বিতীয় খণ্ড বাহির করিতে উৎসাহিত হইলাম। ইহাতে ১৯১৫ সালের ভারতরক্ষা আইনের প্রবর্ত্তন হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৪৬ সালের নৌ বিদ্রোহ পর্য্যন্ত মোটামুটি বিপ্লবযুগের ইতিহাস প্রদত্ত হইল। প্রথম খণ্ডের ন্যায় এই পুস্তকখানিও সাধারণের উপভোগ্য হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

প্রথম খণ্ডের কয়েকটি দোষ ত্রুটির উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজনীয় বোধ করিতেছি। প্রফুল্ল চাকী যে বাঙ্গলার প্রথম শহীদ তাঁহা বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যে প্রফুল্ল চাকীর জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রতাপচন্দ্রের পুত্র বীরেন্দ্রনাথ চাকী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় আরও কোন কোন বিষয় জানিতে পারিয়াছি, তাহা এখানে বিবৃত করা সঙ্গত বোধ করি।

প্রফুল্লের বাড়ী ছিল বগুড়া জেলারই শিরাগঞ্জ থানার অন্তর্গত বিহার গ্রামে। এখানেই তাহার জন্ম হয়, অনুমান ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে।

তাহার পিতার নাম ছিল রাজনারায়ণ চাকী ও মাতার নাম স্বর্ণময়ী। তাহার সহোদর ছিল দুইজন নয়, তিনজন—তাহাদের নাম প্রতাপচন্দ্র, জগৎ-নারায়ণ ও চারুচন্দ্র। প্রফুল্লই ছিল সহোদরদের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ। অনুমান ৫৬ বৎসর পূর্ব্বে এই মা স্বর্ণময়ী পরলোক গমন করেন। ইনিও খুব স্বদেশী ছিলেন, বিলাতী জিনিস বাড়ী আসিতে দেন নাই। প্রফুল্লের দুইজন সহোদরাও ছিলেন, কুসুমকামিনী ও সৌদামিনী। তন্মধ্যে কুসুমকামিনী এখনও জীবিতা, সহোদর-গণের মধ্যে সকলেই পরলোক গমন করিয়াছেন!

প্রফুল্ল যে স্কুলে পড়িত উহার নাম নামুজা জে, পি (জ্ঞানদা প্রসাদ স্কুল) এম, ই, স্কুল। উহা বুড়ীগঞ্জ মধ্যইংরাজী স্কুল নয়, নামুজা স্কুল, তবে

* 'কালিতলা' নয়, প্রথম খণ্ড ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠায় দেখুন।

নামুজার পোষ্টাফিস বুড়ীগঞ্জ বটে। ঐ বিদ্যালয় হইতে প্রফুল্ল মাইনর পরীক্ষার (ছাত্রবৃত্তি নহে) প্রথম বিভাগে পাশ হইয়া রংপুর জেলা স্কুলে গিয়া ভর্ত্তি হয়।

প্রফুল্ল যে খুব সাহসী ও বেপরোয়া ছিল তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ক্ষুদিরামকে সঙ্গে লইয়া প্রফুল্ল যখন মজঃফরপুর যায়, অল্পদিন পরেই কলিকাতা মুরারী-পুকুর গার্ডেনে একখানি পত্র লেখেন :

"শুকুদা,—

বর দেখিনি, কিন্তু বরের বাড়ী দেখেছি, বাড়ী খানি দেখ্‌তে বেশ। এখানে ভাল রসগোল্লা পাওয়া যায় না, ভাল রসগোল্লা পাঠাইবেন।"

সুরাট কংগ্রেসের পরেই শ্রীবারীন্দ্র শ্রীঅরবিন্দের কাছে যে চিঠি লেখেন, তাহাতেও লেখা হইয়াছিল :

"সর্ব্বত্র সন্দেশ পাঠাইতে হইবে।"

শুকুদার নামে লিখিত এই পত্রখানি শ্রীঅরবিন্দের স্কন্ধে ফেলিবার জন্য পুলিস অনেক চেষ্টা করে কিন্তু বিফল মনোরথ হয়।

প্রফুল্লচাকীর আত্মবলিদানের পরে কাশীধাম হইতে এক সন্ন্যাসী তাহার মাতাকে পত্র লেখেন :

"মা, প্রফুল্লের জন্য শোক করিবেন না। সে মরে নাই, সে অমর।"

প্রফুল্লের মৃত্যুর পরে মাথাটি গলা পর্য্যন্ত কাটিয়া সনাক্তের জন্য কলিকাতা পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এখন যে বাড়ীটি ৫৭ বি ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট্ বলিয়া (ডানলপ কোম্পানীর) পরিচিত, উহার পূর্ব্বের নম্বর ছিল ২৫ বি রয়েড ষ্ট্রীট্। এখানে রামসদয় বাবুর অফিস ছিল। শ্রীবারীন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির এখানেই স্বীকারোক্তি হয়। লোকপ্রমুখাত শোনা যায় এখানে যে পাইন গাছ আছে, এখানেই নাকি প্রফুল্ল চাকীর মাথাটি পুঁতিয়া রাখা হইয়াছে। এই জনশ্রুতি যদি প্রকৃত হয়, তবে স্থানটিকে "প্রফুল্ল স্মৃতিসৌধে" পরিণত করা কর্ত্তব্য। আর যদি এইরূপ উক্তি প্রকৃত না হয়, তবে একটি বিবৃতি প্রদান করিলেই, জনরব প্রবল হইবে না।

এই পুস্তকেও কিছু কিছু ভ্রমাত্মক উক্তি আছে। ১৭২ পৃষ্ঠায় একটি বীপরীত কথা আছে। কিন্তু আমার বক্তব্য ছিল যে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সংগ্রামটি ঠিক সময়োপযোগী বলিয়া অনেকের মনে হয় নাই। মুদ্রাঙ্কনের এই ত্রুটির জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত। অন্যান্য ভুলভ্রান্তিও সহৃদয় পাঠক নিজগুণে মার্জ্জনা করিবেন আশা আছে।

২৫০, পৃষ্ঠায় ফুটনোটে, জার্ম্মানীতে সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতার কথা আছে। ইহা পূর্ব্বে জার্ম্মেনীর স্থানে হওয়ার কথা ছিল। সহৃদয় পাঠক ত্রুটি ধরিবেন না।

এই গ্রন্থে আমি ইণ্ডিয়া লাইব্রেরী (যাহা এখনও ইম্পিরিয়াল লাইব্রের নাম পরিহার করে নাই) হইতেই যথেষ্ট সহায়তা পাইয়াছি। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ কৌন্সিলি মিঃ বি কে, চৌধুরী মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে কয়েকটি ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার কাগজ পত্র দিয়া বিশেষ উপকার করিয়াছেন। তজ্জন্য আমি তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ১৯০৮ সালে ট্র্যাঙ্ক খুন মোকদ্দমা ৩।৪ মাস ধরিয়া আলিপুর স্পেসাল ট্রাইবুন্যালে চালান। তাহাতে যতীন্দ্র নামক ব্যক্তির আদেশ মত, মৃণীন্দ্র, বিজয় ও নন্দ দেবব্রত নামক ব্যক্তিকে ধরিয়া গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলে এবং পরে একটি ট্রাঙ্কে পূরিয়া হাওড়া ষ্টেসনের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় দিয়া যায়। অতঃপরে যতীন বিবাহ করিতে বাগনান চলিয়া যায়। ঘটনা হয় শ্রীমান পঞ্চানন মালের সিঁথির বাগানে। পঞ্চাননও আসামী ছিল এবং তাহার পক্ষই দেশবন্ধু সমর্থন করেন। মোকদ্দমায় সকলেই মুক্তিলাভ করে।

আরও অনেক ঘটনা অনুক্ত রহিয়াছে। পরবর্ত্তী সংস্করণে হইলে দেওয়ার ইচ্ছা রহিল।

ইতিমধ্যে আমার পরম স্নেহাস্পদ ও আত্মীয় শ্রীমান সুধীর কুমার মিত্র "মহাবিপ্লবী রাসবিহারী" নামে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। রাস-বিহারী যে প্রকৃতই মহাবিপ্লবী সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াই আমি আমার এই বিপ্লবী ইতিহাসের প্রথমভাগ তাঁহাকে উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইয়াছিলাম। এখন

সুধীর কুমার যে উক্ত ব্যক্তির একটি বিস্তৃত জীবনী বাহির করিলেন, তাহাতে আমি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি। এই বহি খানিতেও আমার সাহায্য হইয়াছে।

মেট্রোপলিটান ইনসিওরেন্স কোম্পানীর আমার সহযোগী ও নিত্যসঙ্গী শ্রীমান অমূল্যভূষণ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমান শৈলেন্দ্রনাথ সেনের সহযোগিতা ব্যতীত সাহিত্য সাধনায় আমার অন্তরায় হইত। তাঁহাদের সহৃদয়তায় আমি তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

আমার বিশেষ স্নেহাস্পদ শ্রীমান ত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীমান রবীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত ও শ্রীমান সুশীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে অনেক বিষয়ে সহায়তা করিয়াছে। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও অনেক ঘটনা আমাকে বলিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। রাজনীতিক্ষেত্রে ভিন্নপন্থী হইলেও সুশীল কুমার এখনও আমাকে পূর্ব্বের ন্যায় শ্রদ্ধাপ্রদর্শনে বিরত হন নাই। ইহাদের ও শহীদ যতীন দাসের সহোদর শ্রীমান কিরণচন্দ্র দাসের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আমি একখানি ইংরিজী পুস্তক লিখিয়াছি। তাহাতে ঘটনাবলী যথাযথভাবে বিবৃত হইলেও, তখনও তাঁহার অবদান সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করিতে পারি নাই বটে, কিন্তু যত দিন যাইতেছে তিনি আমাদের মধ্যে স্বপ্রকাশ হইতেছেন। আমি এই পুস্তকে ভবিষ্য জীবনচরিতকারদের জন্য তাঁর সম্বন্ধে দেশবন্ধু শিষ্যগণের মতামত কিছু প্রকাশ করিলাম। কিছুদিন পূর্ব্বে আমি একখানি বাঙ্গলা জীবনচরিত লিখিতেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু এবার বোধ হয় তাহা আর হইল না। সবই শ্রীভগবানের ইচ্ছা।

বন্দেমাতরম

১২৪ ৫ বি রসারোড্ কলিকাতা

১৫ আগষ্ট ১৯৪৮

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

সূচীপত্র

দ্বিতীয় খণ্ড

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

ভারতীয় বিপ্লব ও ডিফেন্স অব্ ইণ্ডিয়া য়্যাক্ট

ভারতের বিপ্লব কাহিনী বিদেশী শাসনে নিপীড়িত এক বিশাল জাতির স্বাধীনতা লাভ প্রচেষ্টার কাহিনী। এত বড় ঘটনার বাহ্যিক প্রকাশ নানা ভাবে লোকের নিকট প্রকটিত হইলেও ইহার অন্তঃ প্রেরণা যে কি, সে সম্বন্ধে ধারণা-বোধ স্পষ্ট নয়। আমরা প্রথম খণ্ডে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। এখানে উহার পুনোরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবুও সংক্ষেপে দুই এক কথা বলিব।

বিপ্লবের ধারা ও ইহার আমূল ইতিবৃত্ত অনুধাবন করিলে কয়েকটি বিষয় স্পষ্টই প্রতিভাত হয়,—অত্যাচার ও পীড়নে লোকের মন এত তিক্ত হয় যে, প্রকাশ্যভাবে প্রতিবিধান করা সম্ভব নয় বলিয়া গুপ্তভাবে প্রতীকার করিবার প্রবৃত্তি দুর্ব্বার হইয়া উঠে। রাউলট কমিটির অনুসন্ধানকারীগণ ১৯১৯ সালে তাহাদের রিপোর্টে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, যে, বিপ্লবাত্মক কার্য্যের ফলেই দমন নীতি মূলক আইনের প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু শাসকগণের অনাচারের ফলেই যে বিপ্লবের সূত্রপাত ও পরিপুষ্টি হইয়াছে, তাহা তাঁহারা একবারও উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। আমাদের ধ্রুব ধারণা স্বশাসনের অধীনে বিপ্লব কিছুতেই সম্ভব হইত না। অত্যাচারের প্রকোপেই উহার উদ্ভব ও প্রসার হইয়াছে।

দ্বিতীয়ত :—হিংসাত্মক গুপ্ত কার্য্যাদিতে কতকটা গোলযোগের সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু স্বাধীনতা অর্জ্জন হয় না। বরং উহার ফলে অত্যাচার অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়া থাকে ; তথাপি স্বীকার করিতেই হইবে, যাহারা প্রাণতুচ্ছ করিয়া উচ্চ আদর্শের জন্য ঐরূপ মারাত্মক আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্বদেশানুরাগ, আত্ম-ত্যাগ এবং স্বাধীনতা স্পৃহা জাতির মুক্তি সাধনের পথে বিশেষ ভাবে ফলদায়ক

হইয়াছে। বস্তুতঃ কয়েকজন বিপ্লবীযুবক মৃত্যু ভয় উপেক্ষা করিয়া হেলায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিল বলিয়াই, অতঃপর অপর সার্থকনামা আন্দোলনে যাহারা যোগদান করিয়াছে, তাহারাও উক্ত নির্ভীকতায় যথেষ্ট অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছে।

তৃতীয়তঃ—মৃত্যুভয় উপেক্ষা করিয়া অপর কোন প্রকাশ্য আন্দোলনে মন প্রাণ সমর্পণ করিলে—এবং উক্ত আন্দোলন যদি বিপ্লবাত্মকও হয় তাহাতেও স্বাধীনতা লাভ সম্ভব। সুতরাং গুপ্ত আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইলেও, যাঁহারাএই বিপদ সঙ্কুল পথে পদক্ষেপ করিয়া হেলায় প্রাণবিসর্জ্জন দিয়াছেন, তাঁহাদের কাহিনীও জাতীয় ইতিহাসেরই অন্তর্ভুক্ত। তাই সংক্ষেপে তাঁহাদের পরিচয় দিতে প্রয়াস পাইব।

ভারতবাসীর স্বাধীনতা স্পৃহায় জন্মগত অধিকার। অতীতের কথা ছাড়িয়া দিলেও রাণা প্রতাপ সিংহ, ছত্রপতি শিবাজী, প্রতাপাদিত্য, কেদার রায় সীতারাম, সিরাজ, মিরকাশিম, মোহনলাল, মীরমদন সকলেই স্বাধীনতার জন্য প্রাণতুচ্ছ করিয়াছিলেন। ইংরেজের অত্যাচারের দরুণই সিপাহী বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। আর বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্যও ছিল ইংরাজ বিতাড়নই। দেশের সাহিত্যিক, কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার প্রথম হইতেই আমাদিগকে স্বাধীনতার বাণী শুনাইয়াছেন। সুতরাং স্বাধীনতার কথা আমাদের নিজস্ব, ধার করা জিনিষ নহে।

কিন্তু ইংরাজ ছিল আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, স্বাধীনতার বাণী তাহাদের কাছে ভাল লাগিবে কেন? আমাদের স্বাধীনতার অর্থই তাহাদের বিতাড়ন। সুতরাং স্বাধীনতার আন্দোলন দমন করাই অত্যাবশ্যক মনে করিয়া তাহারাও নিপীড়ন সুরু করিয়া দেয়। ১৮৯৭ সালের পুণার গোলযোগ হইতে ১৯৪৫ সালের ছাত্র আন্দোলন পর্য্যন্ত একই ভাবে এই ইতিহাসের ধারা চলিয়াছে।

বিংশ শতাব্দী শেষ হইবার পূর্ব্বেই ভারতীয়গণকে সম্পূর্ণ করায়াত্ত রাখিবার জন্যই ঘোর সাম্রাজ্যনীতি লইয়া লর্ড কার্জ্জন ভারতের শাসনভার গ্রহণ করে। আসিবার পরই সর্ব্বাগ্রে চাকুরীজীবী, ভাব প্রবণ, মধ্যবিত্তদিগের প্রতি তাহার দৃষ্টি

পড়িল। বিচক্ষণ কার্জ্জন দেখিতে পাইল বাঙ্গালী ছাত্র গীতা মুখস্থ করে, রামকৃষ্ণ দেবের কথা পড়িতে ভালবাসে, বিবেকানন্দের উপদেশবাণী আবৃত্তি করে, আর গিরিশ ঘোষের নাটকে ধর্ম্ম ও জাতীয়তার কথায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। সর্ব্বোপরি সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব তখন বাঙ্গালী যুবকের উপরে খুবই বেশী। ব্রজেশ্বর কেমন করিয়া লেফটেনাণ্ট ব্রানান্‌কে ঘুষি মারে, শান্তি কিরূপে মেজর টমাসকে ঘোড়া হইতে লাথি মারিয়া ফেলিয়া দেয়, 'বন্দেমাতরম' বলিতে বলিতে সন্তানগণ কিরূপে ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, বিমলা কিরূপে নিজহস্তে স্বামী হত্যার প্রতিশোধ লইয়াছিল; ভবানী পাঠক কিরূপে দল গঠন করিয়াছিল, প্রতাপ কিরূপে যুদ্ধে যাইয়া মৃত্যু আলিঙ্গন করেন, বাঙ্গালী যুবক আগ্রহের সহিত এসব প্রসঙ্গ আলোচনা করিত। এই খানেই ইংরাজের আশঙ্কা হইল ধর্ম্মের সহিত দেশপ্রীতির সংমিশ্রণে প্রমাদ ঘটিবে। তাই জাতীয়তার অঙ্কুর উচ্ছেদ করিতে ইংরাজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। সন্ধি-ক্ষণেই লর্ড কার্জ্জন বাঙ্গালীকে গালি দিয়া, বাঙ্গালী শক্তি খর্ব্ব করিবার উদ্দেশ্যেই বাঙ্গলা দেশ দ্বিধা বিভক্ত করিয়া দিল। আর বাঙ্গালীও যেন অপ্রত্যাশিত ভাবে আলস্য, নিদ্রা, জড়তা পরিত্যাগ করিয়া 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল। চণ্ডনীতিমূলক শাসনেই বাঙ্গলার প্রথম জাগরণ স্থরু হইল।

ইতিপূর্ব্বেই 'অনুশীলন' 'শক্তি' এবং 'বীরাষ্টমী' সঙ্ঘ গঠিত হয়। বাঙ্গালী লাঠি খেলা অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিল। এদিক হইতেও লাঠি চলিল, দোকান পাট লুণ্ঠিত হইল, হিন্দুর বিরুদ্ধে মোসলমানকে লেলাইয়া দেওয়া হইল। কড়া আইনের প্রবর্ত্তন হইল। বাঙ্গালী স্পষ্টাক্ষরে বুঝিল জাতি যত উদ্বুদ্ধ হইবে, চণ্ডনীতি ততই প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিবে। এবারেও দেখা গেল নির্দ্দোষীর প্রতি পুলিশের লাঠি প্রহার ও জোর করিয়া সভাসমিতি ভাঙ্গিয়া দেওয়াতেই গুপ্তভাবে প্রতীকারের ইচ্ছা একদল লোকের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিল। বারীন ঘোষের ও পুলিন দাসের বিপ্লব প্রয়াসও চণ্ডনীতিতেই সাফল্যের পথে চলিতে লাগিল। পালে সত্যই বাঘ পড়িল। অত্যাচারী ইংরাজ বিতাড়ন তাঁহারা ধর্ম্মানুমোদিত মনে করেন। দুর্ব্বৃত্তের সংহার করাই মহাকালীর প্রধান কাজ, বিষ্ণু কল্কি অবতাররূপে দশম

বারে ধরণীতে অবতীর্ণ হইয়া শত্রু সংহার করিবেন, আনন্দ মঠের দশভূজা শত্রু-মর্দিনী বীরেন্দ্র পৃষ্ঠ বিহারিণী মাতা বলরূপী কার্ত্তিকেয়কে সঙ্গে লইয়া ধরণীতে আসিবেন,—এই সব ভাব বিপ্লবীদল গঠনে সহায় হইল। বারীন্দ্র ও পুলিনের দল পরিপুষ্টি লাভ করিতে লাগিল। সত্য বটে অল্প দিন মধ্যেই বারীনের দল রাজ- দ্বারে অভিযুক্ত হইল, পুলিনের ঢাকার মৌসণ্ডীর ভূতের বাড়ী বিধ্বস্ত হইল, সমিতিগুলি নিষিদ্ধ হইল কিন্তু বিপ্লব বন্ধ করিবার কাহারও সাধ্য হইল না।

আইন গভর্ণমেণ্টের হাতে, সে কারণ চণ্ডনীতি মূলক আইনের প্রবর্ত্তন হইল। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করিবার প্রয়াস হইল, নেতৃবৃন্দ অন্তরীণে আবদ্ধ হইলেন কিন্তু বিপ্লব শক্ত করিয়া গেট হইয়া বসিল। কঠোর ভাবে সংবাদ পত্র দলন চলিতে লাগিল। দুইবৎসর পরেও আবার Indian Press Act of 1910 (ভারতীয় সংবাদপত্র আইন) পাশ হইল, কিন্তু তাহাও অকিঞ্চিৎকর মনে হইল। একটির পর একটি মোকদ্দমাও আরম্ভ হইল। ঢাকা ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা, রাজাবাজার বোমা ষড়যন্ত্র—কত মামলায় কত যুবক রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত হইল। আসামীদের অনেকেই দণ্ডিতও হইল বটে, কিন্তু ষড়যন্ত্রের মূলোচ্ছেদ হইল না। মোকদ্দমা, হাজত বাস, স্বীকারুক্তির জন্য প্রহার বা প্ররোচনা, বিপ্লব আন্দোলন বন্ধ করিতে সমর্থ হইল না। চণ্ডনীতি বিপ্লবের কণ্ঠরোধ করিতে পারে না,—বরং শক্তিবৃদ্ধি করে, ইতিহাসে এই সত্য আবার প্রমাণিত হইয়া গেল।

সেই ১৯১৩ সালের শেষ দিকে রাজাবাজারে বোমার খোল তৈয়ারী কারখানা এবং বিপ্লবাত্মক সরঞ্জাম পাওয়ার পর হইতে বিপ্লবাত্মক কাগজ পত্রাদি ও বোমার আকৃতি দিল্লী প্রভৃতি স্থানের অনুরূপ হওয়ায়, গভর্ণমেণ্ট সমস্ত দেশব্যাপী গুপ্তহত্যা মূলক আন্দোলনের সন্ধান পায়। ভারত সরকার বাঙ্গলার গভর্ণমেণ্টের সহিত একমত হইয়া তিন আইন অনুসারে (Regulation III of 1818) কতকগুলি লোককে ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে অন্তরীণে আবদ্ধ করিতে মনস্থ করে।

হাইকোর্টের তিনজন বিচারপতির অনুমোদন অনুসারেই ২৪ জনকে অন্তরীণে আবদ্ধ করা হয়।

ইহার পরে ইউরোপীয় মহাসমর আরম্ভ হয় এবং যুদ্ধের অজুহাতে আরও কতক-গুলি চণ্ডনীতি মূলক আইনের প্রবর্ত্তন করা হয়। ইহার প্রথমই সর্ব্বগ্রাসী ভারত রক্ষণ আইন, (Defence of India Act and Rules) ১৯১৫ সালের গোড়ায়ই ইহার তীব্রতা প্রকাশ পায়। আরও দুইটি আইন পাশ হয়—ইনগ্রেস ইনটু ইণ্ডিয়া অর্ডিনান্স, দ্বিতীয়, ফরেনারস্ অর্ডিনান্স।

এই বিশেষ আইনগুলির সহায়তায় গভর্ণমেণ্ট যে কত শত যুবককে বিনা-বিচারে ধরিয়াছে, কত উপার্জ্জনক্ষম লোককে আটকাইয়া রাখিয়া পরিবারগুলিকে অশেষ দুঃখ ক্লেশে নিপীড়িত করিয়াছে, কত নির্দ্দোষীকে নির্য্যাতনের একশেষ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সময়কার অনেক কথা প্রথম খণ্ডে দেওয়া হইয়াছে। তাথাপি পাঠকের সুবিধার জন্য অবশিষ্ট ঘটনাসহ একটী ধারাবাহিক বিবৃতি প্রদান করা সমীচিন মনে করিতেছি—

১৯১৪ সালে ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা ও ফরিদপুরে অনেকগুলি ডাকাতি হয়। তাহার কতক বিবরণ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে ২৬শে আগষ্ট রড়া কোম্পানীর এক গাড়ী অস্ত্রশস্ত্র লইয়া হাবু কেরানী যে অদৃশ্য হয়, তাহাই বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। কারণ উক্ত অস্ত্রশস্ত্রের সহায়তায়ই কয়েকটি ডাকাতি হয়—৭ই নভেম্বর চব্বিশপরগণার মামুরাবাদ ডাকাতিতে ১৭০০ টাকা লুট হয়।

১৪ ডিসেম্বরে উক্ত জিলার আড়িয়াদহে একটী ডাকাতিতে ৫০০৲ লুট হয়।

২৩শে ডিসেম্বর ময়মনসিংহ দ্বারকপুরে ২৩ হাজার টাকা লুট হয়।

কমাগাটা মারু এবং টাসা মারুর ব্যাপারেও শিখ্ ভ্রাতাগণের মন ক্রমেই উত্যক্ত হইয়া যায়।

২৩শে ডিসেম্বর ভবানীপুর চাউলপটি রোডে একজন ঘোড়দৌড়ের বুক্‌মেকার ও তাহার সহোদরকে আহত করিয়া বিপ্লবীগণ ৭৫০৲ লইয়া যায়। উক্ত দুই ভ্রাতা সন্ধ্যার পরে বাড়ী ফিরিতেছিল। বিপ্লবী যুবকগণের হাতে মশার পিস্তল ছিল।

এই বৎসরের সব ঘটনায়ই মশার পিস্তলের সহায়তা লওয়া হইয়াছিল। ১৯১৫ সালের গোড়ার দিকে সংঘটিত গার্ডেনরীচ, বেলিয়াঘাটা প্রভৃতি ডাকাতির যাবতীয় বৃত্তান্ত প্রথম খণ্ডে বিবৃত হইয়াছে। অতঃপর আড়িয়াদহের ডাকাতির বিবরণ প্রয়োজনীয়। ডাকাতিটি অনুষ্ঠিত হয় ৩রা আগষ্ট (১৯১৫)।

অন্যতম বিপ্লবী-নেতা শ্রীবিপিন গাঙ্গুলী মশার পিস্তল সহ কয়েকজন সঙ্গী লইয়া ডাকাতি করিতে যান। পানিহাটিতে চাউলের জনৈক মহাজনের বিল সরকার ক্ষেত্রমোহন পাল ঘটনার দিন ১০৮৫৲ টাকা লইয়া আগড়পাড়া যাইতেছিল। ক্ষেত্র পাল প্রতি সোমবারই আগড়পাড়া আড়তে টাকা লইয়া আসিত। ঘটনার দিন ষ্টেশন হইতে উক্ত সরকার যখন পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইবে, পথিমধ্যে বিপিনবাবু ও তাহার দলস্থ পাঁচব্যক্তি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। কতকগুলি বাগ্দী আসিয়া পড়ে। ধস্তাধস্তিতে বিপিনবাবু একটা গর্ত্তে পড়িয়া যান। উঠিয়া তিনি দৌড়াইতে থাকেন এবং দুই মাইল দূরে তাহার অনুসরণ-কারিগণ পিস্তল সমেত তাহাকে ধরিয়া ফেলে। ইতিপূর্ব্বেও বিপিনবাবুর দল ১৯১৫ সালের ৬ই এপ্রিল তারিখে আড়িয়াদহে একটী ডাকাতি করিয়া ৫০০৲ টাকা লুট করে। উভয় ডাকাতিতেই মশার পিস্তল ব্যবহৃত হয়।

এই মোকদ্দমার বিচার হয়, আলিপুর স্পেশাল ট্রাইবুন্যালে। বিচারক ছিলেন এ. জে. চোজনার, সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক ও গঙ্গানারায়ণ রায় (অবসর প্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেট্), বিপিনবাবুর পক্ষে উকীল ছিলেন উপেন্দ্রদাশগুপ্ত। বিচারে বিপিনবাবুর পাঁচবৎর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

মুরারী মোহন মিত্র নামে এক ব্যক্তি এই মোকদ্দমার সময়ে পুলিসকে বিশেষ সহায়তা করে। বিপিনবাবু ধৃত হইবার তিন সপ্তাহ মধ্যেই মুরারীকে তাহার বাড়ীতে কয়েক ব্যক্তি আসিয়া খুন করিয়া ফেলে। একজন কনেষ্টবল আততায়ীগণকে ধরিতে যাইয়া আহত হয়। অনুসন্ধানে ঐ বাড়ীতে কতকগুলি মশারগুলি পাওয়া যায়।

নদীয়া জেলায় প্রাগপুরে ডাকাতি হয়, আগরপাড়া ডাকাতির তিনমাস পূর্ব্বে ১৯১৫

সালের ৩০শে এপ্রিল। আশুতোষ লাহিড়ী, গোপেন্দ্র রায় প্রভৃতি ইহাতে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বিপ্লবীগণ কলিকাতা হইতে মশার পিস্তল, লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিবার অস্ত্র প্রভৃতি লইয়া যায়। ডাকাতি হওয়ার পরে তাহারা রাস্তা ভুলিয়া যায়। তাহারা অনেক দূর নৌকায় আসে এবং জনৈক পুলিস ইনস্পেক্টার সহ গ্রামের লোক তাহাদের অনুবর্ত্তী হয়। উভয় পক্ষ হইতেই গুলি ছোড়া হয়। ডাকাতদের একজন গুলির আঘাতে নিহতও হয়। তাহারা মৃতব্যক্তিকে নদীতে ফেলিয়া ও নৌকাটি ডুবাইয়া হাটিয়া জঙ্গলের মধ্য দিয়া অদৃশ্য হয়। এই মোকদ্দমায় আশুবাবু, ফণী রায় ও জনৈক সান্যালের ১০ বৎসরের ও গোপেন্দ্রবাবুর ৭ বৎসরের দ্বীপান্তর হয়।

শিবপুর ডাকাতিতে ২০৭০০ টাকা লুণ্ঠিত হয়। এই দল ছিল বরিশাল জেলার স্বামী প্রজ্ঞানন্দের। রেলওয়ে ষ্টেসনের প্রায় ৭ মাইল দূরে জলঙ্গী-নদীর পারে একজন ধনী ব্যবসায়ী বাস করিত। প্রায় ২০।২৫ জন বিপ্লবী ইলেট্রিক মশাল ও মশার পিস্তল লইয়া ঐ বাড়ীতে ডাকাতি করিতে আসে। টাকাকড়ি লুট করিয়া পলাইবার সময় গ্রামবাসী বহুলোক উভয় তীরে হাটিয়া তাহাদের অনুসরণ করে। বিপ্লবীরা গুলি ছুড়ে এবং একজন কনেষ্টবল ও তিন ব্যক্তি নিহত হয়। এতদ্ব্যতীত দশবারজন আহত হয়। নরেন ঘোষ চৌধুরী, সত্যগোপাল বসু, অনুকূল চাটার্জ্জি, ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, সুরেন্দ্র বিশ্বাস, যতীন্দ্র নন্দী প্রমুখ নয় জনই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ পায়।

এই উভয় মোকদ্দমায়ই চোজনার সাহেব, ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী উকীল এবং অন্য একজন ট্রাইবুন্যালের বিচারক হয়। শ্রীনিশীথ সেন, ৺শৈলেন্দ্র কুমার সেন, এ, এন সেন, (বর্ত্তমান হাইকোর্টের বিচারপতি) প্রভৃতি ব্যারিষ্টার থাকেন।

২রা ডিসেম্বর ৬৬নং কর্পোরেসন ষ্ট্রীটে মোটর ডাকাতি হয়, ফকিরচাঁদ দাস সেখানকার মালিক। কয়েকজন রিভলভার দেখাইয়া ডাকাতি করিয়া মোটরে পলায়ন করে। পচিশ হাজার টাকা লুট হয়। ডাকাতদিগকে ধরা যায় না। অতঃপরে ডাকাতির মাল হরদয়াল প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তির দখলে পাওয়ার জন্য আলিপুর স্পেসাল ট্রাইন্যালে তাহাদিগের বিচার হয়। বিচারক ছিলেন আলিপুরের

জজ স্মাইদার, প্রভাস মিত্র, হরিনাথ রায়। হরদয়াল, সূর্য্য, হীরালাল, পান্নালাল, বাবু সিং, যতীন রায় প্রভৃতি আসামী ছিল। হরদয়ালের ১২ বৎসরের কঠোর সাজা হয়। আরও ২।৩ জনেরও শাস্তি হয়।

এই বৎসরে পূর্ব্ববঙ্গেও অনেকগুলি ডাকাতি হয়। তন্মধ্যে ফরিদপুরে হয় তিনটি, কুমিল্লায় ছয়টি, ময়মনসিংহে পাঁচটি ও বাকরগঞ্জে একটি। বাকরগঞ্জে গাজীপুরে ১৫০০০৲ লুট হয় (৫ই জুন ১৯১৫), কুমিল্লার হরিপুরের ডাকাতিই (১৪ই আগষ্ট) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাতে ১৮০০০৲ লুট হয়। একজন হত ও তিন জন আহত হয়। ঐ জেলার করতলায় ২৯শে ডিসেম্বরে যে ডাকাতি হয় তাহাতে ১৫০০০৲ লুট হয় ও দুইজন নিহত হয়। ময়মনসিংহের ও চন্দ্রকোণা ডাকাতিই (৭ই সেপ্টেম্বর) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাতে একজন গ্রামবাসী নিহত হয় ও ৫ জন আহত হয়, আর লুট হয় ২১০০০৲ টাকা।

এই সমস্ত ডাকাতিতেই মশার পিস্তল ব্যবহৃত হয়।

এই বৎসরে কয়েকটি খুনও হয়। শরৎকুমার ঘোষ কুমিল্লা জেলা স্কুলের হেড্‌মাষ্টার ছিল। ১৯০৫ সনে সে ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টার ছিল এবং তখন স্বদেশী আন্দোলন ও বিদেশী-বর্জ্জনের সে বিশেষ বিরোধী ছিল। ক্রমে কর্ত্তৃপক্ষের সুনজরে পড়িয়া গভর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে হেডমাষ্টারের পদে নিযুক্ত হয়। ১৯১৫ সালে ঐ ব্যক্তি কুমিল্লা জেলা স্কুলের হেডমাষ্টার ছিল। একজন ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া সে ৩রা আগষ্ট যখন বাইরে বেড়াইতেছিল, তখন দুইটি যুবক মশার পিস্তল ছুড়িয়া তাহাকে মারিয়া ফেলে। হেড্‌মাষ্টারটি এখানে ছেলেদের সম্বন্ধে গুপ্ত সংবাদ মাজিষ্ট্রেটকে দিত বলিয়াই যুবকগণ তাহাকে হত্যা করে। ভৃত্যটিও নিহত হয়। দুই একজন আততায়ীদের অনুসরণ করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাহারাও গুলি খাইয়া ফিরিয়া আসে।

ইহার কয়েকমাস পরে ময়মনসিংহে পুলিসের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যতীন্দ্রমোহন ঘোষকে কয়েকজন যুবক মারিয়া ফেলে (১৯শে ডিসেম্বর) ইনি তখন একটি শিশুকে আদর করিতেছিলেন, শিশুটিও কালগ্রাসে পতিত হয়।

উত্তর বঙ্গেও কয়েকটি বিপ্লবাত্মক কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়।

২৩সে জানুয়ারী প্রায় ২৫ জন মুখসধারী লোক মশার পিস্তলের সহায়তায় রংপুরের কুড়ুল গ্রামে ৫০ হাজার টাকা ডাকাতি করিয়া লইয়া যায়। এবং কেহই ধরা পড়ে নাই। এই ডাকাতি তদন্ত করে অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ড নন্দকুমার বসু। ১৬ই ফেব্রুয়ারী তাহাকে কয়েকটি যুবক আক্রমণ করে। কিন্তু সে অক্ষত দেহে পলাইয়া যায়। তাহার আরদালী নিহত হয়।

২০শে ফেব্রুয়ারী নাটোরের ধরাইল গ্রামে ৩০।৪০ জন যুবক মুখোস ও মশার পিস্তলের সহায়তায় ২৫০০০৲ টাকা লুট করে। নাটোরে কয়েকজন দুর্দ্ধর্ষ বিপ্লবী থাকিত।

যুদ্ধের সময় যে বিপ্লবী দল জার্ম্মানী হইতে সহায়তা পায়, প্রথম খণ্ডে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া য়্যাক্টের বলে বিপ্লবাত্মক কার্য বন্ধ করিবার জন্যই কেবল চেষ্টা হয় না, আসামীদের কঠোর দণ্ড হইত। দুইতিন বৎসরের মধ্যেই দেশ একরকম উজাড় হইয়া যায়।

১৯১৬, ১৯১৭ সালে যুদ্ধও যেমন বলবৎ থাকে, ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া য়্যাক্ট এবং বিপ্লব আন্দোলন উভয়ই তেমনি প্রবল ভাবে চলে। এই সময় টের্গাট সাহেব বিপ্লব নিবারণকল্পে পুলিসের একচ্ছত্র কর্ত্তা, গর্ণমেণ্টের প্রধান সহায়। গভর্ণমেণ্টের কাছে তাহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি অসীম। কিন্তু যুদ্ধ যে প্রায় শেষ হইবার উপক্রম হইয়াছে; ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া য়্যাক্টতো সন্ধির সঙ্গেই পচিয়া যাইবে। চিন্তাকুল চিত্তে টের্গার্ট সাহেব অন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে মনস্থ করিল। ১৯১৬, ১৯১৭ সালে বাঙ্গলায় ধরপাকড়ের তীব্রতা কেন এত বৃদ্ধি পায় এবং অতঃপরে ১৯১৭ সালের শেষ দিকে টেগার্ট কি নূতন উপায় উদ্ভাবন করিল, সেই সব কাহিনী বলিবার পূর্ব্বে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বিপ্লব-আন্দোলনের ইতিহাও প্রাসঙ্গিক বিধায়, পাঠককে কিছুক্ষণের জন্য সেই দিকে লইয়া যাইব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলার বাহিরে বিপ্লব

বাঙ্গলার ন্যায় বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানেও বিপ্লবের ধারা প্রবাহিত হইয়াছে। মহারাষ্ট্রবাসীদের আন্দোলন সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আমরা যেমন মনে করিতাম—

"বিংশতি কোটি মানবের বাস
এ ভারতভূমি যবনের দাস
রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা
আর্য্যাবর্ত্তজয়ী পুরুষ যাহারা
সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা ?
জনকত শুধু প্রহরী পাহারা,
দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধা !"

ইহারাও সেইরূপ মনে করিত—

"হিন্দুস্থান ইংরাজের দাস হইয়া কেন থাকিবে, আমাদের কি ইংরাজের দাসত্ব করিতে লজ্জা বা অপমান বোধ নাই ? মর, কিম্বা মারিয়া মর।"

এই সব কথায় ইংরাজ উত্ত্যক্ত হইত। শিবাজী উৎসব উপলক্ষ্য করিয়া তাহারা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইত।

র‍্যাণ্ড আয়াষ্টের হত্যা, তিলকের কারাদণ্ড, নাথুভ্রাতাদ্বয়ের অন্তরীণ অবরোধ, দামোদর চাপেকারের মৃত্যুদণ্ড এবং বোম্বাইতে বিপ্লবের কাহিনী ইতিপূর্ব্বে বিবৃত করিয়াছি। শ্যামাজীকৃষ্ণ বর্ম্মা ও ম্যাডাম কামার সহিত বিনায়ক দামোদর

সাভারকারের সংযোগের কথা ও নাসিক যুদ্ধ ষড়যন্ত্র সম্বন্ধেও প্রথম খণ্ডে পাঠ করিয়াছেন কিন্তু এই শ্যামজীকৃষ্ণ বর্ম্মা ও মাডামের প্ররোচনায় আবার মাদ্রাজ প্রদেশস্থ অন্য বিপ্লবেরও নিবিড় সম্বন্ধ রহিয়াছে। এইখানে তাহার বিবরণটি প্রদান করিতেছি। শ্যামজী কৃষ্ণজী লণ্ডন ছাড়িয়া প্যারিসে উপস্থিত হইলে সেখানেও ভারতীয়গণের সঙ্গে বিপ্লব সম্বন্ধে সমান ভাবেই তিনি যোগাযোগ রাখেন। আর ম্যাডাম কামা প্যারিস হইতেই ইংরাজী "বন্দেমাতরম্" কাগজ বাহির করেন। শ্যামজী ও ম্যাডাম কামাই দুইজন বিপ্লবীকে পণ্ডিচারীতে পাঠাইয়া দেন। এবং অতঃপর মাদ্রাজ প্রদেশে উক্ত দুইব্যক্তির চেষ্টায় বিপ্লবের বীজ ছড়াইয়া পড়ে। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত ইতিহাস প্রয়োজন।

১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা কংগ্রেসে 'স্বরাজ' কথার অবতারণার পরে স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল বাঙ্গলার সর্ব্বত্র তাহা প্রচার করিয়া মার্চ্চ মাসে মাদ্রাজ আসিয়া স্বদেশী, বয়কট ও স্বরাজ সম্বন্ধে কতকগুলি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। মাদ্রাজবাসীগণ 'স্বদেশী' মন্ত্রে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হয়, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের তাহা বরদাস্ত হয় না। বিপিনবাবু মাদ্রাজে প্রায় দেড়-দুই মাস ছিলেন, কিন্তু লালা লাজপত রায়ের নির্ব্বাসনের খবর পাইয়া (১৯০৭ মে) তদ্দেশে তাঁহার প্রচার কার্য্য স্থগিত রাখিয়া দেশে চলিয়া আসেন। ইহার পরে কিংসফোর্ড সাহেবের আদালতে বন্দেমাতরম্ সংক্রান্ত বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দের মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করায় যে তাঁহার ছয়মাস জেল হয় তাহা সকলেই অবগত আছেন। বিপিনবাবু মাদ্রাজ-বাসীগণের হৃদয় জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহারা তাঁহাকে 'স্বরাজ-কেশরী' (**Lion of Swaraj**) বলিয়া আখ্যা দিয়াছিল।

১৯০৮ সালের ৯ই মার্চ্চ বিপিনবাবুর কারাবাস হইতে বাহিরে আসিবার দিন ধার্য্য হয়। ইতিপূর্ব্বেই মাদ্রাজের বিভিন্ন স্থানে বিপিনবাবু ও তাঁহার মতবাদ সম্বন্ধে সভা-সমিতি হয়। আর উক্ত ৯ই তারিখে চিদাম্বরম পিলে তিনেভেলিতে স্বরাজ ও ইংরাজ সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক বিষয়ই বর্জ্জন করিতে উপদেশ ও উৎসাহ দেন।

এই বক্তৃতা দেওয়ার তিন দিনের মধ্যেই চিদাম্বরম্ পিলে ও তাহার বন্ধু-সুব্রহ্মণ্য শিব ধৃত হ'ল। ফলে আন্দোলন এমন স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়া উঠে এবং পুলিশও উহা দমন করিতে এমন বদ্ধপরিকর হয় যে নানাস্থানে দাঙ্গা হয় এবং কোন কোন গভর্ণমেণ্ট বাটীএ আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। এই দাঙ্গার জন্য ২৭ জন লোকের কারাদণ্ড হয়। আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। দুই একখানি সংবাদপত্রও নিগৃহীত হয়। মাদ্রাজের 'ইণ্ডিয়া' কাগজের প্রকাশক ও মুদ্রাকরের দণ্ড হয় এবং মুদ্রাযন্ত্রটিও বন্ধ হইয়া যায়। ইহার পরেই পণ্ডিচারীতে কাজ আরম্ভ হয়। তিরুমল আচার্য্য "ইণ্ডিয়া" কাগজের অন্যতম লেখক ছিলেন, আর তাঁহার রচনায় বিশেষ তীব্রতা পরিলক্ষিত হইত। আচার্য্য অতঃপর লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসে গিয়া কিছুদিন অবস্থান করেন।

আচার্য্য প্যারিসেও গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে মাদ্রাজের লোকজনের চিঠি পত্রের আদান-প্রদান ছিল। ইতিমধ্যে শঙ্করকৃষ্ণ আয়ার এবং নীলকান্ত ব্রহ্মচারী (টেনেভেলি দাঙ্গা-মোকদ্দমার প্রথম আসামী) মাদ্রাজে একটী দল গঠন করে। এবং ১৯১০ সালের গোড়ায় ভাচি আয়ার এবং A. V. S. আয়ার পণ্ডিচারীতে যাইয়া একটী গুপ্ত সমিতি গঠন করেন। ইঁহারা Ashe প্রমুখ ইউরোপীয় দিগকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করেন। এই Ashe-ই তিনেভেলি চিদাম্বরদের মোকদ্দমার সময়ে উগ্রভাবে আন্দোলন দমন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল। ইহারা সকলেই আচার্য্যের মারফত ইণ্ডিয়া হাউসের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। আর ইণ্ডিয়া হাউসের এক নির্দ্দেশ ছিল ইউরোপীয় দিগকে হত্যা করিবার জন্য। ভেচি আয়ার ও তাহার আত্মীয় শঙ্করকৃষ্ণ আয়ার মিলিত হইয়া একটী রেলওয়ে জংসনে ১৯১১ সালের ১৭ই জুন তারিখে উক্ত মাজিষ্ট্রেট য়্যাস্ সাহেবকে হত্যা করে। ইহারই দুই দিন পূর্ব্বে ময়মনসিংহে গোয়েন্দা দারোগা রাজকুমার ব্যানার্জ্জি নিহত হয়। বাঙ্গলার ন্যায় মাদ্রাজেও বিশেষ ধরপাকড় চলিতে থাকে। হত্যা করিবার পূর্ব্বে ভাচি ও শঙ্কর প্রচার করে—

"ইংরাজকে দেশ হইতে বিতাড়িত কর, সনাতন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত কর,

রামদাসস্বামী ও শিবাজীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর। শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন, শিবাজী ও গুরু গোবিন্দের কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন কর"।

এই সময়ে সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জের ভারতাগমনের প্রস্তাব হয়। প্রায় তিন হাজার লোক তাহাদের প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাপন করিতে বদ্ধপরিকর হয়। ম্যাডাম কামার প্রবন্ধখানিতে অগ্নি বর্ষিত হইতে থাকে। তিনি প্যারিস হইতে তাঁহার সম্পাদিত "বন্দেমাতরম কাগজে শত্রু-নিধনে পাপ নাই "শত্রু-নিধন ভগবদ্গীতা অনুমোদিত", বলিয়া মত প্রচার করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে সম্রাটের অভিষেক উপলক্ষ্যে ভারতের বহু সম্ভ্রান্ত ও রাজন্যবর্গ লণ্ডনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ম্যাডাম কামা "বন্দেমাতরমে" জুলাই মাসে এই হত্যার সমর্থন করিয়া লেখেন—

"When guilded slaves from Hindusthan were parading the Streets of London as performers in Royal Circus and were prostrating themselves like so many clowns at the feet of the King of England, two young and brave Countrymen of ours proved by their daring deeds at Tenavally and at Mymensing that Hindusthan is not sleeping."

মিঃ য়্যাসের হত্যা ও রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ষড়যন্ত্রের (১২১ ক দণ্ডবিধি) মোকদ্দমার মাদ্রাজে বিচার হয়। ভাঁচি আয়ার ও শঙ্করকৃষ্ণ আয়ার প্রভৃতি নয় জনেরই দ্বীপান্তর হয়। তবে তাহারা য়্যাসকে খুন করিবার অভিযোগ হইতে অব্যাহতি লাভ করে।

পাঞ্জাব হইতে প্রধান বিপ্লবী রাসবিহারীর চেষ্টায় ও বিদেশবাসী হরদয়ালের প্রচার কার্য্যের ফলে কিরূপে পেশোয়ার হইতে সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারত বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এইবার বর্ম্মা ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করিব।

বর্ম্মা ষড়যন্ত্র

পাঞ্জাব এবং উত্তর ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যে সময় সিপাহী অভ্যুত্থানের কথা হয়, সেই ২১শে ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুরে প্রকৃতই একটী বিদ্রোহ হয়। সাত আট দিন পর্য্যন্ত বিপ্লবী সিপাহীগণ ইংরাজ সৈন্যদলের সহিত অকুতোভাবে যুদ্ধ করিয়াছিল। স্থানে স্থানে ইংরাজসৈন্যগণকে হটাইয়াও দিয়াছিল। কিন্তু সিঙ্গাপুর ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন, আবার অচিরেই ইংরাজের রণতরী এবং ইংরাজের মিত্র দেশের রণতরী আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল, তাই বাধ্য হইয়া বিপ্লবীদিগকে পলাইয়া বনজঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। ক্রমে সিঙ্গাপুরের ন্যায় ঘেরাও জায়গা হইতে পুলিশের পক্ষে তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলা সহজ হইল। যে দুই একজন অবশিষ্ট রহিল তাহারা বর্ম্মায় পলাইয়া আসিল।

বর্ম্মায় সেনাবারিকে আন্দোলন চলিতে লাগিল। এদিকে শ্যামরাজ্যেও শিখ এবং ভারতীয়গণের মধ্যে ষড়যন্ত্র চলিল। যেমন একদিকে শ্যাম হইতে বর্ম্মা আক্রমণের চেষ্টা হয়, অন্যদিকে আবার মোহনলাল ও হাসান খান ব্যাঙ্কক হইতে আসিয়া রেঙ্গুনের ১৬ নম্বর ডাফরিণ ষ্ট্রীটে বাস করেন এবং বর্ম্মার সিপাহিদের মধ্যে বিপ্লব-মন্ত্র প্রচার করাই তাঁহাদের প্রধান কাজ হইল।

মোমিওতে সোহনলাল গোলান্দাজ বাহিনীর সিপাহীগণকে বুঝাইতেছিলেন—

"কেন ভাই ইংরাজের জন্য প্রাণ দিবে, স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জনই একমাত্র কর্ত্তব্য"। *

---

* গিরিশচন্দ্রের 'চন্দ্রা' উপন্যাসে অবিকল এই চিত্র সন্ন্যাসী চরিত্রে পাওয়া যায়। সেই উপন্যাসের প্লটটিও ঠিক এই ভাবের—

উঠ, উঠ, উঠ, কি কর কি কর
ধর ধর ধর, ধর অসি ধর
মাতৃভূমি জয় জয় জয়
ধিক্ ধিক্ ধিক্ প্রাণে
ঘুচিল ঘুচিল ধর্ম্মকর্ম্ম তাপশুষ্ক নিহত মর্ম্ম
মজিল মজিল মান—
হা! হা! বক্ষে বাজে।

সিপাহীরা তাহার কথা শুনিল কিন্তু এক জমাদার তাহাকে ধরাইয়া দিল, তাহার কাছে তখন তিনটী পিস্তল ও ২৭০টি গুলি ছিল। সে পলাইবার বা জমাদারকে হত্যা করিবার কোন চেষ্টা করিল না। বিভ্রান্তের মত সে কেবল বলিতে লাগিল—

"আরে তুই আমার ভাই হইয়া ধরাইয়া দিবি? কেন ভুলিতেছিস্ আমি তোর ভাই! তুই কেমন ধারা ভাইরে, ভাই হইয়া ভাইকে ধরাইয়া দিবি?"

সোহনলাল সেদিন যেন এ জগতেরই ছিলেন না। আবিষ্টের মত তিনি ধরা দিলেন। তাঁহাকে জেলে আবদ্ধ করা হইল।

কিন্তু জেলে 'সরকার সেলাম' প্রভৃতি কোন অন্যায় আদেশ তিনি মানিতেন না। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিতেন "আমি ইংরাজ শাসনকেই অন্যায় জুলুম বলিয়া মনে করি, তাহার জেলের নিয়ম কিরূপে পালিব?"

বিচারে সোহনলালের মৃত্যুদণ্ড হয়, কিন্তু তদানীন্তন বর্মার লাটসাহেব তাহার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন এবং অনেক বুঝাইয়া তাহাকে ক্ষমা-ভিক্ষা করিতে বলেন, তাহাহইলেই প্রাণদণ্ড মৌকুফ্ হইবে আশ্বাস দেন। কিন্তু তিনি বলেন "ইংরাজের এখানে থাকিবার কি অধিকার আছে? আর দনমনীতিতো ইংরাজই চালাইতেছে, তাই ক্ষমা-ভিক্ষা করিতে হয় ইংরাজই করিবে।" পীড়াপীড়িতে যে ইংরাজ রাজপুরুষ আসিয়াছিলেন তাহাকে বলিলেন—

"ক্ষমা-ভিক্ষা করিতে পারি, যদি একেবারে ছাড়িয়া দাও—

রাজপুরুষ—এরূপ কথা দেওয়ার অধিকার আমার নাই।

সোহন—তবে আর দেরী করো না, তুমি তোমার কাজ কর, আমায়ও আমার কাজ করিতে দাও।

সোহনলাল বীরের মত ফাঁসিমঞ্চে আরোহণ করিলেন।

নাগপুর গ্রাস করিল, কেরোলি শ্রীভ্রষ্ট করিল, ঝাঁসি পদতলে দলিত হইল, প্রজার হাহাকারে গগন বিদীর্ণ হইল—কিন্তু কে সাহস করিয়া ক্রন্দন করতে পারিয়াছিলেন?

বর্ম্মায় কয়েকজন বিপ্লবী মুসলমান ১৯১৫ সালের অক্টোবর মাসে বকরীদের সময় বিদ্রোহ করিবার দিন নির্দ্ধারণ করে। তাহারা জানাইয়া দেয় এবার গো-ছাগলের পরিবর্ত্তে ইংরাজ বধে কোরবানী হইবে। তাহারা ইস্তাহার দেয়—

Wanted Brave Soldier to stir up Ghadr' Pay death ; Prize-martyrdom ! Pension—liberty; Field of Battle-India.
Get up and open your eyes. accumulate bags of money for Ghadr and proceed to India. Secrifice lives to obtain liberty.

এই অনুষ্ঠাণের দিন পরে ২৫ ডিসেম্বর করা হয়। কিন্তু সে সময় আর উপনীত হইল না। ইতি পূর্ব্বেই পোয়ে ব'তে ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হইল। সকলে ধরা পড়িল। মোকদ্দমার ফল পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মোকদ্দমায় যে তিন জন রাজসাক্ষী হয় তাহাদের নাম মূলসিং, নবাব খাঁ ও বিষয়ভূগ।

কমিসনারগণ ১৯১৬ সালের ৩১ জুলাই রায় দেন, তাহাতে সোহনলাল ব্যতীত হরনাথ সিং, কৃপারাম সিং, চালান সিং ও বাসুদেব সিং-এর ফাঁসি হয়। চৈতরাম, জগুল সিং, কাপুর সিং, হরদিত সিং, বদন সিং, প্রভৃতির এবং আরও দ্বাদশ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। জ্ঞানচাঁদ প্রভৃতি কয়েকজনের দীর্ঘ কারাবাসও হয়।

বর্ম্মাতে মুসলমানদের মধ্যেও বিশেষ অসন্তোষ বৃদ্ধি হয়। ১৯১৪ সালের শেষ দিকে, একটি বেলুচি সৈন্যদলকে দণ্ডস্বরূপ সুদূর বর্ম্মাতে পাঠাইয়া দেয়। ইহারা নাকি তাহাদের একজন উচ্চপদস্থ আফিসারকে খুন করিয়াছিল। এই সৈন্যদল 'গদর' সংবাদপত্রের বাণী প্রচার করিয়া বর্ম্মার মুসলমানদের মধ্যে অসন্তোষ ভাব বৃদ্ধি করে। ১৯১৫ সালের জানুয়ারী মাসেই সিপাহী এবং জনগণের উত্থানের কথা হয়। তবে গভর্ণমেণ্ট পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানের ন্যায় আগেই সন্ধান পাইয়া উহা বন্ধ করিয়া দেয়।

আলি আহমদ্ এবং কায়েম আলি মুসলমানদের লইয়া একটী গুপ্ত সমিতিও

করে। উহারা মুসলমান হেডমাষ্টারদের সহায়তাও পায় এবং নানা উপায়ে পিস্তলের আমদানী করে।

যাহা হউক কতক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার দরুণ, কতক ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া য়্যাক্ট ও ইনগ্রেস ইনটু ইণ্ডিয়া অর্ডিনান্সের বলে, বর্ম্মার গুপ্ত আন্দোলন সাময়িকভাবে দমন করা হয় বটে, কিন্তু অন্তর্প্রবাহ পূর্ব্ববৎ রহিয়া গেল।

মুলাসিং পূর্ব্বে সৈনিকের কাজ করিত। পরে মালয়, সাংহাই হইয়া বোর্ণিওদ্বীপের ম্যানিলা ও তৎপরে আমেরিকায় যায়। সেখানে সে কমাগাটা-মারুর বিবরণ শুনিয়া খুব উত্তেজিত হয়। পরে সে জাহাজে ভুগিতে ভুগিতে কলিকাতা হইয়া অমৃতসরে গিয়া ১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসে পৌছে। সেখানে রাসবিহারী কর্ত্তৃক বিদ্রোহে যোগদান করিতে উদ্বুদ্ধ হয়। রাস বিহারী তাহাকে একটি ত্রিবর্ণ পতাকার কথা বলে, লাল রং হইবে হিন্দুদের, নীলবর্ণ মুসলমানের জন্য আর সবুজ শিখদের জন্য। মুলা সিং রাজসাক্ষী হইয়া সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া দেয়।

এই সব ঘটনা লইয়া বার্ম্মা ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার উৎপত্তি। বিচার হয় মান্দালয়ে স্পেশাল ট্রাইবুন্যালের আদালতে। লাহোর ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার ন্যায় এক্ষেত্রেও হরদয়াল, রাসবিহারী, সুফী অম্বা প্রসাদ, অজিত সিং, বরকতুল্লা প্রভৃতি প্রধান বিপ্লবীদের কথাই উঠে। গদর পত্রিকা ও রামচন্দ্রের প্রচেষ্টা, মেভারিক জাহাজ প্রসঙ্গ, সমগ্র ভারতে রাসবিহারী বসুর একদিনেই বিদ্রোহ করার আয়োজন, কমাগাটামারু, পরে শিখগণের প্রত্যাবর্ত্তন ও শিখগণের অসন্তোষবৃদ্ধি, সেনাবারিকে সোহনলাল প্রভৃতির বিদ্রোহ করার চেষ্টা এই সবই ষড়যন্ত্রের (**Conspiracy**) আনুসঙ্গিক ঘটনা (**overt Acts**) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়

বাঙ্গলার ঘটনা ও রাউলট য়্যাক্ট

১৯১৬

জানুয়ারীর মাঝামাঝি দিকেই (১৬।১।১৬) মধুসূদন ভট্টাচার্য্য গোয়েন্দা দারোগাকে ৫২।১।১ কলেজষ্টিটে মেডিকেল কলেজের সম্মুখে বেলা দশটার সময় গুলি করিয়া মারিয়া ফেলা হয়। দুইটি যুবক এই হত্যাসাধন করে। একজনের হাতে ছিল মশার পিস্তল, আর এক জনের ওয়েলভি রিভালবার। ঘটনার পরে পাঁচজনকে ধরা হয়। কিন্তু অভিযোগের প্রমাণ যথেষ্ট না থাকায় তাহাদিগকে অন্তরীণে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। ইহারা বরিশালের দলভুক্ত ছিল।

ইহার পরেরই প্রধান ঘটনা বসন্ত চাটার্জ্জি ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডের খুন। ইতি পূর্ব্বে আরও দুইবার ইনি বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। তখন ইনি ছিলেন ইন্‌স্পেক্টার, তিনি তখন ঢাকায় গিয়াছিলেন। সেখানে রাত্রিতে একটি গোয়েন্দা উমেশ দে, ওরফে রামদাসের সঙ্গে বুড়ীগঙ্গানদীর তীরে রূপ বাবুর বাড়ীর সম্মুখে আলাপ করিয়া সংবাদ সংগ্রহ করিতেছিলেন। উমেশ পূর্ব্বে সমিতির সভ্য ছিল, পরে গোয়েন্দায় পরিণত হয়। দুইটি যুবক গিয়া তাহাকে খুন করিয়া ফেলে। বসন্তবাবু জলে ঝাঁপাইয়া পড়েন। তখন শ্রাবণ মাস, ভরা বর্ষা (১৯ জুলাই ১৯১৪)—সেখান হইতে অন্য একটি নৌকায় উঠিয়া প্রাণ রক্ষা করেন। এই ঘটনার পরে বসন্ত-বাবুর উন্নতি হয়। যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে হত্যাকারী বোধ হয় কৃষ্ণচন্দ্র সাহা ছিল।

ইহার পরে মুসলমান পাড়া লেনের ঘরে বসিয়া বসন্তবাবু ঐ বৎসরেই (২৫ নভেম্বর ১৯১৬) অন্যান্য ইনস্পেক্টরের সঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন। বৈঠক খানায় দুইটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। ইনি বাঁচিয়া যান, কিন্তু হেড কনেষ্টবল নিহত হয়।

এই মোকদ্দমায় বিক্রমপুরের বানারী গ্রামস্থ কৃষ্ণজীবন সেনের পুত্র নগেন্দ্র সেন-গুপ্ত ধরা পড়ে ও হাইকোর্টের স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল (স্যার লরেন্স জেঙ্কিন্স, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এর বিচারে) মুক্তিলাভ করে। স্যার আশুতোষ পুলিসের কার্য্য কলাপের উপর তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন। নগেন্দ্রের বিরুদ্ধে একটি প্রমাণ ছিল বসন্তবাবু ২৪ নভেম্বর আলিপুর ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে নাকি এই যুবককে তাঁহার অনুসরণ করিতে দেখিতে পান। নগেন্দ্র মুক্তিলাভ করিয়া বিলাত চলিয়া যায়। অতঃপর ভবিষ্যতে তাহার সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার আছে।

যাহা হউক আসল ঘটনার দিন বসন্তবাবু ১৯১৬ সালের ৩০শে জুন তারিখে সন্ধ্যার সময় আফিস হইতে শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রিট দিয়া বাইসিকেল করিয়া নিজ বাসা ৫২।৩ হরিশ মুখার্জ্জি রোড়ে যাইতেছিলেন। অমনি কয়েকটি যুবক তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া মশার পিস্তল লইয়া শিবমন্দিরের নিকটে গুলি ছুড়ে। বসন্ত বাবু সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। তাঁহার সঙ্গে যে আরদালী ছিল, সেই লোকটিও ভীষণভাবে আহত হয় এবং পরে হাঁসপাতালে আসিয়া মৃত্যুমুখে পতিতহয়। ঘটনার সময়ে আই, বি, দারোগা বিলাস ঘোষ এক রসি দূরে ছিল। অনুসন্ধানে জানা যায় অনুশীলন সমিতির পাঁচ জন্য সভ্যের দ্বারা এই বিপ্লব কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। এই ঘটনার পরে নরেন শেঠ উকীল, তাহার সহোদর নৃপেন শেঠ—প্রভৃতি অনেক নির্দ্দোষী লোক ধরা পড়েন এবং আটক হন। পুলিস পরে যাহা দিগকে আক্রমণকারী জানিতে পারে, সেই পাঁচজনকেই **state prisoner** করিয়া রাখে।

এই ঘটনার পরে টেগার্ট সাহেব কলিকাতা এবং সমগ্র বাঙ্গলা দেশেই বেড়া-জালে অসংখ্য লোক ধরিয়া আটক করে। ৩ আইন (**Regulation 11I of 1818**) ও ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া য়্যাক্ট প্রবল ভাবে প্রয়োগকরা হয়।

এই বৎসরে পূর্ব্ববঙ্গেও অনেকগুলি ডাকাতি হয়, তন্মধ্যে ফরিদপুরে ধানকাটি (গোঁসাইহাট) হইতেই ৪৩০০০ টাকা লুট হয়, কুমিল্লার গণ্ডরা, নামঘর, সাহা-পদুয়া, লনিণেশ্বর প্রভৃতি গ্রামে ডাকাতি হয়। ক্রমে প্রথম দুইটি গ্রাম হইতেই যথাক্রমে ১৫০০০ ও ১৭৫০০ টাকা লুট হয়। গণ্ডরার ডাকাতির জন্য মাত্র একজন

লোকের ৩ বৎসর জেল হয়। ময়মনসিংহে ও ৩।৪টি ডাকাতি হয় এক সাহিলদেও হইতেন ৮০০০০ আশি হাজার টাকা অপহৃত হয়।

মালদহ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেড মাষ্টার বেরতী ঘোষ ১৯১৬ সালের ৩০ জুন নিহত হয়। অন্য স্থান হইতে বিপ্লবীগণ মালদহ জেলায় যাইয়া সেখানকার যুবকগণকে বিপ্লবী করিতে প্রয়াস পায়। হেড্‌মাষ্টার বেরতী বাবু পুলিসের কাছে খবর দিত ও পুলিসের ইন্‌স্পেক্টারের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কাজ করিত। কিছুদিন পূর্ব্বে একটি মেধাবী ছাত্রের পকেটে লোকমান্য "তিলকের বক্তৃতাবলী" পাওয়া যায় বলিয়া উক্ত হেডমাষ্টার তাহাকে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করে ও তাহার বিরুদ্ধে ম্যাজিষ্টেটের কাছ রিপোর্ট করে। হোষ্টেলের ছাত্রদের পরামর্শাদি জানার জন্যও সে অপর কয়েকজন ছাত্রকে গোয়েন্দারূপে নিযুক্ত করে।

এই হত্যার ব্যাপারে মহেন্দ্র নাথ দাস নামে জনৈক যুবক ধৃত হয়। বিচারে তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। মহেন্দ্রকে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের বোমা ইয়ার্ডে দেখিয়াছি। সে তথাকার জমিদারের পুত্র ছিল।

কলিকাতা হইতে কয়েকজন গিয়া পরাইল গ্রামে ডাকাতি করে। ৩৩০০০ টাকা লুট হয় এবং অনেক লোক হতাহত হয়।

৩০ সেপ্টেম্বর (১৯১৬), ঢাকা জিলার রামাদিয়ানালি গ্রামে (ঘিওর থানার) নিবারণ পালের দল একটি ডাকাতী করে। টাকা, অনুমান সাত শত মাত্র পাওয়া যায়। কিন্তু বিচারে সাত জনের সাত বৎসর করিয়া জেল হয়। নিবারণ পালের বাড়ী ফরিদপুর জেলায়। সে ঢাকা অনুশীলন সমিতির সভ্য এবং ফরিদপুর ঈশান ইন্‌ষ্টিউটের ছাত্র ছিল। আসামীদের ৭ জনের মধ্যে ৫ জনই ছিল উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র।

১৯১৭ সালেও কয়েকটি বড় ডাকাতি হয়। তন্মধ্যে ১৫ই এপ্রিলের রাজসাহী জেলার নাটোরের নিকটস্থ জামনগরের (বাজিত পাড়া থানা) ডাকাতিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে সাড়ে ছাব্বিশ হাজার টাকা লুট হয়।

২০শে জুন রংপুর রাখাল বুরুজের ডাকাতিতেও ৩১ হাজার টাকা লুট হয়। দুইজন লোকও নিহত হয়।

২৭ অক্টোবর আবদুল্লাপুরের ডাকাতিতে ২৫০০০ টাকা লুট হয় আর কুমিল্লার মাঝিয়ারা গ্রামে ৩৩ হাজার টাকা অপহৃত হয়।

এতদ্ব্যতীত কলিকাতার বড়বাজারে ৩২ নম্বর আর্মেনিয়ান ষ্ট্রীটের ডাকাতিটি বিশেষ লোমহর্ষক। একটি স্বর্ণকারের দোকানে রাত্রি ৯টার সময়, (৭ মে, ১৯১৭) দোকানদার লোকজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেছিল, এমন সময় দুইজন যুবক দোকান ঘরে গিয়া সোনার গহনাদি দেখিতে চায়। দোকানদার যখন দেখাইবার জোগাড় করিতেছিল, ৪টি বাঙ্গালী যুবক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গুলি ছুড়িতে আরম্ভ করে। দোকানদারের দুইটি ভাই সাংঘাতিক আঘাত পাইয়া মাটিতে পড়িয়া যায়, আর উঠে না। দোকানের সরকার ও ভৃত্যটি ও আহত হয়। দোকানে দুইজন স্ত্রীলোক ছিল, একজন পলাইয়া বাহিরে যায়। আর একজন বেঞ্চের নীচে চলিয়া যায়। একজন মুসলমানও বসিয়াছিল, সেও পলাইয়া যায়। প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার টাকার গহনা পত্র লইয়া ডাকাতগণ অদূরে একখানা ট্যাক্সিতে গিয়া উঠে। একজন ডাকাতও আহত হয়, তাহাকে ধরিয়া বসাইয়া দেওয়া হয়। সঙ্গীরা কিছু দূরে গিয়া তাহাকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিয়া দেয়। এই ব্যক্তির নাম ছিল সুরেন্দ্র কুশারী, সে দৌলতপুর কলেজে পড়িত। পরে এই সব লোক ধরা পড়িয়া স্বীকারোক্তি করিয়াছিল এবং ঘটনার সব অবস্থাই ব্যক্ত করে। অবশ্য অন্য কোন প্রমাণ না থাকায় তাহাদিগকে আটক করিয়া রাখা হয়।

জামনগরের ডাকাতিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ২০।২৫ জন ডাকাত মুখোস, সেনাদের খাবার রাখার মত ব্যাগ, ছেনি, সাবল; পিস্তল সহ ডাকাতি করিয়া (১৫ এপ্রিল ১৯১৭), বহুটাকা লইয়া যায়। এই ডাকাতি বহুদিন হইতে সঙ্কল্পিত ছিল। বহুদিন পর্য্যন্ত কেহই ধরা পড়ে না।

পরে ২৩ জুলাই তারিখে গোয়েন্দা দারোগা দুইজন বিপ্লবীকে আকস্মিক ভাবে ধরিয়া ফেলে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া হইতে ঢাকা আসিবার পথে টাঙ্গি ষ্টেশনে নামিয়াই প্রফুল্ল রায় এবং সতীশ সিংহকে সন্দেহে ধরিয়া ফেলে। পরে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের কাছে জামনগরে ডাকাতির মাল রহিয়াছে।

বিচারে ডাকাতির মাল রাখার অপরাধে উভয়েরই জেল হয়। একজনের হয় চারি বৎসর; আর একজনের পাঁচ বৎসর। এতদ্ব্যতীত আর ও দুইটি যুবকের ঐ অভিযোগে এক দুই বৎসর করিয়া জেল হয়।

এই বৎসরে খুনও কয়েকটি হয়। জানুয়ারী মাসে রেবতী নাগ নামক একজন সমিতির সভ্যকে সিরাজগঞ্জে খুন করা হয়। তাহার চরিত্র সম্বন্ধে নানা কথা শুনা গিয়াছিল। পরে জানা যায় ঐ সব অভিযোগ অমূলক।

আর একজন সমিতির সভ্যকে গোয়েন্দা বলিয়া সন্দেহ করায় তাহাকেও খুন করিবার চেষ্টা হয়। তাহার নাম ছিল জ্ঞান ভৌমিক। অমৃত সরকার নামে জনৈক বিপ্লবী জেল হইতে খবর পাঠায় যে জ্ঞানের বিশ্বাসঘাতকতায়ই তাহার জেল হইয়াছে। সমিতির সভ্যরা জ্ঞানকে চিৎপুর রোড়ের গরাণ হাটার একটি বাড়ীতে ছল করিয়া লইয়া যায়। বাড়ীতে যাওয়া মাত্র জ্ঞানের কিরকম সন্দেহ হইল; পিপাসার ভাণ করিয়া সে বাহির হইয়া পড়ে ও নিকটস্থ ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে ঢুকিয়া একেবারে হেডমাষ্টারের কাছে গিয়া আশ্রয় লয়। চন্দ্রকুমার রিভালবার হাতে তাহার পিছু পিছু যায়। কিন্তু জ্ঞান সেখান হইতে পুলিসকে টেলিফোনযোগে জানাইয়া দেয়।

এ পর্য্যন্ত রডা কোম্পানীর এক গাড়ী মাল অপহৃত হওয়াই বিপ্লবীদের পিস্তলের অভাব হয় নাই। ইহার পূর্ব্বে চন্দননগরের মারফৎ অস্ত্র পাওয়া যাইত।

১৯১৭ সালের শেষ দিকে পুলিস যেন বেড়াজালে সব বিপ্লবীকেই ধরিয়া ফেলে। কিন্তু যুদ্ধতো আর বেশী দিন থাকিবে না, টেগার্ট সাহেব তাই গভর্ণমেণ্টেকে লিখিয়া তদ্বির করিয়া নূতন আইন উদ্ভাবনের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। সে অধ্যায়ে আসিবার পূর্ব্বে ১৯১৮ সালের কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

সম্মুখ সমর

আমরা বুড়িবালামের সংঘর্ষ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। যতীন্দ্র নাথ ও তাঁহার সহকর্ম্মীগণের সাহস ও নির্ভীকতার যথাযথ পরিচয় পাঠক পাইয়াছেন। তবে

সম্মুখ যুদ্ধ ব্যাপারে চট্টগ্রামের জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধ, বিপ্লবের ইতিহাসে যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এবার আমরা গৌহাটীর পাহাড়ের যুদ্ধ সম্বন্ধে যে একটি বিবরণ দিব, তাহাও তীব্রতায়, বিপ্লবীগণের সাহস ও বিরত্বে, বুড়ীবালামের সংঘর্ষ অপেক্ষা কম শ্লাঘনীয় এবং সাহসীকতা পূর্ণ বলা যায় না। বরং লড়াইটি আরও অধিক কাল ব্যাপী হইয়াছিল এবং লড়াই করিতে করিতে দুই ব্যক্তির সরিয়া পড়াও বড় কম কৌশল ও ক্ষিপ্রতার পরিচায়ক নয়। পরিচয় আবশ্যক বিধায় এখানে সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত করিতেছি।

বাঙ্গলার অন্যতম বিপ্লবী নলিনী বাগচীর নিবাস ছিল মুর্শিদাবাদ জেলায়। আই, এস, সি কি আই এ পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া সে ভাগলপুর কলেজে পড়িতে যায়। বেহারী ছাত্র দিগকে বিপ্লব মুখী করিবার জন্যই অনুশীলন সমিতির নেতাগণ তাহাকে সেইখানে পাঠায়। কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই পুলিস খবর পাইয়া তাহার পেছনে লাগে। তাই তাহাকে বাঙ্গলায় আসিতে হয়। বাঙ্গলার বিপ্লবী যুবকগণ একসঙ্গে তাহাদের আত্মীয় স্বজনও ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া য়্যাক্টের কবলে পড়িয়া কেহ জেলে পচিতেছিল, কেহ দ্বীপান্তরে গিয়াছে, কেহ বা অন্তরীণে আবদ্ধ হইয়া নির্জ্জন প্রান্তরে বাস করিতেছে। ইলিসিয়াম রো, ডালাণ্ডা হাউসে বিপ্লবীদের প্রথমে লইয়া যাওয়া হইত। স্বীকারোক্তির জন্য তাহাদের উপর একস্থানে হইত মিষ্টকথা, গায়ে হাত বুলানো—অপর স্থানে হইত মারধর পীড়ন। ডালাণ্ডা হাউসের পীড়ন ইংরাজ রাজত্ব কলঙ্কিত করিবার আর এক নিদর্শন। এইখান হইতে নলিনী ঘোষ ও প্রবোধ দাশগুপ্ত অদ্ভুত কৌশলে পলাইয়া যায়। তাহারা গিয়া গৌহাটীতে লুক্কায়িত ভাবে থাকে। নলিনী বাগচীও বাঙ্গলায় থাকা বিপজ্জনক মনে করিয়া লুক্কায়িত ভাবে থাকিবার আশায় সেইখানে গিয়া আশ্রয় লয়।

নলিনী ঘোষ তখন অনুশীলন সমিতির নেতা। গৌহাটীতে দুইটি বাটী ভাড়া লওয়া হয়। একটি বাড়ীতে থাকিত নলিনী ঘোষ, প্রভাস লাহিড়ী, তারাপ্রসন্ন দে এবং শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়। অমরবাবু বাঙ্গলা হইতে পলাইয়া এইখানে অপর দলের সঙ্গে মিশিয়া ঐ বাসায় থাকেন। বিপ্লবীদের পক্ষে এই বাড়ীর ওয়াচার

ছিল মণি রায়। কে খবর লইতেছে, আসিতেছে যাইতেছে, তাহা অনুসন্ধান করিবার ভার ছিল তাহার উপরে। অপর বাড়ীতে থাকিত নলিনী বাগ্‌চী, প্রবোধ দাশ ও নরেন বানার্জ্জী। শেষোক্ত ব্যক্তির নামে বারাণসী ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার অভিযোগ ছিল। শচীন সান্যাল প্রভৃতির বিচারের সময় সে ফেরারী ছিল।

যাহা হউক ৯ই জানুয়ারী পৌষমাসের শীতের ভোরের সময় পুলিস আসিয়া বাড়ীটি ঘিরিয়া ফেলে। উপায়ান্তর না দেখিয়া নেতা নলিনী ঘোষ সকলকে আদেশ করিলেন "**fall in**—আমাদের আজ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকিয়া লড়াই করিতে হইবে, গুলি চালাও।"

বাহির হইতে পুলিস সাহেবের হুকুম আসিল "দরজা খোল"

নলিনী ঘোষ—দরজা খোলা আছে, সাহস থাকে ঘরে প্রবেশ কর এবং নিহত হও (**Come in and be killed**)

উভয় পক্ষ হইতে গুলি চলিল। এই অবসরে মণি রায়—অদৃশ্য হইল—সকলে তাহাকে না পাইয়া মনে করিল পলাইয়াছে। তাহারাও পাশের বাড়ীর টিনের ছাদের উপর দিয়া পলাইয়া গৌহাটীর পাহাড়ের উপরে গিয়া উঠে। সেইখানে পূর্ব্ব হইতে একটি ঘাঁটি নির্দ্ধারিত ছিল, সেইখানে আশ্রয় লয়। এই বাড়ীতে গুলি চলিতেছে খবর পাইয়া অপর বাড়ীর নলিনী বাগ্‌চী, প্রবোধ দাশগুপ্ত এবং নরেন বানার্জ্জীও এই ঘাঁটিতে আসিয়া আশ্রয় লয়।

অতঃপরে পুলিস পাহাড়টী ঘেরাও করে। তখন উভয় পক্ষেই গুলি চলিল। কয়েক ঘণ্টা এই ভাবে চলিল। একদিকে দেখা গেল কতকগুলি পুলিস পাহাড়ের উপরে উঠিতেছে। বিপ্লবীদল উপর হইতে বড় বড় পাথর ফেলিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিল, এই অবসরে অন্যদল পুলিস অপর দিক হইতে আসিয়া তাহাদের সন্মুখীন হইল। লড়াই হইল প্রথমে গুলিতে গুলিতে, তারপরে গাছের ডাল লইয়া, তারপরে হাতে হাতে। নলিনী ঘোষ পায়ে আহত হইয়া সেইখানে ধৃত হইল। কাহাকেও দুই একদিন পরে পাহাড়ের অপর স্থানে পাওয়া গেল, প্রভাস লাহিড়ী আহত হইয়া কামেক্ষ্যা মন্দিরের কাছে পড়িলে সেখানে

ধৃত হইল। কিন্তু নলিনী বাগ্চী ও প্রবোধ দাশগুপ্তকে কেহ ধরিতে পারিল না। পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া ইহারা অপর একটি ঘাঁটিতে গিয়া আশ্রয় লয়। উহার ভার ছিল প্রভাস লাহিড়ীর সহোদর জিতেশ লাহিড়ীর উপর।

ধৃত হইবার পরে ষ্টিলটন, তরুণরাম ফুকন ও অপর একজন অবসর প্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট গঠিত ট্রাই বুনালে গৌহাটীতে যে মোকদ্দমা হয় তাহাতে নলিনী ঘোষের জেল হয় ৭ বৎসরের জন্য, প্রভাস লাহিড়ীর তিন বৎসর, নরেন বানার্জ্জী ও তারা প্রসন্ন দে প্রত্যেকের দুই বৎসর করিয়া।

নলিনী বাগ্চি ও প্রবোধ দাশগুপ্ত অতঃপর হাটিয়া হাটিয়া অনাহারে পথশ্রমে ছয় দিন পরে মুসলমানের বেশে লামডিং ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হয়। সেখান হইতে ঢাকা আসিয়া পরে নৈহাটী, হুগলী হইয়া বেহারে চলিয়া যায়। সেখানে কিছুদিন আচার্য্য কৃপালনীর আশ্রয়ে থাকে। কিন্তু বেহারে অবস্থানও নিরাপদ নয় মনে করিয়া আবার তাহারা বাঙ্গলা দেশে আসিতে বাধ্য হয়।

পথশ্রমে ও অনাহারে নলিনী হাওড়া আসিয়া অসুস্থ হইয়া পড়িল। আশ্রয় নাই, আহারের সংস্থান নাই, মাথা গুঁজিবার স্থান নাই। জ্বরে আক্রান্ত হইয়া গড়ের মাঠের একস্থানেই শুইয়া পড়িল। সৌভাগ্যক্রমে একজন বিপ্লবীর সঙ্গে দেখা হইলে তাহার আশ্রয়ে কয়েক দিন থাকে। কিন্তু তাহার আবার বসন্তও দেখা দেয়। ইতিপূর্বে দুর্গম জঙ্গলপূর্ণ পাহাড়ী পথ অতিক্রমকালে জোঁকের আক্রমণে তাহার সর্বশরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল।

দৈবক্রমে বাঁচিয়া পরে নলিনী ঢাকায় চলিয়া যায়, সেখানে নলিনী, তারিণী মজুমদার ও হরিচৈতন্য রায় (অনন্ত হরি) বিপ্লবী, ২৮ কলতাবাজারে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে। কিছুদিন থাকিবার পর পুলিস বাড়ীটির সন্ধান পাইল। নলিনীর অসুস্থাবস্থায় একজন গোয়ালা একপোয়া করিয়া দুগ্ধ রোজ দিতে আসিত। গোয়েন্দারা তাহার কাছে খবর পায়। গোয়েন্দা ও ছদ্মবেশী পুলিসে তখন সমগ্র ঢাকার সহর ভরিয়া গিয়াছে। সেদিন ১৫ই জুন, ১৯১৮, ভোর সাড়ে পাঁচটার সময় ইংরাজ পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ইন্‌স্পেক্টর বসন্ত কুমার মুখার্জ্জী, দুই জন দারোগা,

হেডকনেষ্টবল পতিরাম সিং, অসংখ্য কনেষ্টবল্ আসিয়া বাড়ীটি ঘিরিয়া ফেলিল। বাহিরের দরজায় করাঘাত, পরে লাঠির আঘাত এবং উচ্চস্বর—কিন্তু ভিতরে কেহই সাড়া দিল না। দুইজন কনেষ্টবল দেওয়াল টপ্‌কাইয়া উঠিয়া ভিতরে আসিয়া ভিতর হইতে দরজা খুলিল; সকলে বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

বড়দালানের পেছন দিকে একটি ঘর ছিল, সেখানে কিসের শব্দ হইতেছিল। পুলিশ সেখানে যাইতেই ঘরের মধ্য হইতে গুলি আসিতে লাগিল; পুলিসও বন্দুক ছুড়িতে লাগিল। পতিরাম সাংঘাতিক ভাবে আহত হইয়া পড়ে। সে সেদিন মরেন না বটে; পরের দিন হাসপাতালে মারা যায়। বসন্ত মুখার্জীও সাংঘাতিক ভাবে আহত হইয়া পড়িয়া যায়, আর এদিকে তারিণী মজুমদারও পড়িয়া তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। নলিনীর রিভলবারের প্রথম গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল, তাই ইংরাজ সুপারিণ্টেণ্ট প্রাণে বাঁচিয়া গেল। কতক্ষণ এইভাবে যুদ্ধ চলিল। সরকারী পক্ষের তিন জন মরিল, তিনজন গুরুতর আহত হইল, এপক্ষেও তারিণী ছাড়া অনন্তও সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়। গুলির পর গুলি চলিল। আহত হইয়াও নলিনী দেওয়ালের গায়ে পিঠ ভর করিয়া গুলি চালাইতে লাগিল। অবশেষে আর পারিল না গুরুতর আহত হইয়া সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়িয়া গেল। সে হাসপাতালে স্থানন্তরিত হইল।

এবার আসিল পুলিসের পালা। জিজ্ঞাসা, তাগাদা, কাকুতি—মৃত্যুকালীন স্বীকার উক্তি "(Dying declaration)" নিতেই হইবে। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হইল—নলিনীর নিকট হইতে কোন কথা বা পরিচয় বাহির হইলনা, গলদঘর্ম পুলিস নিরুপায় হইয়া পড়িল। পুলিশের সবপ্রশ্নেরই নলিনীর এক জবাব—"ত্যক্ত করোনা ভাই, একটু শান্তিতে মরতে দাও"। অবশেষে পুলিসের বড় সাহেব কত আদর করিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া প্রশ্ন করিল, নলিনীর উত্তর আসিল অতি শান্ত ও ধীরভাবে **Ah! dont disturbe, let me die in peace"**

ক্রমে সব চেষ্টা বিফল হইল; নলিনীর চক্ষুদ্বয় চিরতরে নিমীলিত হইল। বীরের ন্যায় নলিনী মৃত্যু আলিঙ্গন করিল, কিন্তু সে কাহিনী কেহই জানিলনা।

১৯১৮ সালে আরও কয়েকটি বিপ্লবাত্মক ঘটনার বিবরণ উল্লেখযোগ্য।

৬ই মে বগুড়ায় দারোগা হরিদাস মৈত্র ফেরারী আসামী ধরিতে যায়! একটি বাড়ীতে দুইজন বিপ্লবী বাস করিতেছিল। অনেক ধস্তাধস্তির পর উহাদের ধরিয়া ফেলে।

১৯ শে কিশোরগঞ্জ রেলওয়ে ষ্টেসনে শাদা পোষাক পরিহিত একজন কনেষ্টবল জনৈক যুবককে একটি পুঁটলি হাতে করিয়া যাইতে দেখে। এক কনেষ্টবল অপর কনেষ্টবল প্রসন্ন নন্দীকে ডাকে, উভয়ে যুবকটিকে ডাকিয়া পুঁটলি খুলিতে বলে। যুবক তাহাকে ষ্টেসন মাষ্টারের কাছে লইয়া যাইতে বলে। উহারা অস্বীকৃত হইয়া পুঁটলিটি কাড়িয়া লইলে যুবকটি প্রসন্ন নন্দীকে গুলি করিয়া পলাইয়া যায়। পুঁটলি খুলিলে দেখা গেল যে উহাতে গুলি, বন্দুক, ছেনি প্রভৃতি ডাকতির সরঞ্জাম রহিয়াছে।

প্রসন্ন কুমার ৭ দিন পরে হাসপাতালে মারা যায়।

২৭সে মে ১৯১৮, পুলিস সংবাদ পাইল যে পাব্‌না জেলার আটঘরিয়া সিরাজগঞ্জ গ্রামে কয়েকজন ফেরারী বাস করিতেছে। তাহাদিগকে ধরিবার জন্য একজন পুলিসের বড় সাহেব, একজন ইনস্পেক্টার, দুইজন দারোগা, একজন হাবিলদার, ৬ জন কনেষ্টবল প্রায় ২০ মাইল্ পথ হাটিয়া গিয়া বাড়ীটি ঘেরাও করে। সে বাড়ীতে যে দুইজন যুবক থাকিত তাহারা বাড়ী থেকে লাফাইয়া বাহির হইয়া একটা টিলার মত উঁচু জায়গায় গিয়া গুলি ছুড়িতে আরম্ভ করে। কতকক্ষণ গুলি চলিবার পরে একজন পাঠক্ষেতে পালাইয়া যায়, তাহাকে কেহ ধরিতে পারেনা। অপর ব্যক্তি কিছুক্ষণ পরে বন্দূক ছাড়িয়া দিয়া বলে—

"আমাকে ধরিতে পার।" ইহার নাম গোবিন্দ কর—। যে ব্যক্তি পলাইয়া যায়, তাহাকে ১৯১৬ সালের ১লা ডিসেম্বর ধৃত করা হইয়াছিল। কিন্তু পরে সে পলাতক হয়, তাহার নাম ছিল নিকুঞ্জ পাল।

রৌলট্ কমিটির রিপোর্ট ও রৌলট্ আইন

রৌলট্ আইন যে ভীষণ চণ্ড নীতি মূলক এবং তাহাতেই যে সমগ্র ভারতবাসী নূতন ভাবে দেশাত্মবোধে উদ্দীপিত হইয়া উঠে, ইতিহাসই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া য়্যাক্টের কার্য্যকাল অবসানে উহার স্থানে অন্য একটী আইন প্রণয়নের জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট ভারত সচিবের নিকট লিখিয়া পাঠায়। যথাসময়ে অনুমোদন আসিলে গভর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া ১৯১৭ সালের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে একটী কমিটি করিয়া দেয়—

(১) বিলাতের জজ জাষ্টিস রৌলট্-প্রেসিডেণ্ট—

(২) স্যার বাসিল স্কট্ (বোম্বাই চীফ জাষ্টিস)

(৩) মান্দ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি কুমার স্বামী শাস্ত্রী।

(৪) স্যার ভার্ণি লোভেট, যুক্ত প্রদেশের বোর্ডের মেম্বার।

(৫) কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল প্রভাসচন্দ্র মিত্র।

জানুয়ারী হইতে কাজ করিয়া মাস দুই এর মধ্যেই কমিটি রিপোর্ট দিয়া একটি কঠোর শাস্তি মূলক আইন প্রণয়নের জন্য সুপারিস করে।

একটী বিষয় লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, উক্ত অনুসন্ধানের সময়ে কেবল গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে পুলিসের সাক্ষ্য এবং পুলিস কর্ত্তৃক প্রস্তুত কাগজ পত্রেরই সহায়তা লওয়া হইয়াছে। বিপ্লবীদের পক্ষ হইতে কোন কথা শুনিবায় চেষ্টা হয় নাই এবং কোন কথা শোনাও হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ ভারতরক্ষা আইন প্রণয়নের সময় অজুহাত দেওয়া হইয়াছিল যে যুদ্ধের সময়ে যুদ্ধের উপকরণ ও সৈন্য সামন্ত লোকজন যুদ্ধের জন্য বিদেশে পাঠাইতে হয় বলিয়া, ভারতে বিদ্রোহ হইলে তাহা দমন করা সম্ভব হইবে না। সে কারণ অতিরিক্ত আইনের বলে সন্দেহ ভাজন ব্যক্তিগণকে জেলে পুরিয়া রাখা সঙ্গত কিন্তু এখন যুদ্ধ থামিলেও আবার দমন নীতি মূলক নূতন আইন প্রণয়নে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে চণ্ডনীতি প্রয়োগ করাই গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত, যুদ্ধের অজুহাত একটা ছলনা মাত্র।

দ্বিতীয়তঃ গভর্ণমেণ্ট বাবস্থার প্রকাশ করিয়াছে যে ভারত রক্ষা আইন প্রণয়ন করিয়া বিপ্লবান্দোলন বন্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছে। তাহাই যদি হয়, তবে আবার অন্য কঠোরতর আইনের আবশ্যকতা কি ?

তৃতীয়তঃ বাঙ্গালা এবং পাঞ্জাব ভিন্ন ঐ সময়ে ভারতের অন্য কোন প্রদেশেই বিপ্লবান্দোলনের অস্তিত্ব ছিলনা বলিলেই হয়। আর ঐ সমস্ত স্থানে বিপ্লবান্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছে গভর্ণমেণ্টেরই কার্য্যের ফলে। বাঙ্গালায় হয় বঙ্গবিভাগ ও স্বদেশী আন্দোলন পর্য্যুদস্ত করিবার প্রয়াসে আর পাঞ্জাবে হয় কেনেডায় শিখদিগের প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের জন্য।

চতুর্থতঃ—সাম্রাজ্যবাদীদের নূতন আইন প্রণয়ন করিবার জন্য ব্যগ্রতার আর একটি বিশেষ কারণ ছিল। ঠিক এই সময়ে নূতন শাসন সংস্কার প্রদান করিবার জন্য বিলাত হইতে সরকারী ঘোষণা বাহির হইয়াছে এবং সেই অভিপ্রায়েই ভারত সচিব মিঃ মণ্টেগুকে ভারতে প্রেরণ করা হইয়াছে। পাছে সংস্কারটাতে ভারতবাসী বিশেষ কিছু ক্ষমতা লাভ করে, সরকার তাই চণ্ডনীতি প্রয়োগ করিয়া নিজের শক্তি সংহত রাখিবার জন্যই ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। সাম্রাজ্য বাদীগণের অপর দিকেও আশঙ্কা হয় যে সমগ্র দেশ তখন চরমপন্থী হইয়া পড়িয়াছে। ইতিমধ্যে ডক্টর আনি বেশান্তকে পর্য্যন্ত হোমরুল সম্বন্ধে প্রচার কার্য্য করার জন্য অন্তরীণে আবদ্ধ করা হয় এবং তজ্জন্য দেশে এমন তিক্ততা ও উষ্ণতার সঞ্চার হয় যে, গভর্ণমেণ্ট চণ্ডনীতি প্রয়োগে আরও উগ্র হইয়া উঠে। আর এই সময় মডারেটগণকেও গভর্ণমেণ্ট সমর্থকভাবে লাভ করে। রাউলট কমিটির অন্যতম সভ্য স্যার প্রভাস মিত্র মডারেট পন্থী। যে সময়ে রাউলট কমিটির রিপোর্ট বাহির হয় সে সময় সমগ্র মডারেট দল কংগ্রেসের সংস্পর্শ পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দেয়।

এই সমস্ত ব্যাপারের পটভূমিকায় রাউলট কমিটি প্রদত্ত বিবরণ এবং চণ্ডনীতির জন্য উহার সুপারিস অনুধাবন করিতে হইবে।

যাহাই হউক উক্ত কমিটি লাহোরে বসে ৪ দিন, আর কলিকাতায় বসে ৪২ দিন। তাহাদের উপর ভার ছিল বিপ্লবাত্মক ষড়যন্ত্র গুলি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে,

এবং ঐ সব ষড়যন্ত্র দমন করার জন্য নূতন কোন আইন সম্ভব কিনা সে সম্বন্ধে মতামত প্রদান করিতে।

কমিটি ১৫ এপ্রিল তারিখে (১৯১৮) একটি রিপোট দিয়া যে সুপারিশ করে কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে ১৯১৮, আগষ্ট, উহার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা করা হয়। রিপোট পাইয়া গভর্ণমেণ্টও নূতন আইনপ্রণয়নে সচেষ্ট হইলেন। এই সম্বন্ধে—কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহার সারমর্ম এই—

"যে সময়ে স্বায়ত্ত শাসনের দাবী গৃহীত হইবার উপক্রম হইয়াছে, সেই সময়ে সরকার কেন যে এইরূপ একটী চণ্ডনীতিমূলক আইন প্রণয়নে উৎগ্রীব হইয়াছে তাহা আমাদের বুদ্ধির অতীত। দেশে বিপ্লবপন্থীর দল থাকিতে পারে কিন্তু জগতের ইতিহাসে কোথাও দেখা যায় নাই যে নিষ্ঠুর আইনের সহায়তায় বিপ্লব নির্মূলিত হইয়াছে। সরকার মূলানুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবে যে, রৌলট কমিটি নির্দ্দেশিত পথে বিপ্লব দূর হইবে না, হইতে পারে না। একমাত্র জনগণকে স্বরাজ বা স্বায়ত্ব শাসন প্রদানেই এই বিঘ্ন দূরীভূত হইবে।"

রৌলট কমিটীর রিপোর্ট যে কত হেয় ও লজ্জাস্কর লোকমান্য দেশপূজ্য তিলক ও বিপিন চন্দ্র পাল সম্বন্ধে উহাদের অসঙ্গতউক্তিই তাহার প্রমাণ। তিলক প্রভৃতির বক্তৃতার মর্ম্ম তো রৌলাট প্রমুখ সভ্যগণ বুঝেন নাই বরং তাঁহাদের উপর অন্যায় আচরণে দেশবাসীর মন আরও তিক্ত করিয়া দেয়। কলিকাতায় এবং বাঙ্গালার সর্ব্বস্থানে রৌলাট রিপোর্ট লইয়া আলোচনা চলিতে লাগিল এবং সমগ্র দেশ আলোড়িত হইয়া উঠিল। এই রিপোর্টে দুই প্রকারে

---

* (1) To investigate and report on the nature and extent of the criminal conspiracies connected with the revolutionary movement in Indfa.

(2) To examine and consider the difficulties that have arisen in dealing with such conspiracies and to advise as to legislation, if any.

বিপ্লব দমন করিবার সুপারিশ হয়, একটী শাস্তি মূলক (punitive), অপরটি প্রতিরোধমূলক (preventive). ইহার দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।—

ষড়যন্ত্র বা রাজদ্রোহ প্রভৃতি-মোদ্দমায় খালাস পাইয়াও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দুইবৎসর জামিন মুচলেকায় থাকিবার কথা হয়। অন্ততঃ মুক্তিলাভ করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তি কোথায় থাকিবে, কি করিবে বা করিতেছে, সব সংবাদ পুলিসকে গিয়া জানাইতে হইবে। আর মুক্তির পরে দুইবৎসর পর্য্যন্ত কোন প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দিতে পারিবে না। বিচারের সময় জুরী বা এসেসার থাকিবে না, কারণ তাহারা নাকি খাঁটি মত দিতে পারেনা, আবার তাহাদের নাকি প্রাণের ভয়ও আছে। কোন প্রাথমিক অনুসন্ধান (Preliminary Enquiry) হইবে না, আর দণ্ড হইয়া গেলে কোন আপিল চলিবে না। দ্বিতীয়তঃ বাইরের যে কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে পুলিসের সন্দেহ হইবে, তাহার সম্বন্ধে কোথায় আছে, কি করে, বাড়ী থাকে কিনা প্রভৃতি বিষয়ে পুলিশের কাছে রিপোর্ট দিতে হইবে। বাড়ী বাড়ী গিয়া খবর পাইবার জন্য পরিদর্শন কমিটি গঠন করিবারও কথা হয়।

এই রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া গভর্ণমেণ্ট দুইটী বিলের খস্‌ড়া করে এবং ১৯১৯ সালের ১৮ই মার্চ্চ তারিখে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ কর্ত্তৃক উক্ত বিল দুইটি পাশ করাইয়া লয়। গভর্ণর জেনারেল লর্ড চেমস্‌ফোর্ড ২৩শে মার্চ্চ তারিখে উহা অনুমোদন করেন। সুতরাং রাউলাট বিল সম্পর্কে তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও উহা বিধিবদ্ধ অর্থাৎ পাশ হইয়া গেল।

আইনটি পাশ হইলেই পণ্ডিত মদন মোহন মালবিয়া, মিঃ মজরুল হক, মিঃ জিন্না, পণ্ডিত বিষেণদত্ত শুকুল প্রভৃতি কেন্দ্রীয় পরিষদের সভ্যগণ পদত্যাগ করেন। স্যার শঙ্কর নায়ার এই সময়ে গভর্ণর জেনারেলের কার্য্যকরী সভার (Executive Council) সভ্য ছিলেন। রৌলট আইনের প্রতিবাদ করিয়া তিনিও কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন।

এই আইনের কঠোরতা এত ব্যাপক ও তীব্র যে রাজদ্রোহের তো কথাই নাই, এমন কি সাধারণ দাঙ্গা হাঙ্গামা বা বলপূর্ব্বক অর্থ ছিনাইয়া লওয়ার

ব্যাপারেও শুধু দারোগা অথবা গুপ্তচরের রিপোর্টের উপরেই ব্যক্তিবিশেষকে এই আইনের বলে শাস্তি দেওয়া চলিবে। বিচার হইবার কথা হয় রুদ্ধ দ্বারকক্ষে এবং উহা এত সরাসরিভাবে হওয়ার কথা হয় যে, স্বর্গীয় মতিলাল নেহেরু মহাশয় বেশ রহস্যভরে বলিতেন "আইনটি এমন বিচিত্র যে না আপিল, না উকীল, না দলিল।"

এই আইন প্রবর্ত্তিত হইলে লোকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলিতে কিছু থাকবে না, পুলিশের দয়ার উপরে নির্দ্দোষী লোককেও থাকিতে হইবে। তাই মহাত্মা গান্ধী ১৯১৯ সালের ৬ই এপ্রিল তারিখে 'সত্যাগ্রহ' করিবেন বলিয়া স্থির করেন। ইহার অর্থ তিনি উক্ত আইনের প্রতিবাদ কল্পে উপবাস ও প্রার্থনায় দিনপাত করিবেন এবং আবশ্যক হইলে ধীরভাবে সকল নিগ্রহ সহ্য করিয়া উহার প্রতীকার কল্পে চেষ্টা করিবেন। রাউলট আইন আমাদের জাতীয় জীবনের অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। সেই বাধা অতিক্রম করিতেই হইবে। তাই মহাত্মাজীর সত্যাগ্রহ। এই সত্যাগ্রহ সমস্ত ভারতেই ৬ই এপ্রিলের পুণ্য দিনে অনুষ্ঠিত হইল। অতঃপর মহাত্মাজী বোম্বাই হইতে অমৃতসরে রওনা হইলেন। ৮ই এপ্রিল মহাত্মাজীকে আটক করা হয়। ইহার পরেই হয় অমৃতসর, লাহোর প্রভৃতি স্থানে স্বতঃস্ফূর্ত্ত—আন্দোলন। দুর্ভাগ্যক্রমে উন্মত্ত জনতা কর্ত্তৃক কিছু অনাচারও অনুষ্ঠিত হয়,। জনশক্তি সমস্ত বাধা ছাপাইয়া বাঁধ ভাঙ্গিয়া প্রবল হইতে লাগিল। অতঃপর ইহার ফলে জালিয়ানওয়ালাবাগে সরকার কর্ত্তৃক যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয় সেই কাহিনী পাঠককের অবগতির জন্য অন্যত্র দেওয়া হইল। ইহাই রাউলাট আইনের ইতিহাস ও জনগণের ব্যাপক জাগরণের কাহিনী।

সুতরাং ঘটনাস্রোত পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, চণ্ডনীতি মূলক রাউলট আইনেরই পরিণতি মহাত্মার সত্যাগ্রহ। তাহারই ফলে মহাত্মাজীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ ও জনতার স্বতঃস্ফূর্ত্ত আলোড়ন, এবং পরে ওডায়ার ও জেনারেল ডায়ারের অমানুষিক অত্যাচার। ইহারই পরিণতিতে হাণ্টার কমিটির অনুসন্ধান ও রিপোর্ট। ইহার পরিণতিই আবার কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলন,

মহাত্মা ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ও কর্ম্মীদিগের আপ্রাণ চেষ্টা, সহস্র সহস্র লোকের কারাভোগ এবং ক্রমে স্বরাজ লাভ। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বিপ্লব আন্দোলনের ফলেই যখন রাউলট আইন এবং তাহার পরিণতিই যখন কংগ্রেসের অহিংস সমর ও স্বরাজলাভ, তখন পূর্ব্বাপর সব কয়টি ঘটনারই পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ ও অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ রহিয়াছে।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড

জালিয়ানওয়ালাবাগের স্মৃতি ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে অমর হইয়া আছে। রক্ত দান করিয়াই স্বাধীনতার মূল্য দিতে হয়। যুগে যুগে পৃথিবীর ইতিহাসে এই সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ কংগ্রেসের অহিংস মন্ত্রে দীক্ষা লইয়াছে, সেই জন্যে সে নীতিগত ভাবে মার খাইয়াছে কিন্তু মারে নাই। ইহা সত্ত্বেও ইংরাজের অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া যুব সম্প্রদায়ের কেহ কেহ হিংসার আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল। দিকে দিকে সহিংস বিল্পব আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছিল। ইহারই মূলচ্ছেদ করিবার জন্য রাউলাট আইন পাশ হইল (১৯১৯)। দেশে ব্যক্তি স্বাধীনতা বলিতে কিছু রহিল না। মহাত্মা গান্ধি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। এই অন্যায় আইনের প্রতিবাদ কল্পে তিনি ৬ই এপ্রিল (১৯১৯), সারা ভারতে শান্তিপূর্ণভাবে সত্যাগ্রহ ও হরতাল পালনের নির্দেশ দিলেন। ইতি পূর্ব্বে ৩০শে মার্চ, হরতালের দিন স্থির থাকায়, দিল্লীতে হিন্দুমুসলমানের মিলিত হরতাল প্রতি পালিত হয়। কিন্তু সেখানে সরকার সক্রিয় হইয়া অত্যাচার আরম্ভ করে। স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়, বেপরোয়া গুলিও চলে।

মহাত্মা গান্ধি বোম্বাই হইতে ৮ই তারিখে রওনা হন কিন্তু তাঁহাকে পাঞ্জাব সীমানায় গেরেফতার করিয়া পুনরায় বোম্বাই পাঠান হয়। পাঞ্জাব গভর্ণর মাইকেল ওডায়ারের আদেশে ডাঃ কিচলু ও ডাঃ সত্যপাল অবরুদ্ধ হইয়া অজ্ঞাত স্থানে প্রেরিত হন। স্থানীয় দুইজন জননেতার অবরুদ্ধ হইবার সংবাদ সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। হাজারে হাজারে হিন্দু মুসলমান, শিখ শোকচিহ্ন স্বরূপ,

অনাবৃত মস্তকে, বিনাপাদুকায় ডেপুটি কমিশনারের বাঙলার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে।

অমৃতসরের সমস্ত প্রধান রাস্তা দিয়া, ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক, টাউনহল মিশনারিদের বক্তৃতা গৃহ হইয়া যখন জনতা রেলওয়ে সেতুর নিকট উপস্থিত হইল, তখন কয়েকজন সামরিক প্রহরী অগ্রসর হইয়া বাধা দিল। আবেদন নিবেদন নিস্ফল হইল। দৃঢ়পণ করিয়া জনতা অগ্রসর হইলে গুলি চলিল, ফলে নিরস্ত্র শান্ত অহিংস জনতা ক্ষিপ্ত ও উত্তেজিত হইয়া পড়িল। উন্মত্ত জনতা জ্ঞান হারা হইয়া কিছু অনাচারও করিল। কয়েক ব্যক্তি আক্রান্ত হয়। কয়েকজন নির্দোষী ইংরাজও হত হয়। মিসেস শের উড নামে এক শিক্ষয়িত্রী সাইকেলে আসিতেছিলেন, তিনি আক্রান্ত হন, কিন্তু জনৈক ভারতীয় তাঁহাকে রক্ষা করেন।

ইহার পরের তিন দিনের ঘটনা কাহারও জানিবার সুযোগ হইল না। পাঞ্জাবের সংবাদ আদান প্রদান একেবারেই বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। পাঞ্জাব সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।

১৩ই এপ্রিল অমৃতসরের বুকে জালিয়ানওয়ালাবাগে যে নৃশংস হত্যালীলা অনুষ্ঠিত হইল তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা নাই। একমাত্র মস্কো সহরের রেডস্কোয়ারের মে দিবসের হত্যার সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে। জালিয়ানওয়ালাবাগ অমৃতসরের একটি ক্ষুদ্র পার্ক। ইহার চারিদিকে প্রাচীর বেষ্টিত বড় বড় পাকা বাড়ী। একটি সরুপথ দিয়া এই পার্কে আসিতে হয়। ১৩ই এপ্রিল তারিখে সকালে হংসরাজ নামে চরিত্রহীনা মাতার এক অপদার্থ পুত্র ঢোল পিটাইয়া সভা হইবে ঘোষণা করে। কেহ তাহাকে সভা ডাকিবার অনুমতি দেয় নাই। প্রস্তাবিত সভাপতিও সভার বিষয় জানিতেন না। ইহার পশ্চাতে এক গভীর ষড়যন্ত্র ছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

রৌলট আইনের প্রতিবাদ হইবে শুনিয়া দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ, বালক বালিকা সেখানে সমবেত হইল। প্রায় ১২০০০ হাজার লেকে সেখানে সমবেত হইয়াছিল। হংসরাজকে গোয়েন্দা পুলিশের সহিত আলাপ করিতে দেখা গেল। সে অধীর

ভাবে এধার ওধার ঘুরিতেছিল আর পশ্চাতে তাকাইতেছিল। হঠাৎ জেনারেল ডায়ার আসিয়া সমবেত জনমণ্ডলীকে সে স্থান ত্যাগ করিতে বলিল, প্রবেশপথ ও বাহিরে যাইবার পথ অতি সংকীর্ণ হওয়ায় খুব অল্প লোকই একত্রে যাইতে পারিল। এক আধ মিনিট যাইতে না যাইতে ডায়ার গুলি চালাইবার আদেশ দিল। নির্দোষী স্ত্রীপুরুষ, বালক বালিকার রক্তে জালিয়ানওয়ালাবাগের মৃত্তিকা রঞ্জিত হইল। কত যে মরিল আর কত যে আহত হইল তাহার সংখ্যা লইবে কে? তাহাদের শুশ্রূষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকায় আত্মীয়-স্বজন কেহ ঘরের বাহির হইয়া খোঁজ ও লইতে পারিল না। জেনারেল ডায়ার পরে আপসোষ করিয়া বলে, "গুলি না ফুরাইলে (১৬৫০ রাউণ্ড ছোট গুলি ছিল) আর কামানের গাড়ি লইয়া যাইতে পারিলে, আমি সব উড়াইয়া দিতাম।" দশ মিনিট অবিরাম গুলি বর্ষিত হইয়াছিল। প্রায় চারিশত জন হত আর বারশত আহত হইল।

ইহার পর ১৫ই এপ্রিল (১৯১৯) হইতে সামরিক আইন জারি হয় এবং জুন পর্য্যন্ত ইহা বলবৎ ছিল।

সামরিক আইন ব্যতীত আরও কয়েকটি বর্বর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। যেমন প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত, কোন নির্দিষ্ট রাস্তা অতিক্রমকালে হামাগুড়ি দিতে বাধ্য করা প্রভৃতি। পাশবিক অত্যাচারে মর্মাহত হইয়া রবীন্দ্রনাথ সরকারী খেতাব ত্যাগ করেন। সে সময় তিনি তৎকালীন বড়লাট লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের নিকট একখানি ইতিহাস প্রসিদ্ধ পত্র লেখেন, উহার মর্মার্থ দেওয়া হইল।

"নিরস্ত্র ও নিঃসহায় জাতির উপরে মনুষ্যঘাতী অস্ত্রশস্ত্রে বলীয়ান শক্তিমান জাতি যে অত্যাচার করিল, তাহার তুলনা কোন সভ্য গভর্ণমেণ্টের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। আমাদের দেশবাসীর পুঞ্জীকৃত মর্মবেদনা শাসক সম্প্রদায় উপেক্ষা করিয়াছে। এংলো ইণ্ডিয়ান পত্র সমূহ সেই উপেক্ষায় প্রশংসমান হইয়াছে এবং জনগণের ঐ বেদনায় উপহাস করিয়াছে……আজ আমি আমার কোটি কোটি দেশবাসীর পক্ষ হইতে প্রতিবাদ জানানো কর্তব্য বলিয়া

মনে করিতেছে। আজ আমি দেখিতেছি যে, সম্মানের নিদর্শন আমার এই উপাধিটি পূর্ব্বোক্ত অপমান ও লজ্জাকে আরও প্রকট করিয়া তুলিতেছে। আজ আমি এই সম্মানের পদটির ভারমুক্ত হইয়া অপমানিত, লজ্জিত ও মানুষের প্রতি অযোগ্য ব্যবহার প্রপীড়িত দেশবাসীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে চাই। তাই আমি আপনার পূর্বগামী বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি হইতে আমাকে মুক্ত করিতে আপনার নিকট অনুরোধ জানাইতেছি।"

আবার আমরা পূর্ব্ব প্রসঙ্গে ফিরিয়া যাই।

মহাত্মার আন্দোলনের ফলে ১৯২৩ হইতে ৩।৪ বৎসর পর্য্যন্ত গুপ্ত সমিতির কোনরূপ সক্রিয়তা ছিল না। আর অহিংস গণ আন্দোলন সক্রিয় ভাবে চলিলে গুপ্ত বিপ্লবের অস্তিত্ব থাকা সম্ভবও নয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় রক্ষণশীল দল এবং প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগণ মহাত্মার আন্দোলনকেও বিপ্লব আন্দোলনেরই নামান্তর বলিয়া মনে করিয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতে পারি যে, বিপ্লবের প্রতিপক্ষ রুদ্রমূর্ত্তি টেগার্ট গৃহপ্রত্যাগত হইয়া শান্ত আবহাওয়ার মধ্যেও গান্ধী আন্দোলনের তীব্র নিন্দা করিতে বিরত হয় নাই। ১৯৩২ সালের ১লা নভেম্বর তারিখে ভূতপূর্ব বাঙ্গলার গভর্ণর স্যার ষ্টানলি জ্যাক্সনের সভাপতিত্বে বিলাতের একটি সভায় স্বনামধন্য স্যার চার্লস টেগার্ট স্পষ্টই বলে—

"গান্ধীর সত্যাগ্রহই বল, বিপ্লবীদের গুপ্ত আন্দোলন টেরোরিজমই বল—উভয়ের উদ্দেশ্য গভর্ণমেণ্টকে অচল করা—তথাপি পার্থক্য এই, একটি গুপ্ত আর অপরটি প্রকাশ্য ও ব্যাপক। তবে গুপ্ত আন্দোলন কারীগণ কংগ্রেসের ভিতরে ওতপ্রোত ভাবে ঢুকিয়া পড়িয়াছে।"*

---

* Civil Disobedience and terrorisim may have different foundations, but both aim at paralysing the Government. Terrorism has different leaders but penetrated Congress machinery in Bengal.

Tagert's address at Royal Empire society at the Hotel Victoria on Nov. 1, 1932, when Sir Stanly Jackson presided—vide. Nov. issue (1932) of Review of India.

· মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলন যে অহিংসা ও প্রেম সম্ভূত তাহা সকলেই জানে। সেই আন্দোলন আরম্ভ হইবার বারো বৎসর পরেও বাড়ীতে বসিয়া প্রকাশ্য সভায় টেগার্ট অমৃতসরস্থ সমস্ত অনর্থের দায়িত্ব মহাত্মার স্কন্ধে আরোপ করিতে সাহস করিয়াছে, ইহা সত্যের অপলাপ ও নির্লজ্জতার পরাকাষ্ঠ। আরও স্মরণ রাখিতে হয় গান্ধীজী একবৎসর পূর্ব্বে ১৯৩১ সালের অক্টোবর নভেম্বর—বিলাতে শান্তির প্রয়াসেই গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। আর সেই সময় ইংলণ্ডের ধর্ম্মযাজকগণ পর্য্যন্ত গান্ধীজীকে যিশু খৃষ্টের সঙ্গেই তুলনা করিয়াছেন। মহাত্মাজীর বিলাতে অবস্থান-কালে ১৯৩২ সালের বেঙ্গল অর্ডিনান্স পাশ হয়, এবং সেই সময়ে তিনি গভর্ণমেণ্টের চণ্ডনীতির তীব্র প্রতিবাদ করিয়া কতকগুলি বিবৃতিও দেন। কিন্তু তাঁহার অল্প দিন মধ্যেই টেগার্ট সাহেব গান্ধীজীর আন্দোলন নিন্দার্হ ও খেলো প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহার ঘাড়ে নিজেদের কৃতকর্ম্মের দোষ চাপাইয়া দিয়া ছাপাই গাহিবার জন্য চেষ্টা করে। টেগার্টের ন্যায় চণ্ডনীতির প্রধান কোতোয়ালের নিকটে আর বেশী কি আশা করা যায়?

টেগার্টের কথাগুলি কিরূপ নির্লজ্জতাসূচক পাঠককে তাহার পরিচয় দেওয়ার জন্য কথাগুলি উদ্ধৃত করিতেছি :—

"গান্ধীর সত্যাগ্রহের জন্যই অমানুষিক গুণ্ডামি হয় এবং ইউরোপীয়দের উপরে আক্রমণ সুরু হয়। ব্যাঙ্কের উপরে আক্রমণ চলে, বাড়ী ঘর ষ্টেশন পোড়াইয়া দেওয়া হয়, এবং ইংরাজদিগকে হত্যা করা হয় এবং তাহাদের দেহ আগুনে দগ্ধ করা হয়। পাঞ্জাবের ভীষণ গোলযোগ সামরিক আইনের সাহায্যেই প্রশমিত হয়।"*

---

* "Gandhis' civil disobedience was followed by unprecedented scenes of violence and anti European activities.

English Banks were sacked and burnt, Bank-officials were murdered and their bodies burnt or piled up in debris. Railway lines were taken up and Railway stations fired. officials were murdered and at last in one case was burnt alive. Order was restored in the Punjab only by the application of Martial Law —Vide the above speech.

১৯৩২ সালের শেষভাগেও টেগার্ট ইংলণ্ডের রাজধানীতে ভূতপূর্ব্ব বাঙ্গলা গভর্ণরের সাক্ষাতে বিনা বাধায় সামরিক আইনের প্রশংসা করিতে সঙ্কুচিত হয় নাই। আজ ইংরাজ ধীর ভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবে, টেগার্ট, উইলিংডন প্রমুখ ইংরাজের দূর দৃষ্টির অভাবেই এত অনর্থ হইয়াছে, কি মহাত্মাজীর শান্তির বাণীতে অনিষ্ট হইয়াছে। বুঝিতে পারিবে যে সামরিক আইনে গোলযোগের কণ্ঠরোধ হইয়াছে, কি অত্যাচারে জাতি উদ্বুদ্ধ হইয়া স্বরাজ অর্জ্জনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছে। তাই বলি, আবার তাঁহারা ধীর ভাবে ভাবিয়া দেখুন যে, এই ইউনিভার্সিটি বিল, ঐ বঙ্গ ভঙ্গ, এই সার্কুলার, Law less Law তেই ইংরাজের এখান হইতে অপসারণের পথ প্রশস্ত হইয়াছে। আর মহাত্মা নহেন, এই কর্জ্জন, উইলিংডন, লীটন, টেগার্ট প্রভৃতিই ইংরাজের প্রধান শত্রুর কাজ করিয়াছে।

১৯১৯ সালের কংগ্রেসেও পাঞ্জাবের ব্যাপার লইয়া অনেক আলাপ আলোচনা হয়। কিন্তু ১৯১৯ সালের গভর্ণমেণ্ট য়্যাক্ট প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ডিসেম্বর মাসে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীগণকে মুক্তি দেওয়া হইল। সকলে আবার বাড়ী ফিরিয়া আসিল। বারীন ঘোষ, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পুনীল দাস প্রভৃতিও কালাপানি হইতে ১৯২০ সালের গোড়ার দিকেই গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

১৯২০ এর সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেসে অসহযোগ প্রস্তাব পাশ হওয়ার পরে কংগ্রেস সেবীগণ আর নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হন নাই। ফলে শাসন সংস্কারকে মাকাল ফল স্থির করিয়া অগ্রগামী দল সরিয়া পড়েন, পুরাতন নরম পন্থীগণই ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হন।

ক্রমে ডিসেম্বর মাসে (১৯২০) দেশবন্ধুও তাঁহার প্রভূত আয়ের ব্যারিষ্টারি ও সমস্ত ঐশ্চর্য্য পরিত্যাগ করিয়া অসহযোগ ব্রত গ্রহণ করেন। ব্যারিষ্টারি ব্যবসায়ের সময় হইতেই বিপ্লবীগণের উপর তাঁহার অসম্ভব প্রভাব লক্ষিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় বিপ্লবীগণের মোকদ্দমাই তিনি প্রাণ দিয়া করিতেন। তাহাদের এবং তাহাদের আত্মীয়গণকেও সাহায্য করিতেন। বস্তুতঃ সমগ্র ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে একমাত্র দেশবন্ধুর কথাই তাহারা বিনা দ্বিধায় শুনিত।

তিনি এই সমস্ত কর্ম্মীকে তাঁহার অনুসৃত অহিংস নীতি মানিয়া চলিতে নির্দ্দেশ দেন। তাহারাও তাঁহার পন্থাই কার্য্য সাধনের উপযোগী বলিয়া গ্রহণ করিল। অনেকেই আসিল, অনেকে আসিবার জন্য সুযোগ প্রতীক্ষা করিতেছিল, আবার কেহ কেহ আসিল না। বারীনবাবু, পুলিনবাবু আসিলেন না। তাঁহারা বিপ্লবের পথেও আর পদক্ষেপ করেন নাই। বাকী যাহারা আসিলেন না, তাঁহারা সুযোগের অপেক্ষায় রহিলেন।

১৯২১ সালে সমগ্র ভারতে এক প্রবল আন্দোলনের বন্যা প্রবাহিত হইল। হিংসার পথের কল্পনাও কেহ করিতে পারিল না। ১৯২২ সালে মহাত্মাজী ধরা পড়িলেন, অন্যান্য নেতারাও সব কারারুদ্ধ, ক্রমে অসহযোগ একরকম বন্ধ হইবারই উপক্রম হইল। কেহ কেহ আবার হিংসাত্মক কর্ম্মপন্থা অবলম্বনের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ঠিক এই সময়ে বিপ্লবী অবনী মুখার্জ্জি ও নলিনী গুপ্ত বিদেশ হইতে আসিলেন। যুবকগণ তাঁহাদের সঙ্গে আলাপে ঐ দিকেই আকৃষ্ট হইল।

এই সময়ে দেশবন্ধু জেল হইতে বাহিরে আসিলেন। অসহযোগ কার্য্যতঃ বন্ধ দেখিয়া তিনি হতাশ হইলেন। কিন্তু আবার সাহস করিয়া একটি নূতন কর্ম্ম-পন্থা দিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি বলিলেন—"প্রতিনিধিগণ কাউন্সিলে গিয়া কংগ্রেসের অসহযোগ নীতি চালাইবে। তাহাদের কার্য্য প্রতিহত হইলে ভোট-দাতাগণের নিকট তাহারা অগ্রসর হইবে। কাউন্সিলের বাহিরে ভিতরে প্রতিরোধ চলিবে, তবেই অসহযোগ প্রকৃতপক্ষে সক্রিয় হইবে। নতুবা কেবল চরকা লইয়া থাকিলে অথবা কাউন্সিলে, স্কুলে কলেজে যাওয়া হইবে না বলিলেই সেগুলির বিন্দু-মাত্রও ক্ষতি হইবে না। তিনি দেখিলেন চরকার অস্তিত্ব প্রায় লুপ্ত, লোকে কাউন্সি-লের সহিত সমভাবে সহযোগীতা করিতেছে। আর বিদ্যালয়গুলি এখন পূর্ব্বাপেক্ষাও ভরপূর। এদিকে মহাত্মাজীও কারারুদ্ধ, অসহযোগ চালাইয়া উহাকে পুনরায় ক্রিয়াশীল করিবার আর কেহ নাই। সকলেই খোসা লইয়া মারামারি করিতে ব্যস্ত শাঁস গ্রহণে কেহই উৎসুক নয়। এই সন্ধিক্ষণে দেশবন্ধুই প্রকৃত বৈদ্যের ন্যায়

দেশের অবস্থা সম্যক অনুধাবন করিয়া নূতন কর্ম্মপন্থা নির্দ্দেশ করিলেন, আর দেশবন্ধুর কর্ম্মপন্থায় যুদ্ধ বা সংঘর্ষের সম্ভাবনা আছে বলিয়া, সুভাষ প্রভৃতি যুবকগণ উহা সাদরে গ্রহণ করিলেন—ইহাকেই আসল **Fighting programme** মনে করিলেন।

এই সময়ে যদি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন নূতন কর্ম্মপন্থা আবিষ্কার না করিতেন, বাঙ্গলা দেশ পূর্ব্বের ন্যায় গুপ্ত সমিতিতে ভরিয়া যাইত। কিন্তু তিনি যুবশক্তির চিন্তাধারা অনুধাবন করিয়া সংগ্রামমূলক অথচ অহিংস—এই মধ্যপথ প্রবর্ত্তন করিয়া বাঙ্গলার উৎসাহী যুবকগণকে অহিংসার পথেই টানিয়া আনিলেন। তাহারাও সংগ্রামের সুযোগ দেখিয়া গুপ্ত আন্দোলন হইতে বিরত হইল। কার্য্যতঃ দেশবন্ধু প্রবর্ত্তিত পন্থাই ভারতের কল্যাণকর পন্থা বলিয়া পরিগণিত হইল। আজ হইতে পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে সেই পন্থা নির্দ্দেশিত হয়। তাহার পরে দেশের উপর কত ঝড় ঝঞ্ঝা চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সকলেই একবাক্যে স্বীকার না করিয়া পারিবেন না যে দেশবন্ধু প্রদর্শিত পন্থাই ভারতের স্বাধীনতালাভে একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা। ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গিতে ঐ পন্থার কার্য্যকারিতাই স্বরাজ সাধনায় বাহিরে ভিতরে কাজ করিবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে।

তবে দেশবন্ধু এই নূতন পন্থা আবিষ্কার করিলেও স্থানে স্থানে বিপ্লবপন্থাও যে উঁকি ঝুঁকি মারিত না, তাহা নয়। ইহার কিছু কিছু কারণ অনুধাবন করা প্রয়োজনীয়। আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে যে সমস্ত বিপ্লববাদী কয়েদী ছিল, অসহযোগীগণ তাহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করিত। চরিত্রবল, সেবানুরাগ, দেশের স্বাধীনতালাভের প্রতি প্রবল আগ্রহের জন্য উক্ত বন্দীগণ তরুণ অসহযোগীগণের খুবই শ্রদ্ধাকর্ষণ করিয়াছিল। কেহ কেহ এই পন্থার আবশ্যকীয়তাও উপলব্ধি করিল।

এদিকে ১৯২২ সালে চৌরীচুরার পরে যখন মহাত্মাজী আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করিয়া দেন, দেশের প্রধান নেতারাও তাহা অনুমোদন করিতে পারেন নাই। আন্দোলন বন্ধ দেখিয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, পণ্ডিত মতিলাল

নেহরু, লালা লাজপত রায়, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি অনেকেই ক্ষুব্ধ হন। সেই সন্ধিক্ষণে একদল উৎসাহী যুবকের মধ্যেও বিপ্লব পন্থায় আস্থা জন্মিয়াছিল। সেই সময়ে দেশবন্ধু কর্তৃক নবপন্থা প্রবর্তিত হইলেও বিপ্লব পন্থাও যে মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সেই ইতিহাসই বিবৃত হইতেছে। বিপ্লবীগণ কখনও হইত খুব তৎপর, কখনও মন্থরগতি—কিন্তু কোন অবস্থায়ই অহিংসনীতির প্রাবল্যে তাহারা কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। তপাপি সেই সময়কার ইতিহাসও রোমাঞ্চকর। সেই সময়কার উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল সন্তোষ মিত্র, বরেন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি কয়েকটি যুবকের যোগাযোগ। আর কলিকাতার শাঁখারীটোলা পোষ্টমাষ্টার অমৃতলাল রায়ের হত্যা।

শাঁখারীটোলা পোষ্টমাষ্টার হত্যা

১৯২৩ সালের ৩রা আগষ্ট বরেন্দ্র ঘোষ ও অপর তিনটী যুবক বেলা ৩॥টার সময়ে আসিয়া দক্ষিণ পূর্ব্ব দরজা দিয়া পোষ্টাফিসে ঢুকিয়া যায়। তাহাদের মুখোষ পরা ছিল এবং হাতে রিভলভার ছিল। ঢুকিয়াই পোষ্টমাষ্টার অমৃতলালবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলে, "পোষ্টমাষ্টার রূপেয়া দাও"। পোষ্টমাষ্টার উত্তর করে, "কিসের টাকা ?" অমনি তাগার প্রতি লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়ে। অমৃত বাবু তখনই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। ডাকাতরা পলায়ন করে। কেরাণী শ্যামদুলাল দাস ও প্যাকার হরিপ্রসাদ দাস উহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইয়া যায়। পরে শাখারীটোলা ষ্টেলেন, ক্রীক লেন হইয়া সেণ্ট জেমস স্কোয়ারে গিয়া পিস্তল সমেত বরেন্দ্রকে ধরিয়া ফেলে।

বরেন্দ্র ১৮১ হ্যারিসন রোডে থাকিত ও একটা ডিস্পেন্সারীর তত্ত্বাবধান করিত। সেখানেও তল্লাস করিয়া দুইটী রিভলভার পাওয়া যায়। তিনমাস পূর্ব্বে বরেনের বিবাহ হইয়াছিল এবং তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর গভর্ণমেণ্ট আফিসে চাকুরী করিত।

হাইকোর্টের জজ মিঃ জাষ্টিস Page এর বিচারে বরেন্দ্রের প্রাণদণ্ডের আদেশ

হয়। মোকদ্দমার প্রমাণ কম ছিল। মিঃ বি, সি, চাটার্জ্জীর মৌখিক আবেদন মত ৩০৪ ধারানুসারে দোষ স্বীকার করায় জজের উচিত ছিল তখনই দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়া। আদালতের প্রথা এইরূপই ছিল। কিন্তু জজ পেজ্ সাহেব তাহা না করিয়া আসামীর দায়ে পড়িয়া স্বীকৃতি এবং অন্য সামান্য প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেয়। ইহার পরে ফুলবেঞ্চে হাইকোর্টে এবং প্রিভিকাউন্সিলে আপিল করিয়াও কোন ফল পাওয়া যাই নাই। তবে শেষাশেষি বরেনের ফাঁসি না হইয়া দ্বীপান্তরই হয়।

শ্রীযুক্ত সন্তোষ মিত্র, গিরীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বরেন্দ্রের সহিত মিশিত এবং সকলেই ছিল শ্রীবিপিন গাঙ্গুলী মহাশয়ের দলভুক্ত। এই সময় পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের কর্ত্তা ছিল টেগার্ট সাহেব,—পরে স্যার চার্ল্‌স টেগার্ট।

অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার অব্যবহিত পরেই এই ঘটনা কোন বিপ্লবী নেতার নির্দ্দেশ মতে হয় নাই। সন্তোষ মিত্র, বরেন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি নিজ দায়িত্বেই ঐরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হয়।

ইহার পরেই সন্তোষ মিত্র প্রভৃতি তিন চারিজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দিয়া একটী ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা উপস্থিত করা হয়। আর ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ডাক্তার যাদুগোপাল মুখার্জ্জি, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ, মনোমোহন ভট্যাচার্য্য, প্রতুল গাঙ্গুলী, রবীন্দ্র মোহন সেন, মনোরঞ্জন গুপ্ত, ভুপেন্দ্র দত্ত, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী, ভূপতি মজুমদার প্রভৃতি সতের জনকে ধৃত করিয়া ১৮১৮ সালের তিন রেগুলেশন অনুসারে অন্তরীণে আবদ্ধ করা হয়।

আর যে ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় সন্তোষ মিত্র, সুবোধ লাহিড়ী ও ধীরেন রায়ের নামে উপস্থিত করা হয়, তাহাতে জুরীরা সকল আসামীকেই নির্দ্দোষ বলায় জজ মিঃ এস, কে, ঘোষ উহাদিগকে ছাড়িয়া দেন। এই মোকদ্দমার আসামীদের পক্ষ সমর্থন করেন দেশপ্রিয় যতীদ্রমোহর সেনগুপ্ত; অপূর্ব্ব মুখার্জ্জী প্রভৃতি।

ইহার পরে ১৯২৪ সালের ১২ই জানুয়ারী তারিখে একটী দুর্ঘটনা হয়। তখন

দেশবন্ধু বিজয়ী বীরের ন্যায় কাউন্সিলের অধিকাংশ আসনগুলিই দখল করিয়া ফেলিয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশনও প্রায় নিজ করায়ত্তে আসিয়া পড়িয়াছে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র তখনও চীফ একজিকিউটিভ অফিসার হন নাই। তবে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন ও 'ফরওয়ার্ড' নামক ইংরাজী দৈনিক পত্র পরিচালনা করিতেছিলেন। সেই সময়ের একটী ঘটনা উল্লেখ করিতেছি—

গোপীনাথ সাহা নামক এক যুবকের, কোন নেতার উপদেশ বা আদেশ মত নয়, নিজ হইতেই সঙ্কল্প হয় যে গোয়েন্দা পুলিশের কর্ত্তা টেগার্ট সাহেবকে ইহধাম হইতে সরাইতে হইবে। তাই ১৯২৪ সালের ১২ জানুয়ারী তারিখে সকালবেলা, আন্দাজ সাড়ে আটটার সময় আর্ণেষ্ট ডে নামক কিলবার্ণ কোম্পানীর একজন সাহেব যে সময় চৌরঙ্গীরোডে হল এণ্ড এণ্ডারসন কোম্পানীর পাশ দিয়া আসিতেছিল, গোপীনাথ মিঃ টেগার্ট মনে করিয়া তাহাকেই গুলি করে। মিঃ ডে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় এবং অতঃপর গোপীনাথ পার্কষ্ট্রীট দিয়া পূর্ব্বদিকে দৌড়াইবার সময় ধৃত হয়। হাইকোর্টের বিচারে গোপীনাথের ফাঁসির হুকুম হয়। ধরা পড়িবার দেড়মাস পরে ১লা মার্চ্চ তাহার ফাঁসি হইয়া যায়। এই কয়েকদিন মধ্যে তাহার ওজন ৫ পাউণ্ড বাড়িয়া যায়। সে খুব সাহসী ও বেপরোয়া গোছের ছেলে ছিল। যে দিন ফাঁসি হইবে, তাহার পূর্ব্বের রাত্রিতেও তাহার সুনিদ্রা হইয়াছিল। নির্ভীক ভাবে সে ফাঁসিমঞ্চে আরোহণ করে। যখন হাকিম মিঃ জাষ্টিস্ তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেয়, সে দৃপ্তস্বরে বলিয়া উঠে, "আপনি যে আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়াছেন, তাহাতে আমি খুবই উৎফুল্ল হইয়াছি, কারণ আমার আশা আছে, আমার প্রত্যেক রক্তবিন্দু ভারতের প্রতি গৃহে ও পরিবারে স্বাধীনতার বীজ বপন করিবে।" মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার মায়ের কাছে চিঠিতে লিখিয়াছিল :—

"আমার মত ছেলের মা তুমি এই তোমার গৌরব। শোক করিবার কিছুই নাই। প্রতি জননী যেন তোমার আদর্শে তোমার পুত্রের ন্যায় নির্ভীক পুত্র প্রসব করিয়া ভারতভূমির মুখ উজ্জল করিতে সমর্থ হয়।"

ফাঁসির সময়ে সুভাষচন্দ্র ও অন্যতম দেশ সেবক পূর্ণচন্দ্র দাস মহাশয় জেলের ফটকের সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন।

ইহার পরে সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক সম্মেলনে দেশবন্ধুর উপস্থিতিতে গোপীনাথের সাহস ও ত্যাগের প্রশংসা করিয়া একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেই সভার অধিনায়ক ছিলেন মৌলানা আকরাম খাঁ। দেশবন্ধুর উপস্থিতি ও সম্মতিক্রমে প্রস্তাব পাশ হয়। মে মাসে কিন্তু এই প্রস্তাব লইয়া নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে বড় মত বিরোধ দেখা দেয়। মহাত্মা গান্ধীও তাহার সাহসের প্রশংসা করিলেও কার্য্যের নিন্দা করেন। আর অহিংসোপাসক দেশবন্ধু তাহার কার্য্য বিপথ চালিত বলিলেও তাহার আত্মত্যাগ ও সাহসের প্রশংসা করেন। উভয় প্রস্তাবের মধ্যে পার্থক্য বিশেষ কিছুই নাই। কেবল কথার মারপ্যাঁচ মাত্র।

দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণের পরেও মহাত্মা বলিয়াছিলেন, "গোপীনাথ সাহা সম্পর্কে আমাদের বিরোধ প্রেমিকের কলহ মাত্র।" সত্যই ইহা যে বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ লাহোর ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার মৃত্যু দণ্ডপ্রাপ্ত ভগবৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের ফাঁসিমঞ্চে আরোহণ করিবার পরে মহাত্মার উপস্থিতিতে করাচী কংগ্রেস অধিবেশনে (১৯৩১) ঠিক গোপীনাথের মতই, বরং আরও জোরালো একটি প্রস্তাব পাশ করেন। যথাসময়ে সে সম্বন্ধে আলোচনা উপস্থিত করিব।

টেগার্টভ্রমে ডে সাহেবের হত্যাও ব্যক্তিগত ইচ্ছার বশে হইয়াছে, কোন দলের সঙ্কল্পিত পন্থা হিসাবে নয়। তথাপি গোপীনাথ সাহার সাহস, দেশপ্রেম, মৃত্যুভয়-শূন্যতা খুবই শ্লাঘনীয়।

১৯২৪ সালে স্বরাজ্য দলপতি দেশবন্ধু সদলবলে কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই রাজনৈতিক বন্দীগণের মুক্তি প্রস্তাব পাশ করাইয়া লন। আর কেন্দ্রীয় পরিষদেও যাহাতে ঐরূপ প্রস্তাব পাশ হয় তাঁহার সভাপতিত্বে ১৯২৪ সালের জানুয়ারীতে নিম্নলিখিত দাবী উপস্থিত করা স্থির হয়ঃ

"রাজনৈতিক বন্দীগণের মুক্তি ও চণ্ডনীতি মুলক আইনের প্রত্যাহার দাবী উপস্থিত করিতে হইবে।"

এদিকে বাঙ্গলা সরকার বিনা কারণে ১৯২৪ সনের ২৫ অক্টোবর তারিখে কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী স্থানে থানা তল্লাস করিয়া শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ও অনিলবরণ রায় প্রমুখ প্রায় ৭০ জন স্বরাজ্য দলের বিশিষ্ট কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিলেন। সুভাষচন্দ্র তখন কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ্ একজিকিউটিভ্ অফিসার, সত্যেন্দ্রচন্দ্র স্বরাজ্যদলের সম্পাদক আর অনিলবরণ রায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক। দেশবন্ধু তখন কংগ্রেস নেতা, স্বরাজ্যদলপতি এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র। তিনটী প্রধান কেন্দ্রের প্রধান কর্ম্মসচিব বুরোক্রেসী কর্ত্তৃক অপসারিত হইয়াছেন। দেশবন্ধুর ক্ষোভের সীমা রহিল না। তিনি মনে করিলেন ইহা বুরোক্রেসীর হিংসা ও আক্রোশের ফলেই হইয়াছে। তিনি স্পষ্টভাবে কোর্পোরেশনের আসন হইতে ঘোষণা করিলেন—

If love of country is a crime, I plead guilty to the charge. If Subhas is a creminal, I am a creminal.

ইহার পরেই ১৯২৪ সালের গোড়ায় বাঙ্গলার গভর্ণর লর্ড লিটন অর্ডিনান্স (Bengal Crcminal Law Amendment Ordinance) নামে একটী জরুরী আইন পাশ করিয়া লন। ইহার উদ্দেশ্য এই যে দেশে বিপ্লবাত্মক কার্য্যের জন্য যে সমস্ত অপরাধ সংঘটিত হয়, তজ্জন্য পূর্ব্বে যে হাইকোর্টের জজের দ্বারা ট্রাইবুন্যাল গঠিত হইত, সেইরূপ না হইয়া জিলার জজ এবং অন্য দুইজন বিচারক সহ ট্রাইবুন্যাল গঠিত হইয়া বিচার চলিতে পারিবে। যাহাকে খুসি

* Release of Political prisoners, Repeal of all constitution of India repressive law and summoning of a National convention to lay down the lines of the future.

বিনা বিচারে আটক করিতে পারিবে এবং বিপ্লবাত্মক কার্য্যের সন্ধান পাইলে পুলিস বিনা ওয়ারেণ্টেই খানা তল্লাস করিতে পারিবে।

গভর্ণর লর্ড লীটন এই আইনটি পাশ করাইবার পূর্ব্বে নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের দৃষ্টান্ত দেন। এই নগেন্দ্র মুসলমান পাড়া বোমা মোকদ্দমায় অসামী হইয়া যে মুক্তিলাভ করে তাহা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এসম্বন্ধে বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় পুলিসের কার্য্য পদ্ধতির বিরুদ্ধে যে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। মুক্তিলাভ করিয়া নগেন্দ্র বিলাত যায়। লর্ড লীটন বলেন যে নগেন্দ্রের সঙ্গে দেখা করিয়া তিনি তাহার স্বীকারোক্তি পাইয়া এই আইন প্রয়োগের ঔচিত্য সম্বন্ধে দ্বিধা শূন্য হইয়াছেন। তিনি প্রকাশ করেন, "১৯২১ সালে বিলাতের নিউক্যাসল বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যখন যাই, সেখানে ছাত্র সমিতির প্রত্যেকের মুখে নগেনের প্রশংসা শুনিতে পাই। লণ্ডনে আসিয়া আমি নগেনের প্রকৃত পরিচয় পাই এবং ১৯২২ সালে এই বাঙ্গলা দেশে আসিয়া নগেনের সঙ্গে বেহালার অক্সফোর্ড মিশনে দেখা করিলে সে অনুতপ্ত হৃদয়ে নিজের দোষ স্বীকার করে। অর্থাৎ মুসলমানপাড়া লেনে বসন্ত চট্টো-পাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে বোমা সেই নিক্ষেপ করিয়াছিল সেকথা স্বীকার করে।

লর্ড লিটন যেমন আইনটি পাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, দেশবন্ধুও অসুস্থ শরীরে উহা বাধা দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। ফলে দেশবন্ধুই ৬৬ ভোট পাইয়া জয়ী হন। গভর্ণমেণ্ট পক্ষীয় মডারেট প্রতিনিধি ও সরকারী কর্ম্মচারী মিলিয়া পায় মাত্র ৫৭ ভোট। তবে লর্ড লিটন উহা অতিরিক্ত ক্ষমতা বলে by Certification পাশ করেন।

ইহার পাঁচ ছয় মাস মধ্যেই দেশবন্ধু মহাপ্রয়াণ করেন। তিনি অহিংসার একজন খাঁটি উপাসক হইয়াও বিপ্লববাদীগণের প্রতি কিরূপ দরদী ছিলেন অন্যতম বিপ্লবী নেতা শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কথায়ই বলিতেছি—

* Defence of Inian Act এর কার্য্যকাল ফুরাইয়া গেলে রাজনৈতিক বন্দীগণের শাস্তি বিধান সাধারণ আইনে হইত।

"বিপ্লববাদীদের সঙ্গে তাঁহার কি সম্বন্ধ ছিল এ সম্বন্ধে সংবাদপত্রে ও লোকের মুখে অনেক শুনিয়াছি। আমি একথা ভাল করিয়াই জানি অহিংসাকে তিনি নিজের creed হিসাবে মানিয়া লইয়াছিলেন। এখন আর এসব আলোচনায়, লাভ নাই। এখন শুধু মনে পড়ে সে দিনের কথা, যে দিন জেলের ভিতর শুনিলাম দেশবন্ধু আর ইহলোকে নাই। সেই দিন মনে হইয়াছিল, বাংলা দেশে আর আমাদের দাঁড়াইবার ঠাঁই রহিলনা।"

দেশবন্ধুর তিরোধারেন পরে হিংসা আবার বেশ প্রবল হইয়া উঠে। প্রথমে যে এক আধটু এখানে সেখানে সামান্য চেষ্টা হয়, সুযোগ পাইয়া তাহাই ভীষণ আকার ধারণ করে।

কাকোরি ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা

এই দ্বিতীয়বার দল গত ভাবে খাঁটি বিপ্লব আন্দোলন যুক্ত প্রদেশেই আরম্ভ হয়। তবে এ প্রদেশের আন্দোলনের মূলেও ছিল বাঙ্গলা দেশের বিপ্লবীরাই। ইহাদের মধ্যে তিনজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য—প্রথম শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, দ্বিতীয় যোগেশচন্দ্র চাটার্জ্জি, তৃতীয় রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী। এতদ্ব্যতীত ভূপেন্দ্র সান্যাল (শচীন্দ্রের সহোদর), সুরেশ ভট্যাচার্য্য, গোবিন্দকর, প্রণবেশ চাটার্জ্জি, রাজকুমার সিংহ, শচীন্দ্রনাথ বকৃশী, মন্মথনাথ গুপ্ত ও বিশেষ সহায়ক ছিল।

শচীন সান্যালের নাম সকলেই অবগত আছেন। ইনিই পূর্ব্বে উত্তর ভারতে বিপ্লবী বীর রাসবিহারী বসুর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার যে ১৯১৫ সালে বেনারস ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডভোগ হয়, প্রথমখণ্ডে বিষদভাবে তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ১৯২০ সালে মুক্তিলাভ করিয়া ইনি বাঙ্গলা দেশে আসেন ও শান্তিপুরের আশুতোষ লাহিড়ীর কন্যার সহিত পরিণীত হইয়া কিছুদিন সেখানে অবস্থান করেন। ১৯২৩ সালের কংগ্রেসের দিল্লীর বিশেষ অধিবেশনে সস্ত্রীক, মাতা ও মাসীমাতা সহ উপস্থিত ছিলেন। সেখানে তিনি বিপ্লব সম্বন্ধে বাঙ্গলা দেশে এবং দিল্লীতে বাঙ্গালী যুবকদের সঙ্গে আলোচনার

সুবিধা পান এবং কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের অধিকাংশের পরিবর্ত্তন বিরোধী মনোভাবে (No change policy) বীতশ্রদ্ধ হইয়া পূর্ব্বপন্থা প্রচারে ব্রতী হন। শচীন সান্যালেরই চেষ্টায় দক্ষিণ কলিকাতায় একটি বিপ্লবী দল গঠিত হয়। ইহার প্রধান কর্ম্ম কর্তা ছিল যতীন দাস, দেবেন বসু, সুধীন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইতিপূর্ব্বে শচীনবাবু স্বনামধন্য রাসবিহারী বসুর সহিত ও তাঁহার নির্দ্দেশে যে সকল বিপ্লবাত্মক কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার একটি ইতিহাস প্রথম 'নারায়ণে ও পরে 'বঙ্গবাণী' মাসিক পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন। ইহাই পরে 'বন্দীজীবন' নামক পুস্তকাকারে লেখাগুলি প্রকাশিত হয়। শচীনবাবু দিল্লী কংগ্রেসের পরেই বাঙ্গলা ও যুক্ত প্রদেশে প্রচার কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। সৌভাগ্যক্রমে দেশবন্ধুর নীতি দিল্লী কংগ্রেস অধিবেশনে কতকাংশ জয়যুক্ত হওয়ায়, কর্ম্মীগণ স্বরাজ্যদলের নীতির পক্ষপাতিই থাকিয়া যান বলিয়া বাঙ্গলায় সশস্ত্র বিপ্লব পন্থা এবার চার পাঁচ বৎসরের মধ্যে কোনরূপ দানা বাধিতে পারে নাই। কিন্তু যুক্ত প্রদেশে অল্পসময়ের মধ্যেই একটি দুর্দ্ধর্ষ বিপ্লবী দল গড়িয়া উঠে। আর শচীন সান্যালকে এই দলের মস্তিষ্কই বলা যাইতে পারে। চাটার্জ্জি ছিল ইহার প্রচারক, এবং রাজেন লাহিড়ী ও রামপ্রসাদ প্রধান কর্ম্মী।

শচীন সান্যালের বিপ্লবী দলের উদ্দেশ্যও গঠন প্রণালী শ্বেতপত্র নামক পুস্তিকায় (White paper) বিবৃত করেন। পুস্তকখানি সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য সুগঠিত ও সশস্ত্র বিদ্রোহাবলম্বনে বিভিন্ন রাজ্যগুলির একীকরণ —শেষ শাসন প্রণালী (অর্থাৎ যখন তাহাদের সিদ্ধান্তানুসারেই তাহারা কাজ করিতে পারিবে) জনসাধারণের প্রতিনিধিদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইবে। সকলের নির্ব্বাচনাধিকার থাকিবে এবং কোন রকমেই যেন একজন অপরের ক্ষতি বা অসুবিধা করিতে না পারে সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। রাস্তাঘাট যান-বাহনাদি সবই জাতীয় লোকের দ্বারা পরিচালিত হইবে। শ্বেতপত্রে বোলসেভিক নীতিই সমর্থিত হইয়াছে। বিদেশীয়দের এই দেশ শাসন করিবার অধিকার নাই এবং তাহাদিগকে বিতাড়ন সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। বিধিসঙ্গত আন্দোলনে

স্বাধীনতা লাভ হইতে পারে না বলিয়াই বিপ্লবপন্থার অনুসরণ করিতে হইবে। ইত্যাদি কথা শ্বেতপত্রে বর্ণিত ছিল।

সবুজপত্রের নির্দ্দেশও কতকটা শ্বেতপত্রের নির্দ্দেশেরই অনুরূপ। তবে ইহা সম্প্রদায়ের সভ্যদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। এই মতবাদ লইয়াই 'হিন্দুস্থানী সেবাদল' গঠিত হয়।

শচীন সান্যাল এই শ্বেতপত্র রচনা ও প্রচারের জন্য রাজদ্রোহের অপরাধে বাঁকুড়ায় মেয়াদ খাটেন। তাঁহার ১২৪ ক ধারানুসারে দুইবৎসরের জন্য জেল হইয়াছিল।

শচীন সান্যাল যখন দিল্লী, কাশী, কলিকাতা ও শান্তিপুরে বিদ্রোহের জন্য যুবকগণকে তৈয়ার করিতে প্রবৃত্ত, ঢাকার যোগেশ চাটার্জ্জি ও গোবিন্দ কর তখন যুক্ত প্রদেশে প্রচার কার্য্য করিতে নিযুক্ত থাকেন।

ঢাকা জেলার গাটদিয়া নিবাসী যোগেশ চাটার্জ্জি, ১৯২৩ এর গরমের সময়ে দিল্লী কংগ্রেসের কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশ হইতে এলাহাবাদে যান। সেখান হইতে কাশীতে আসেন। কাশীতে কোন কোন স্থানে তিনি প্রফুল্লচন্দ্র রায় নামে পরিচয় দেন। সাধারণতঃ রামপ্রসাদ প্রভৃতি কর্ম্মী তাঁহাকে রায় মহাশয় বলিয়াই জানিত। যোগেশের প্রচার কার্য্যের ফলে কয়েকটি জিলা সমিতি গঠিত হয়। সব জিলা সমিতি লইয়া একটি প্রাদেশিক সংগঠন হয়। রাজেন লাহিড়ী ছিল প্রাদেশিক সংগঠনের নায়ক। যোগেশ চাটার্জ্জি, গোবিন্দ কর ও বিভিন্ন কর্ম্মীদের চেষ্টায় যে ২৩টি জেলায় সমিতি গঠিত হয়, তাহাদের নাম—

---

* The object of the Association is to establish a federated Republic of the states of India by an organised and armed revolution, that the final form of the constitution of the Republic be framed and declared by the representative of the people at the time when they will be in a position to enforce their decisions, that the basic principle of the Republic shall be universal sufferage and the abolition of all systems which make exploitation of man by man possible.

কাশী, প্রয়াগ, প্রতাপ গড়, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, ফতেপুর, জৌনপুর, ঝাঁসি, হামিরপুর, ফরাক্কাবাদ, মাইনপুরী, এটোয়া, আগ্রা, আলিগড়, মথুরা, বুলন্দসর, মীরাট, দিল্লী, এটা, পিলিভিত, সাজাহানপুর ও মজঃফর নগর।

১৯২৪ সালের জুলাই মাসে যোগেশ, শচীন বকশীও স্থরেশ ভট্যাচার্য্য-এর সহাতায় সাহরণপুরে জিলা সমিতি গঠন করেন। এবং রামপ্রসাদ সাজাহানপুরে জিলা নায়ক ছিলেন। স্থরেশ ভট্যাচার্য্য ছিলেন কানপুরের, বানোয়ারী ছিলেন রায়-বেরিলির। রাজেন লাহিড়ীও প্রাদেশিক নেতা হইবার পূর্ব্বে প্রতাপগড়ের জিলা নায়ক ছিলেন। এই সমস্ত সমিতির উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীনতা লাভ এবং দেশ সেবাই তাঁহাদের প্রধানকার্য্য বলিয়া স্থিরীকৃত হয়।

প্রকাশ্য ও গুপ্ত দুই প্রকারেই প্রচার কার্য্য চলিত। কংগ্রেস সমিতির বিরুদ্ধে কর্ম্মীদিগকে বুঝান হইত, আর যথাসম্ভব কংগ্রেসে ঢুকিয়া প্রচারকার্য্য করা সহজ বলিয়া কংগ্রেসের ভিতরে আসিবার নির্দ্দেশ থাকিত।

যুক্ত প্রদেশস্থ সমস্ত স্থানে প্রচারকার্য্য করিবার জন্য ও আগ্নেয়াস্ত্র কিনিবার জন্য ডাকাতি ও লুণ্ঠন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা হইত।

কাশীতে বিপ্লবীদের প্রধান আড্ডা ছিল। শচীন সান্যাল ও তাঁহার সহোদরগণ সকলেই পূর্ব্বে এখানে থাকিতেন। দামোদর স্বরূপ এখানকারই ছেলে। যোগেশ চাটার্জ্জি যে কিছুদিন এখানে ছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। রাজেন্ লাহিড়ীর জ্যেষ্ঠ সহোদর জিতেন লাহিড়ী কাশীতেই হোমিওপাথিক চিকিৎসক ছিলেন। শচীন-এর কাশীতে বাসস্থান ছিল পাতালেশ্বর।

যে সমস্ত ডাকাতি হয়, তন্মধ্যে কাকোরী ট্রেন ডাকাতিই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই ডাকাতির সময় শচীন সান্যাল ও যোগেশ চাটার্জ্জি উভয়েই জেলে ছিলেন। শ্বেতপত্র বাহির করিবার জন্য শচীন্দ্র সান্যালের বাঁকুড়ায় জেল হয়—জানুয়ারী ১৯২৫ হইতে আর যোগেশ কলিকাতায় ১৯২৪ সালের ১৯শে অক্টোবর তারিখে বেঙ্গল অর্ডিনান্স অনুসারে অন্তরীণাবদ্ধ হন এবং কাকোরী

ডাকাতি হয় ১৯২১ সালের ৯ই আগষ্ট তারিখে। যোগেশ কলিকাতা আসিয়াছিলেন যুক্তপ্রদেশের সংগঠন অবস্থা বন্ধুগণকে জ্ঞাত করিবার জন্য।

আউধ্ রোহিলখণ্ডে সাহাজানপুর হইতে ডাউন ট্রেন কাকোরী আসে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায়, ইহার পরের ষ্টেসন আলমনগর। এই আলমনগরে ট্রেন ডাকাতি করিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে ৭ই ও ৮ই লোকজন একত্রিত হয়, কিন্তু স্থবিধা না পাওয়ায় উৎযোক্তাগণ তাহাদের প্রধান আড্ডা লাক্ষ্ণৌতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। যাহাইউক ৯ই তারিখে কাকোরী হইতে আলমনগরের দিকে রেলগাড়ী মাত্র একমাইল অগ্রসর হইবার পরে হঠাৎ কামরা হইতে তিনজন যাত্রী শিকল টানিয়া ট্রেন বন্ধ করিয়া দেয়। অমনি রাজেন লাহিড়ী, রামপ্রসাদ ও মুকুন্দলাল গার্ডের ভ্যানের দিকে যাইয়া একটী লোহার সিন্দুক বাহির করিয়া ফেলে। ইহাদের হাতে পিস্তল ছিল এবং যাহারা তুর্ঘটনা আশঙ্কা করিয়া ট্রেন হইতে নামিয়াছিল তাহারা সকলে গাড়ীতে উঠিয়া পড়ে। রিভলবারের গুলিতে একজন যাত্রী নিহত হয় ও কয়েকজন আহত হয়। মাঝের ষ্টেসনগুলি হইতে সংগৃহীত অর্থ লোহার সিন্ধুকে ছিল এবং অনুমান ৪৫৫৩ হাজার টাকা মজুত ছিল। ডাকাতের দল লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিয়া টাকা লইয়া প্রস্থান করে। দলের মধ্যে কেবল এই তিনজই ছিলনা, আশে পাশে সব সহকর্ম্মী উপস্থিত ছিল। টাকা সরাইতে তাহারাও বিশেষ সহায়তা করে। ডাকাতির তুই তিনদিন পূর্ব্বে দলটি প্রথমে সাজাহানপুরে রামপ্রসাদের সঙ্গে মিলিত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তুইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিবার পরে এইবার ইহারা সফলকাম হয়। রামপ্রসাদ, বনোয়ারী লাল, রাজেন্দ্র লাহিড়ী, মন্মথনাথ গুপ্ত, মুকুন্দী লাল, স্থরেশ ভট্যাচার্য্য, দামোদর স্বরূপ, রাজকুমার সিংহ, প্রেমকিশন খান্না, গোবিন্দ কর, **D. N. Chaudhury**, হরগোবিন্দ প্রভৃতি এই কাকোরী ট্রেন ডাকাতিতে ছিল। এই ডাকাতিতে সমিতির সভ্য ছাড়া কয়েকজন পেশাদারী ডাকাত সংশ্লিষ্ট ছিল। তবে তাহারা সমিতির দলপতির নির্দ্দেশ মানিয়া চলিত।

কাকোরী ডাকাতি ছাড়া আরও কয়েকটি ডাকতি ইতিপূর্ব্বে সংঘঠিত হয়।

প্রথমটি হয় ১৯২৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর, রামরৌলির বলদেও প্রসাদের বাড়ীতে। গ্রামটি পিলিভিত জিলায় অবস্থিত। গৃহ স্বামী বলদেও ডাকাতদিগকে মারিতে গিয়া আহত হয়, আর মোহনলাল নামক একব্যক্তি গুলির আঘাতে নিহত হয়। প্রায় হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয়। রামপ্রসাদ, রওসন সিংহ, মন্মথ গুপ্ত, আস্‌ফাক্ উল্লা প্রভৃতি ইহাতে সংশ্লিষ্ট ছিল।

দ্বিতীয়টিও উক্ত জিলার বীচপুরী গ্রামে হয়। আর ইহাতে রামপ্রসাদ, মন্মথনাথ গুপ্ত, রামকৃষ্ণ ক্ষেত্রী, রাজকুমার সিং ও শচীন বক্‌শী প্রভৃতি ছিল। সেখানে জ্যোতি কুর্ম্মীর বাড়ীতে ১৯২৫ সালের ৯ই মার্চ্চ তারিখে ডাকাতি হয়। এখানেও কয়েকজন আহত হয়, শ্যামলাল নিহত হয় এবং কোথায় টাকা আছে প্রথমে বলিতে অস্বীকার করায় জ্যোতি কুর্ম্মীর দুই পায়ের মধ্যে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। প্রতাপগড় জিলার দ্বারকপুর গ্রামে শিওরতন বনিয়ার বাড়ী ১৯২৫ সালের ২৪শে তারিখে যে ডাকাতি হয় তাহাতে রামশরণ নামে জনৈক ব্যক্তি নিহত ও কয়েকজন আহত হয়।

এই সমস্ত ডাকাতি, শচীন সান্যাল রচিত বন্দীজীবন, শ্বেতপত্র, দেশবাসীর প্রতিবাণী ও সবুজপত্র প্রভৃতি দলিলপত্র, বিস্ফোরক পদার্থ প্রাপ্তি ও বিভিন্ন আসামীর সম্মেলন প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া কাকোরী ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা খাড়া হয়। মিঃ হটন নামে পুলিসের জনৈক ডি, আই, জি এই মোকদ্দমার তদন্ত পরিচালনা করেন। প্রায় ২৬ জন আসামীকে চালান দেওয়া হয়। শচীন বক্‌সী, আসাফাক উল্লা প্রভৃতি কয়েকজন ফেরার হয় আর দামোদর স্বরূপ পীড়িত থাকে বলিয়া আদালতে উপস্থিত হইতে অসমর্থ হয়। দামোদর স্বরূপের বিচার হইতে পারে নাই। পুলিশের অমানুষিক নির্যাতনে জেলখানায় সে মারা যায়।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট সৈয়দ আইন উদ্দীন, ১৯২৫ সালের ১৬ এপ্রিল ২১জনকে দায়রায় সোপর্দ্দ করে ও স্পেসাল জজ মিঃ হ্যামিটলনের আদালতে লাক্ষ্ণৌতে বিচার হয়। মোকদ্দমা সুরু হয় ১৯২৬ সালের ৩রা মে হইতে এবং ১৯২৭ সালের ১২ ফেব্রুয়ারী শেষ হয়। ইতিমধ্যে তিন সপ্তাহ

কাল আসামীরা অনশন ব্রত অবলম্বন করায় দুর্ব্বলতা বশতঃ আদালতে উপস্থিত হইতে সমর্থ হয় নাই। সরকারী উকীল পণ্ডিত জগৎ নারায়ণ লাল গভর্ণমেণ্টের পক্ষে ছিলেন, আসামীদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন কলিকাতার খ্যাতনামা কৌন্সিলি মিঃ বি. কে. চৌধুরী। মোকদ্দমায় দুইজন রাজসাক্ষী ছিল, বানার্সি লাল ও ইন্দুভূষণ মিত্র। এতদ্ব্যতীত আরও ২৪৭ জন সাক্ষী ছিল।

আসফাক্ উল্লা, শচীন্দ্র বকসী ও চন্দ্রশেখর আজাদ ফেরারী আর দামোদর স্বরূপের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ১৯২৭ সালের ৬ই এপ্রিল তারিখে নিম্নলিখিত শাস্তি প্রদান করা হয়—

মৃত্যুদণ্ড—রাজেন লাহিড়ী, রামপ্রসাদ, রৌসন সিং

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর—শচীন সান্যাল

চৌদ্দবৎসর কারাদণ্ড—মন্মথ গুপ্ত

দশবৎসর কারাদণ্ড—যোগেশ চাটার্জ্জি, গোবিন্দ কর (গায়ে bullte-এর এখনও দাগ আছে, পুলিসের সঙ্গে fight দেয়)

সাতবৎসর „—সুরেশ ভট্যাচার্য্য, বিষ্ণুশরণ দোবে

পাঁচ বৎসর—বনোয়ারী লাল, ভূপেন্দ্র সান্যাল, মুকুন্দিলাল, পরমেশ কুমার প্রেম কিশেন খান্না, রাজকুমার সিং, রামদুলারী ত্রিবেদী, রামকিশেন ক্ষেত্রী *, হরগোবিন্দ ও রামনাথ পাণ্ডে মুক্তিলাভ করে।

ইহার পরে আস ফাক্ উল্লা ও শচীন্দ্র বক্শীর বিচর হয়। আস্ ফাক্ উল্লার মৃত্যুদণ্ড হয়।

চন্দ্রশেখর আজাদকে কয়েক বৎসর পরে ১৯৩১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী এলাহাবাদের এলফ্রেড পার্কে পুলিস ধরিতে উদ্যত হয়। যিনি ধরিতে আসেন তিনি একজন শ্বেতাঙ্গ পুলিস, সঙ্গে ছিল এক গোয়েন্দা। সেখানে ছোট খাট একটা যুদ্ধ হয়। শ্বেতাঙ্গটি ভীষণভাবে আহত হয়, আর আজাদ বিশেষ

---

* রামকিশেন বাঙ্গালী মেয়ে বিবাহ করে।

নির্ভীকতার সহিত বুঝিয়া পরে নিজের গুলির আঘাতেই আত্মহত্যা করে, তবু ধরা দেয় না। পণ্ডিত জওহরলাল এই ঘটনায় চন্দ্রশেখর আজাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

মোট্ মাট্ চারিজনের মৃত্যুদণ্ড হয়। পরে আপিল হয় লক্ষ্ণৌর জুডিসিয়াল কমিসনার স্যার লুইস্ ষ্টুয়ার্টের কাছে। তিনি হ্যামিলটনের রায়টিই বহাল রাখেন। পরে প্রিভি কাউন্সিলে আপিলের দরখাস্ত করা হয়, কিন্তু আপিলের জন্য আবেদন মঞ্জুর হয় না।

ফাঁসির দণ্ড হইবার আটমাস পরে, ১৯২৭ সালের ১৭ই ডিসেম্বর, গোণ্ডাজেলে রাজেন্দ্র লাহিড়ী প্রভৃতির ফাঁসি হইয়া যায়।

এই মোকদ্দমার কাগজ পত্র দেখিয়া আমাদের প্রতীতি জন্মিয়াছে, চারিজন ভদ্রযুবকের দণ্ডবিধি আইনের ৩৯৬ ধারানুসারে চরমদণ্ড প্রদান করা বিচারকের পক্ষে অতীব গর্হিত কার্য্য হইয়াছে। ডাকাতির যথেষ্ট প্রমাণ থাকিলেও কে যে হত্যা করিয়াছে তাহার প্রমাণ এত দুর্ব্বল যে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সাধারণতঃ ডাকাতির দণ্ড হয় ৫।৭ বৎসর। খুব নিষ্ঠুরতা বা গর্হিত হইলে দ্বীপান্তর হয়। ৩৯৬ ধারায় মৃত্যুদণ্ড থাকিলেও তাহা দেওয়া হয় না, আর হত্যার দুর্ব্বল প্রমাণ থাকিতে হয়ই না এবং হওয়াও অত্যন্ত অন্যায়। এই ডাকাতিতে যে লোকটি হত হইয়াছে তাহাকে কে গুলি করিয়াছে, নিঃসন্দেহে প্রমাণ না হওয়ায় মৃত্যুদণ্ড প্রদান বিচারের প্রহসন ও নৃশংসতার চরম নিদর্শন ভিন্ন আর কিছুই নয়।

এই মোকদ্দমায় রাজসাক্ষী ছিল বানার্সি লাল এবং ইন্দুভূষণ মিত্র। স্বীকারোক্তি করে বনোয়ারী লাল। ইহাদের উক্তি বিশ্বাস করা ন্যায় সঙ্গত হয় নাই। কিন্তু ইহাতে বরং ইংরাজেরই বেশী ক্ষতি হইয়াছে। কারণ রাজেন লাহিড়ী প্রভৃতির ফাঁসির পর হইতেই ভারতের সর্ব্বত্র বিপ্লব পন্থা আবার প্রকট হইয়া পড়ে। বৎসরেক পরে ১৯২৮ সালে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে বিপ্লবীরা সর্ব্বস্থান হইতে আসিয়া সমাগত হয়। ভগবত সিংহ এবং যতীন দাশ, সূর্য্য সেন এবং তাহার সহকর্ম্মীগণ সেখানে তাহাদের কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণ করে এবং অতঃপর

ভগবত সিংহ ও সূর্য্যসেন ভারতের দুই প্রান্ত হইতে যে বিপ্লবাগ্নি প্রজ্বলিত করে তাহা ইংরাজের পক্ষে বড় সুখকর হয় না। যাহা হউক ১৯৩৫ সালে গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া য়্যাক্ট চালু হইবার পরে, ১৯৩৭ সালে যোগেশ চাটার্জ্জি প্রভৃতি কাকোরী মোকদ্দমার আসামীগণ মুক্তিলাভ করেন।

দক্ষিণেশ্বর বোমার কারখানা ও ভুপেন চাটার্জির হত্যা—রাজেন্দ্র লাহিড়ী কাকোরী ডাকাতির পর দক্ষিণেশ্বরে বোমা তৈরী শিখিবার জন্য বাঙ্গলা দেশে আসে। এইবার সেখানকার কার্য্যকলাপ বর্ণনা করিব।

কলিকতায় শোভাবাজার ষ্ট্রীটে ও দক্ষিণেশ্বর বাচস্পতি পাড়ায় কয়েকজন বিপ্লবী থাকিত। তাহাদের কাজ ছিল বোমা তৈরী করিতে শিক্ষা করা। নলিনী রায় নামে একজন গোয়েন্দা একটি যুবককে ৪ নম্বর শোভাবাজার ষ্ট্রীটের বাড়ী হইতে বাহির হইতে দেখিয়া সাইকেলে করিয়া তাহাকে অনুসরণ করিয়া দক্ষিণেশ্বর পর্য্যন্ত যায়। তাহার পরে তিনচারি দিন সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ আসিয়া বাটীটি ঘেরাও করে। ১৯২৫ সালের ১০ই নভেম্বর তারিখে রাখাল দে, রাজেন্দ্র লাহিড়ী, হরিনারায়ণ চন্দ্র; নিখিলবন্ধু বানার্জ্জি, বীরেন্দ্রকুমার বানার্জ্জি, সুধাংশুশেখর চৌধুরী, ধ্রুবেশ চাটার্জ্জি, অনন্ত হরি মিত্র ও দেবী প্রসাদ চৌধুরী এই নয়জন এই বাড়ীতে ধৃত হয় এবং খানা তল্লাসের ফলে একটী তাজা বোমা, রিভলভার ও নানারূপ বিস্ফোরক পদার্থ বাহির হয়।

দক্ষিণেশ্বরের বাড়ী খানা তল্লাসের পরে শোভাবাজার বাসা খানা তল্লাস হয়। গুলি (কার্ত্তুজ) রিভলভার, নাইট্রিক এসিড্ সহ কয়েকটি বোতল পাওয়া যায়। এখানেও দুইজন ধৃত হয়, তাহাদের নাম প্রমোদ রঞ্জন চৌধুরী ও অনন্ত হরি চক্রবর্ত্তী।

১৯২৬ সালের ৯ই জানুয়ারী দক্ষিণশ্বরে মোকদ্দমার নয় জনেরই শাস্তি হয়, তন্মধ্যে রাজেন্দ্র লাহিড়ী, অনন্ত হরি মিত্র, হরিনারায়ণ চন্দ্রের দশ বৎসর করিয়া দ্বীপান্তর হয়, নিখিল, বীরেন্দ্র, ধ্রুবেশ রাখালের হয় ৫ বৎসর আর সুধাংশু চৌধুরীর হয় ২ বৎসর। রাজেন্দ্র লাহিড়ী কাকোরী ডাকাতির পরে ফেরারী হইয়া এখানে

বোমা তৈয়ার শিখিতে আসে। তখন তাহার নামে ওয়ারেণ্ট ছিল। ১৯২৪এর অক্টোবর মাসের ১৩ই ১৪ই মীরাটের একটি গুপ্তসম্মিলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে রাজেন্দ্রকে বোমা তৈরী শিখিবার জন্য বাঙ্গলা দেশে পাঠানো হয়। শোভাবাজার বাড়ীতে ধৃত প্রমোদ চৌধুরী ও অনন্ত চক্রবর্ত্তীর শাস্তি হয় ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

এই এগারো জনের মধ্যে রাজেন্দ্র লাহিড়ীকে দণ্ড দেওয়ার পরেই কাকোরী মোকদ্দমার আসামী বলিয়া সেখানে পাঠানো হয়। আর সেখানকার বিচারের ফল পূর্ব্বেই জানাইয়াছি। বাকী দশজনকে আলিপুর সেণ্ট্রল জেলের বোমা ইয়ার্ডে রাখা হয়।

এই বোমা ইয়ার্ডের ঠিক পূর্ব্ব দিকের ইয়ার্ডটি ইউরোপীয়ান ইয়ার্ড আর উত্তরদিকের কুড়িটি সেল (কুঠরী) সংযুক্ত বড় বাড়ীটি ষ্টেট ইয়ার্ড নামে পরিচিত ছিল। অন্তরীণে আবদ্ধ রাজনৈতিক বন্দীগণের জন্য স্থানটি নির্দ্ধারিত ছিল।

এই ষ্টেট্ ইয়ার্ডে আই, বি, বিভাগের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ভূপেন্দ্র চাটার্জ্জি মহাশয় প্রায় আসিতেন। উদ্দেশ্য তথ্যানুসন্ধান ও গোপন খবর সংগ্রহ করা। বোমা ইয়ার্ডের দশজন এর মধ্যে নীচতলায় পাঁচজন থাকিত, উপর তলার পাঁচজন থাকিত। সম্মুখে দক্ষিণ দিকে একটী মাঠের মতন জায়গা, সেখানে বন্দীরা খেলাধুলা ও কুস্তি ইত্যাদি করিত। উপর তলা এবং নীচতলার দক্ষিণ দিকে বারেন্দাও আছে।

ভূপেন্দ্রবাবু যখনই যাইতেন ইহারা নিজেদের নানাবিধ অসুবিধার কথা তাঁহাকে জানাইত কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইত না। অথচ তিনি মিষ্ট কথায় তাঁহার আবশ্যক মত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আসিতেন।

২৮সে তারিখে ভুপেনবাবু আফিস হইতে পাঁচটার বাহির হইয়া *

---

* আমরা যে সময়ে উক্ত জেলে ছিলাম ১৯২১, ১৯২২ সালে উক্ত দুইটি ইয়ার্ডে ২০ জন রাজনৈতিক বন্দী ছিল। ইহাদিগকে Bomb Prisoners বলা হইত এবং দুইটি বোমা ইয়ার্ড নামে পরিচিত ছিল, আর ষ্টেট ইয়ার্ডে যে ২০টি বড় সেল ছিল, তাহাতে বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতারা ছিলেন, যেমন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, জিতেন্দ্রলাল বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি।

অন্যতম পুলিস অফিসার ব্রজবিহারী বর্ম্মণকে বাসায় দিয়া তিনি বরাবর জেলে চলিয়া যান। ব্রজবাবুকে রাস্তায় বলেন—জেলে গেলেই দূর হইতে (বোমা ইয়ার্ড হইতে) তিনি শুনিতে পান, 'কবে তোকে যমে নিবে।' পাঠকের স্মারণার্থ বলিতেছি, রাজেন লাহিড়ী প্রমুখ কাকোরী ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার আসামীগণ তখন দায়রায় সোপার্দ হইয়াছে। আর ৩রা মে হইতে সেখানে দায়রার বিচার আরম্ভ হইয়াছে।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে ষ্টেট ইয়ার্ডে ঘণ্টা খানেক থাকিয়া ভূপেনবাবু যেই পশ্চিম দিকের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গলির রাস্তা ধরিয়া দক্ষিণ মুখী হইয়াছেন, অমনি বোমা ইয়ার্ডের কয়েকজন একটা লোহার ডাণ্ডা লইয়া রামরাজ নামক ওয়ার্ডার নিকট হইতে চাবি কাড়িয়া লয় এবং দরজা খুলিয়া সেই রাস্তায় মধ্যে লোহার ডাণ্ডা দিয়া মিঃ ভূপেন চাটার্জ্জিকে প্রহার করিয়া মারিয়া ফেলে। অবিলম্বে বাঁশীবাজিল, পাগ্‌লা ঘণ্টা হইল, জেলার রায়ান, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ক্যাপটেন মলিয়া প্রভৃতি আসিয়া পড়িল। অনুসন্ধান হইল এবং রামরাজ বলিল "আমাকে ঠেলে ফেলে চাবি কেড়ে নেয়, বুকে পা দিয়ে বাঁশি কেড়ে নেয়। প্রমোদ লোহার ডাণ্ডা নিয়া বাহিরে যায়। অনন্ত হরির হাতে উহা প্রথমে ছিল ইত্যাদি।"

ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডের কয়েকজন বন্দী আসামীও সাক্ষী দিল। তাহরা নাকি বোমা ইয়ার্ডের পূর্ব্বদিকের বাড়ীর দোতলা হইতে সব দেখিয়াছিল।

বিচার আরম্ভ হইল আলিপুর ট্রাইবুন্যালে। জজ জি. এন. রায়, জজ বার্টলি ও একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মহম্মদ আলির কাছে। দশজন আসামী হইয়া আসিল। ৯ই জুন (১৯২৬) হইতে বিচার আরম্ভ হয়। দোষ সাব্যস্থ হইল দশজনেরই। বিচারকগণ অনন্ত হরি মিত্র, বীরেন বানার্জ্জি ও প্রমোদ চৌধুরীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়া বাকী সাতজনকে দ্বীপান্তরের শাস্তি দেন ;

মোকদ্দমার আপিল হয় কলিকাতা হাইকোর্টে। বিচার-পতি জাঙ্কিন ও বিচার-পতি মন্মথ মুখার্জ্জি এর নিকট। বীরেন বানার্জ্জি, হরিনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, নিখিল বানার্জ্জি, সুধাংশু চৌধুরী ও দেবীপ্রসাদ চৌধুরীকে ইঁহারা নির্দ্দোষ সাব্যস্থ করেন।

প্রবেশ, রাধিকা ও অনন্ত চক্রবর্ত্তীর দেন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। অনন্ত হরি মিত্রের ফাঁসির রায় বহাল থাকিয়া যায়।

প্রমোদ চৌধুরীর মৃত্যু দণ্ড হইবে কি দ্বীপান্তর হইবে এই সম্বন্ধে উভয় বিচার পতির মধ্যে মতভেদ হওয়ায়, বিষয়টি প্রধান বিচার পতির কাছে পাঠানো হয়। শেষ পর্য্যন্ত প্রমোদ চৌধুরীরও ফাঁসির দণ্ডই বহাল থাকে। এই রায় হয় ৯ই আগষ্ট, ১৯২৬।

১৯২৬ সালের মে মাসে কৃষ্ণনগরে প্রাদেশিক সম্মিলন হয়। ইহার পূর্ব্বে গোপীনাথ সাহার ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। কবি নজরুল যে প্রাণ মাতানো গানটি রচনা করেন, অনন্ত হরি, প্রমোদ চৌধুরী, রাজেন্দ্র লাহিড়ী, রামপ্রসাদ, আসফাক আলি প্রভৃতির ফাঁসি কাষ্ঠে নির্ভীক আত্মদান সেই গানটির কথা স্মরণ করিয়া দেয়।

"ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান হে
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা।
দিবে কোন বলিদান হে…"

ইহার পরের মোকদ্দমা দেওঘর ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা। বীরেন্দ্র ভট্যাচার্য্য, সুরেন্দ্র ভট্যাচার্য্য, তেজেষ ঘোষ, উপেন্দ্র কর, সুশীল সেন, ইন্দ্রনারায়ণ, বদ্রি নারায়ণ, অহিভূষণ, ধরানাথ ভট্যাচার্য্য, দয়ালহরি দত্ত, সান্যাল প্রভৃতি ২৭।২৮ জন আসামী ছিল। প্রথমে অনুসন্ধান হয় দুমকাতে, পরে হয় দেও-ঘরে। দায়রার মোকদ্দমাও হয় দেওঘরেই—ভাগলপুরের জজ মিঃ জেমসের আদালতে। ৫।৭ বৎসর করিয়া কয়েকজনের শাস্তি হয়। দেওঘরে তেজেসের কাছে কিছু আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া যায়। পরে একটি ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা খাড়া করা হয়। সরকারী পক্ষে কৌঁসিলি ছিলেন মিঃ মানুক। দায়রায় শ্রীযুক্ত নিশত সেন, অপূর্ব্ব মুখার্জ্জি প্রভৃতি ছিলেন। এই পুস্তকের লেখক উভয় আদালতে সুশীল সেন ও পণ্ডিত ধরানাথ ভট্টাচার্য্যের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। মনোরঞ্জন বানার্জ্জি, ক্ষিতীশ রায়, জগন্নাথ কোলে প্রভৃতি কয়েকজন উকীলও ছিলেন। ধরানাথ, দয়ালহরি পাল প্রভৃতি আসামী গণ মুক্তিলাভ করে।

ভগবত সিং ও লাহোর ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা

এইবার আমরা পাঞ্জাব প্রদেশের আন্দোলন সম্বন্ধে উল্লেখ করিব। একদিকে ভগবত সিং, রাজগুরু প্রভৃতির তেজস্বিতা, অপর দিকে বাঙ্গলার দধীচি যতীন দাসের আত্মাহুতি, একদিকে আসামীগণের প্রতি অমানুষিক পীড়ন, উন্যদিকে কয়েকজন বাঙ্গালী নামধেয় ব্যক্তির রাজসাক্ষী হওয়া—প্রভৃতি লোমহর্ষণ কাণ্ড, বিপ্লব ইতিহাসে লাহোর ষড়যন্ত্র মোকদ্দমাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। আমরা সম্পূর্ণ ব্যাপারটি বুঝিবার জন্য একটি ধারাবাহিক ইতিহাস প্রদান করিতেছি—

১৯২৭ সালের ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজ কংগ্রেসে 'পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতবাসীর লক্ষ্য' এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।*

এই অধিবেশনে লর্ড সাইমনের নেতৃত্বে (তখন স্যার জন সাইমন) যে রাজকীয় কমিশন ভারতবর্ষে আসিতেছে তাহা বর্জ্জন করিবার সঙ্কল্প হয়। ইহারই অল্পদিন মধ্যে ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে, সাইমন প্রমুখ সপ্ত সদস্য বোম্বাই আসিয়া পঁহুছে। ইহার পরে যে দিন তাহারা লাহোরে আসিয়া উপস্থিত হয়, সেখানে একটি বড় মর্ম্মন্তুদ ঘটনা সংঘটিত হয়। লাহোর রেলওয়ে ষ্টেশনে পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায়, ডাক্তার আলম্ ও ডাক্তার সত্যপাল একটি শোভা যাত্রা করিয়া উক্ত সদস্য দিগকে ফিরিয়া যাইতে বলেন"। **"Go back Simon."** লাহোর পুলিসের অধ্যক্ষ (এস, পি) মিঃ স্কট্ ও তাহার সহকারী মিঃ সাণ্ডার্স সদলবলে লাঠি চালনা করিয়া এই শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। ইহার ফলে লালাজি ভীষণ ভাবে আহত হন, তাঁহার বুকে মাথায় এবং কাঁধে লাঠির আঘাত পড়ে।

* This congrass declares the Goal of the Indian people to be Complete National Independence.

† Where as the British Government have apponited the statutary commission in utter disregard of India's Self-determination, this Congress resolves that the only self-respecting Course for India is to boycott the Council at every stage and in every from.

তাঁহার ফুস্‌ফুসে এত বেশী বেদনা হয় যে তিনি শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন শ্বেতাঙ্গ পুলিসের এই বর্ব্বরতার ফলেই ভুগিতে ভুগিতে আগষ্ট মাসে (১৯২৬) পুরুষ সিংহ অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। পাঠক জানেন, রাজেন লাহিড়ী প্রভৃতিও কয়েকমাস পূর্ব্বেই ফাঁসিকাঠে জীবনাহুতি দেন। উত্তর ভারতে সরকারের এইসব নৃশংসতায় বিপ্লব পন্থা বেশ শক্তিশালী হইয়া উঠে।

কাকোরী মোকদ্দমার আসামীগণ যে 'হিন্দুস্থান রিপাবলিক এসোসিয়েশন' গঠন করিয়াছিল, চন্দ্রশেখর আজাদের নেতৃত্বে নূতন ভাবে তাহাই এখন আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ফেরার অবস্থায় চন্দ্রশেখরই ভগবত সিংহ প্রভৃতিকে লইয়া নূতন ভাবে দল গঠন করে।

এই দলটি অভিষ্ট সিদ্ধ করিবার জন্য কখনও ডাকাতি, কখনও লুট, কখনও তহবিল তছরূপ প্রভৃতি নানা ভাবে অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়।

কতিপয় বিপ্লবী ১৭ই ডিসেম্বর ১৯২৮, অপরাহ্ন ৪॥ সময় পুলিসের আসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাণ্ডার্স সাহেব ও তাহার সঙ্গী চম্পালালকে লাহোরের কোর্ট ষ্ট্রিটের মোড়ে হত্যা করিয়া পলাইয়া যায়। স্কট সাহেবকে হত্যা করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু ঐদিন ভ্রমবশতঃ সাণ্ডার্স নিহত হয়। ট্রাফিক ইনসপেক্টর ফার্ন সাহেব সত্বর আসিয়া তাহাদিগকে ধরিতে প্রয়াস পায়, কিন্তু হাতে পিস্তলের গুলি খাইয়া সরিয়া পড়ে। ভগবত সিং, শিবরাম, রাজগুরু ও জয়দেব কাপুর ইহাতে লিপ্ত ছিল এবং কার্য্যশেষ করিয়া দয়ানন্দ য়্যাঙ্গলো বেদিক কলেজেএর বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া পরে সেখান হইতে অদৃশ্য হয়। ইহার পরে কয়েকদিবস পর্য্যন্ত উক্ত কলেজের উপরে কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ আক্রোশ থাকে। একদিন অধ্যাপক শান্তরাম সয়াল পড়াইতেছিলেন, পুলিস ক্লাসের ভিতরে ঢুকিয়াই তাঁহাকে মারপিট করে।

বোমা তৈরী করিবার জন্য লাহোরের কাশ্মিরী বিল্ডিংএ একটি কারখানা করা হয়। সাহারণপুর ও আগ্রা প্রভৃতি স্থানেও অনুরূপ কারখানা স্থাপিত হয়।

কাকোরী মোকদ্দমার রাজসাক্ষী দিগকেও হত্যা করিবার পরামর্শ হয়। কলিকাতা কংগ্রেসের পরে বিপ্লবীগণ আরও তৎপরতা দেখাইতে আরম্ভ করে।

সাণ্ডার্সের খুনের চার মাস মধ্যেই দিল্লীর পরিষদ কক্ষে দুইটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। পরিষদের প্রেসিডেণ্ট সাধারণ নিরপত্তা বিল (Public Safety Bill) সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতে আসন হইতে যেমন উত্থিত হইয়াছেন, অমনি দুইটি স্থান হইতে দুইটি বোমা বিস্ফোরণ হয়, ছয় সাতজন আহত হয় এবং স্যার বেঞ্জামিন দালালের শরীরে আটটি আঘাত লাগে। মিঃ এস. এন রায় ও আহত হন। ইহার পরে ভগবতসিং দুইটি গুলিও ছুড়ে। ভগবত সিংহের সঙ্গে বটুকেশ্বর দত্ত ছিল। বিচারে উভয়ের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। অভিযোগ ছিল খুনের চেষ্টা (দঃ বি ৩০৭ ধারা) ও বিস্ফোরক আইনের তিন ধারানুসারে।

বাস্তবিক ইহাদের কাহাকেও হত্যা করার উদ্দেশ্য ছিল না। কেবল অন্যায় আইনের প্রতিবাদই উহারা এইরূপ করে।

ইতিপূর্ব্বে কৈলাশপতি নামক গোরক্ষপুর বারহলগঞ্জের একটি পোষ্টাফিসের কেরানী উক্ত পোষ্টাফিস হইতে ৩১৯৯ টাকা তছরূপ করে এবং পাঞ্জাব ন্যাসনেল ব্যাঙ্কেও কিছু টাকা লুট হয়। আর মেলিনিয়া গ্রামে (মজঃফরপুর জিলার) একটি ডাকাতি করিয়া কিছু টাকা লওয়া হয়। বাড়ীর মালিক বঙ্কু মাহতো বাধা দিতে গিয়া নিহত হয়। এই মেলিনিয়ার ডাকাতি বেতিয়ার ফণীন্দ্র নাথ ঘোষ ও ও তাহার দলস্থ কয়েকজনের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়।

কেবল তাহাই নয়—যে ট্রেনে সাইমন কমিসনের সভ্যগণের আসিবার কথা, সেই ট্রেনই ডিনেমাইট্ দিয়া উড়াইয়া দিবার পরিকল্পনা হয়। বিপ্লবীগণ আরও একটি কাজ করিতে মনস্থ করে। কাকোরী ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় দণ্ড প্রাপ্ত আসামী শ্রীযোগেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শচীন্দ্র নাথ সান্যালকে যে ট্রেনে লইয়া যাওয়ার কথা, সেই ট্রেন হইতে উহাদিগকে জোর করিয়া বাহির করিয়া লইবার ষড়যন্ত্র হয়।

দিল্লীর ঘটনার:পরেই কাশ্মীরী বিল্ডিং এর বোমার কারখানা ১৬ই মে (১৯২৯) খানাতল্লাস করিয়া অনেক বিস্ফোরক পদার্থ বাহির হয়। আর প্রায় সেই সময়েই সাহারাণ পুরের বোমার কারখানায় ডাঃ গুরু প্রসাদ, শিব বর্ম্মা ও জয়দেব কাপুর ধৃত হয়।

এই সব ঘটনা ভিত্তি করিয়াই লাহোর ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা খাড়া করা হয়। আর এই মোকদ্দমার বিচার হয় লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে। ইহার আসামী ছিল ভগবত সিং, শুকদেও, রাজগুরু, বটুকেশ্বর প্রমুখ ৩২ জন। ইহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হয় প্রধাণতঃ সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রচেষ্টা, (দণ্ডবিধি আইনের ১২১ ধারা) ও হত্যা (উক্ত আইনের ৩০২ ধারা)। বাঙ্গলার অন্যতম যুবক রত্ন যতীন দাসও এই মোকদ্দমার অন্যতম আসামী হইয়া কলিকাতা হইতে লাহোরে প্রেরিত হন।

এই যতীন দাসের সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ ছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আদেশানুসারে স্বরাজ বৎসরে (১৯২১), দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির গঠন ও পরিচালনার ভার তাহার উপরে অর্পিত হয়। যতীন কলেজের পড়া বন্ধ করিয়া অসহযোগী হয় ও স্বেচ্ছাসেবক আন্দোলনের সময়ে তিনচার বার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। যতীন বেশ কর্ম্মক্ষম ছিল এবং কংগ্রেসের কার্য্য নিয়মানুবর্তিতার সহিতই করিত। যতীনের বয়স তখন মাত্র ১৭ বৎসর। সে ১৯০৪ সালে জন্ম গ্রহণ করে।

১৯২৩ সালে শচীন সান্যাল যখন ভবানীপুর আসে, যতীন্দ্র, ধীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় দেবেন্দ্র বসু, সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি চাটার্জি, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির কয়েকটি যুবক বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। ইহার অল্পদিন মধ্যেই যতীন ও প্রেমরঞ্জন নামক অপর যুবক ১৯২৪ সালে বার্ম্মা অয়েল কোম্পানীর এক দারোয়ানের চক্ষুতে ধূলা নিক্ষেপ করিয়া তাহার নিকট হইতে ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা লইয়া যায়। ১৯২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে শচীন সান্যাল ভবানীপুরের প্রাণনাথ পণ্ডিত ষ্টীট হইতেই ধরা পড়ে এবং অতঃপর বাঁকুড়া রাজদ্রোহ মোকদ্দমায় তাহার দুই বৎসর জেল হয়। কয়েক মাস মধ্যে যতীনও অন্তরীণে আবদ্ধ হয়। এই সময় যতীন আর পূর্ব্বের ন্যায় কংগ্রেস নীতির বা কর্ত্তৃপক্ষের অনুরক্ত ছিল না, অন্যদিকেই তাহার সম্পূর্ণ আকর্ষণ ছিল। ১৯২৪ সালের বি. পি. সি. সির জন্য দক্ষিণ কলিকাতা সভ্যদের নির্ব্বাচনে যতীনের মনঃপুত লোক ভোট বেশী পায় নাই বলিয়া সে রিটার্নিং অফিসারদের ভোট কাগজ লইয়া চলিয়া গিয়াছিল।

শ্রদ্ধা বশতঃ শীঘ্রই আবার ফিরাইয়াদেয়। যতীন এই সময়ে শচীন সান্যালের শ্বেতপত্র (White paper) প্রচারেই বেশী মনোনিবেশ করিত।

অন্তরীণে থাকিবার সময়ে ঢাকার জেল সুপারিণ্টেণ্ডের সঙ্গে একদিন যতীনের বচসা হয়, এমন কি উহা হাতাহাতিতেও পরিণত হয়। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হইলে সে ২০।২২ দিন অনশনে থাকে। অতঃপর উক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ত্রুটী স্বীকার করিয়া ঝগড়াটী মিটাইয়া ফেলে। ১৯২৮ সালে কলিকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনের ২।৩ মাস পূর্ব্বে (সেপ্টেম্বরে) যতীন মুক্তিলাভ করে। এই সময় লেখকের সঙ্গে আবার বেশ দেখাশুনা হইত। উক্ত অধিবেশনের সময় সুভাষচন্দ্র ছিলেন সর্ব্বাধিনায়ক (G.O.C), যতীন বোধ হয় লেপ্টানাণ্ট ছিল। কোন কোন বিষয় মত বিরুদ্ধ হওয়ায় তাহাকে প্রতিবাদ করিতেও শুনিয়াছি।

এই কংগ্রেসেই লাহোর হইতে ভগবত সিংহ, বেতিয়া হইতে ফণী ঘোষ, চট্টগ্রাম হইতে সূর্য্য সেন প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত হয়। সকলে এক যোগে কার্য্য করিতে সঙ্কল্প করে। যতীন নূতন ধরণের বোমা তৈরী শিখিবার জন্য এলাহাবাদ ও লাহোরে যায়। অতঃপর তিন মাস পরে রংপুরে যে প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন হয় তাহাতেও যতীন, চট্টগ্রামের অম্বিকা চক্রবর্ত্তী এবং নিরঞ্জন সেন, সতীশ পাকৃরাশীর মধ্যে পরামর্শ হয় যে অবিলম্বে বিপ্লবাত্মক কার্য্য আরম্ভ করিতেই হইবে। যতীনই, ভগবত সিংহ, ফণী ঘোষ, কমল গুহ, তেওয়ারী প্রভৃতিকে বোমার অন্যতম উপাদান 'গান কটন' তৈরী করিতে শিক্ষা দেয়।

১৯২৯ সালের মে মাসে ডায়মণ্ড হারবারের কাউন্সিল নির্ব্বাচন উপলক্ষ্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হিসাবে সমস্ত গ্রাম পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। মগরা হাট, মন্দিরবাজার, সরিষা, ডায়মণ্ড হারবার সদর, কুলপী, করঞ্জলি প্রভৃতি স্থানে আমাকেও বক্তা হিসাবে লইয়া যান। প্রতিপক্ষে ছিলেন দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। এইখানে যতীনও সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে দুই একটী স্থানে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করিয়াছিল।

ইহার অব্যবহিত পরেই যতীনকে আলিপুর ফৌজদারী কোর্টে অপরাহ্নে

২।৩টার সময় দেখিতে পাই। সঙ্গীর পুলিসটিকে প্রথমে লক্ষ্য করিতে পারি নাই। দেখা হইতেই সে বলিল, "হেমবাবু, লাহোর ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার আসামী করিয়া লইয়া যাইতেছে, আবার দেখা হইবে কিনা কে জানে?" পুলিস দুই একটী কথা ছাড়া বেশী কিছু কহিতে দেয় নাই। তখন বুঝিতে পারি নাই যে স্নেহাস্পদ যতীন্দ্রের সঙ্গে এই শেষ দেখা।

ইহার কিছু দিন পরে শুনিলাম জেল কর্ত্তৃপক্ষের অন্যায় ব্যবহারের প্রতীকার-কল্পে যতীন জেলে অনশন ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। প্রথমে আরম্ভ করে ভগবৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত, অল্পদিন মধ্যেই যতীন্দ্র প্রভৃতিও তাহাতে যোগদান করে। একদিন যতীনের সহকর্ম্মী সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় বলে—

"হেমবাবু, যতীন বুঝি আর বাঁচেনা—যতীন মরণেই দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াছে"

কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম "সকলের পক্ষ হইতে জেলের অত্যাচারের প্রতীকার কল্পেই যতীন মরণ-ব্রত গ্রহণ কয়িয়াছে, জলস্পর্শও করিতেছেনা, তাহার ফুসফুস্ আক্রান্ত হইয়াছে, নাকদিয়া রক্ত পড়িতেছে; তাহাকে জেল হাসপাতালে রাখা হইয়াছে।"

এই অনশন ব্রতী বন্দীদের জন্য কলিকাতা ও অন্যান্য স্থলে অনেক সভা-সমিতি হয়। কলিকাতায় সভা হয় ৪ঠা ও ১১ই আগষ্ট (১৯২৯)। ১১ তারিখে যে সভা হয় তাহাতে দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দও বিশেষ ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ১১ই তারিখে টাউন হলের সভায় যাইবার পূর্ব্বে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে হাজরা পার্ক হইতে একটী বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হয়। অসংখ্য প্রচারপত্রে লিখিত ছিল—'বন্দেমাতারম,' 'স্বাধীনতা বা মৃত্যু,' 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' আর—

"বীরগণ জননীরে
রক্ততিলক ললাটে পরাল
পঞ্চ নদের তীরে—"

এই অপরাধে সুভাষচন্দ্র, শ্রীকিরণ শঙ্কর রায়, ডাক্তার যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত,

মেজর সত্যগুপ্ত, সর্দ্দার বলদেও সিং, প্রেম সিং, সুশীল বানার্জ্জী, বিনয় রায়চৌধুরীকে প্রায় বৎসরাধিক কারাভোগ করিতে হয়।

রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি ব্যবহার কিছুতেই যখন পরিবর্তিত হইল না যতীনও অনশন ছাড়িল না। এইরূপে বঙ্গমাতার গৌরব বৃদ্ধি করিয়া, সহ-কর্ম্মীগণের সম্মান রক্ষা করিয়া, পিতা বঙ্কিম বিহারীর বংশ ও মুখোজ্জ্বল করিয়া অন্নজল ত্যাগে ৬৪ দিন তিলে তিলে ক্ষয় পাইয়া, ১৩ সেপ্টেম্বর (১৯২৯) কলিযুগের দধীচির ন্যায় যতীন্দ্র ইরাবতী তটে আত্মাহুতি দিল। তাহার শেষ ইচ্ছানুসারে, বাঙ্গলার নেতা সুভাষচন্দ্রের চেষ্টায় ও ডাক্তার আলম্, সত্যপাল, গোপীচাঁদ ভার্গব প্রভৃতির সহানুভূতিতে তাহার দেহ সহোদর কিরণ-চন্দ্রের সমভিব্যাহারে লাহোর হইতে কলিকাতায় প্রেরিত হয়। লাহোর হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত সমস্ত ষ্টেশনে অপূর্ব্ব জনশোভা বিরাজ করিতে লাগিল। লাহোরে আবালবৃদ্ধ জনতা আসিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়া গেল। বটুকেশ্বরের জ্যেষ্ঠাভগিনী প্রমিলা দেবী, কৌশল্যা দেবী, শকুন্তলা দেবী প্রমুখ কয়েকটি মহিলা লাহোর হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত শবানুগমন করিয়া আসেন। ষ্টেশনে ষ্টেশনে জনতার সমাবেশ ও উদ্দীপনা, সর্ব্বত্র জয়, উলুধ্বনি ও পুষ্পবর্ষণে দীর্ঘ পথ অপূর্ব্ব শোভাধারণ করিল, আর বীরাষ্টমীর প্রবর্ত্তিকা সরলা দেবী জয়ধ্বনি করিলেন—

বাঙ্গলার বাছনি গো
ওগো মহাপ্রাণ
সার্থক হউক তব
এই মহাপ্রয়াণ—

হাওড়া টাউন হল হইতে ১৬ই সেপ্টেম্বর সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে এক বিরাট মিছিল—যেরূপ মিছিল সচরাচর দেখা যায় না—কেওড়া তলা ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। আর শ্মশান ঘাটের দ্বারদেশেই সকলের দৃষ্টিপথে পতিত হইল—

আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগরে সকল দেশ

আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব দেশবাসী যতীনের মহাপ্রয়াণে গৌরবান্বিত হইল, আরও অভিভূত করিল আজীবন বিপ্লবীর অহিংসভাবে ইচ্ছামৃত্যুতে। মৃত্যুঞ্জয়ী যতীন্দ্র নাথ অমরত্ব লাভ করুক ইহাই আমাদের কামনা। ইতিমধ্যে আসামীদের বিরুদ্ধে কি কি প্রমাণ আছে তাহা যাচাই করিবার জন্য ম্যজিষ্ট্রেট শ্রীকৃষ্ণের আদালতে একটী প্রাথমিক তদন্ত হয়।

মোকদ্দমার ৭ জন রাজসাক্ষী হয়, তাহাদের নাম—

(১) ফণীন্দ্র ঘোষ—বেতিয়া চম্পারণ, বেহার
(২) মনোহর মুখার্জ্জী—ঐ ঐ
(৩) ললিত মুখার্জ্জী—এলাহাবাদের জনৈক এড্‌ভোকেটের পুত্র
(৪) জয় গোপাল—
(৫) হংসরাজ ভোরা
(৬) রামশরণ দাস
(৭) ব্রহ্ম দত্ত

শেযোক্ত দুই জন তাহাদের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে ও বেঁকিয়া দাঁড়ায়। বাকী পাঁচজনের মধ্যে তিনজনই বাঙ্গালী। আর এই ফণী অনেক দিন হইতে এই পথে কাজ করিতেছিল ও আমাদের যতীন দাসের সঙ্গে খুব নিকট সম্বন্ধ ছিল। অন্তরীণাবস্থায় উভয়েরই সাক্ষাৎ হয়। যতীনই ভগবত সিংহ ও ফণীকে বিস্ফোরক পদার্থ তৈয়ার করিতে শিক্ষা দেয়। কলিকাতা ইডেন-গার্ডেনেও ফণীর সঙ্গে কয়েকজন বিপ্লবীর পরামর্শ হয়। এই ফণীই পুলিশের ডেপুটি সুপারিডেণ্ট এন, বানার্জ্জীকে খুন করিবার জন্য রিভলভার নিয়াছিল। এই সম্পর্কে একজন নির্দ্দোষী ব্যক্তি সন্দেহে ধৃত হয়। কিন্তু সে তখন অন্যত্র ছিল, পুলিস অফিসারের পুত্র ইহা জানিত। পুত্রটী পিতার কাছে বন্ধুর নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে অনেক চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হয়। ইহার পরেই ছেলেটার মৃত্যু হয়। অনেকে সন্দেহ করিত যে বালক মনোক্ষোভে আত্মহত্যা করিয়াছিল। কিন্তু এই ফণী ঘোষই প্রধান রাজসাক্ষী হয়। মনোহর ছিল তাহারই অনুগত কর্ম্মী।

অন্যতম রাজসাক্ষী জয়গোপাল সাক্ষী দেওয়ার সময়ে বিদ্রূপের ভাবে গা হাত নাড়িয়া আসামীদের এতই বিরক্তি উৎপাদন করিত যে মনে হয় উহাকে নিকটে পাইলে রক্ষা রাখিত না। কিন্তু অল্পবয়স্ক প্রেমদত্ত আর সহ্য করিতে না পারিয়া আদালত গৃহেই জয়গোপালের গায়ে পায়ের জুতা ছুড়িয়া মারে। তখনই ম্যাজিষ্ট্রেটের কড়া হুকুম হইল, 'সব আসামীকেই হাতকড়া পরাইয়া দাও। ইহার পর আসামীদের উপরে কয়দিন এমন পীড়ন চলে যে আসামীদের প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। জয়গোপাল, শিব বর্ম্মা প্রভৃতি গুরুতর ভাবে আহত হয়। ম্যাজিষ্ট্রেটের চক্ষের উপরই মারধর হইত, কেহ কোনরূপ প্রতিবাদ করে নাই। কয়দিন পর্য্যন্ত আসামীরা আদালতে হাজির হইতেই চাহে নাই। এই ভাবে নয় মাস কাটিয়া গেল।

অতঃপর দায়রা সোপার্দ্দ হওয়ার পরে লাহোর ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা সম্বন্ধে একটি অর্ডিনান্স বাহির হয়, **Lahore Conspiracy case ordinance.** ইহাতে আসামী উপস্থিত না থাকিলেও মোকদ্দমা হইবে। উকীল না থাকিলেও দোষ হইবে না। স্পেশাল ট্রাইবুন্যালে বিচার হইবে। ট্রাইবুন্যাল চরম দণ্ড পর্য্যন্ত দিতে পারিবে। আর উহার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে কোন আপিল হইবে না।

ট্রাইবুন্যালের বিচারে কাহারও তেমন আগ্রহ ছিল না। ভগবত সিং নিজেও খুব অসুস্থ ছিল। তাহাকে ষ্ট্রেচারে করিয়া আনা হইত। সে একেবারে শীর্ণকায় হইয়া পড়িয়াছিল। ইতি পূর্ব্বেই তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর শাস্তি হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

ট্রাইবুন্যালের চেয়ারম্যান হন বিচারপতি কোল্ডষ্ট্রীম (**Mr' Justice Cold stream**)। অন্য দুইজন আগা হায়দার ও জাষ্টিস্ হিলটন। বিচার চলে পূর্ব্বের ন্যায় সেণ্ট্রাল জেলেই। একদিন কোর্টের ভিতরে পুলিসের লোকগুলি কয়েকজন আসামীকে গুরুতরভাবে প্রহার করে। আসামীদের ঘোর প্রতিবাদ সত্ত্বেও কোনরূপ প্রতিকার না হওয়ায় উক্ত কোল্ডষ্ট্রীম সাহেব ও আগা হায়দার এই মোকদ্দমার বিচার করিতে অস্বীকৃত হন। অতঃপর অবশিষ্ট বিচারক

জাষ্টিস্ হিলটন হয় চেয়ারম্যান আর বাহির হইতে অপর দুইজন হাকিম আসে জাষ্টিস্ ট্যাপ্ ও স্যার আবদুল কাদের।

ইহার পরে আসামীরা আর আদালত গৃহে উপস্থিত হয় না। তাহাদের অনুপস্থিতিতেই একতরফা মোকদ্দমার বিচার চলে। পাঁচমাস পরে ১৯৩০ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর, ট্রাইবুন্যালের বিচারপতিগণ যখন রায় প্রকাশ করে সে সময় সাধারণ বা সংবাদ পত্রের পক্ষ হইতে কোন ব্যক্তিই উপস্থিত ছিল না। এরূপ বিচার প্রহসন কোন সুসভ্য জাতির শাসনে ইতিপূর্ব্বে কোথাও হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই।

ভগবত সিং, শিবরাম, রাজগুরু এবং শুকদেবের শাস্তি হয় ফাঁসি কাষ্ঠে মৃত্যু। ভগবৎ সিং সাণ্ডার্সকে যে হত্যা করে তাহা প্রমাণিত হয় নাই। ইন্স্পেক্টার ফার্ণ ঘটনার সময় উপস্থিত ছিল কিন্তু সে ভগবত সিংকে সনাক্ত করিতে পারে নাই। দঃ বিঃ আইনের ৩০২ ধারা বা ১২১ ধারা ভগবৎসিংয়ের বিরুদ্ধে প্রমাণিত না হইলেও তাহার প্রতি মৃত্যু দণ্ডের আদেশ বিচারের প্রহসন ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু ভগবত সিং যে ভগবত সিং, তাহাকে বাঁচিতে দিলে মহা অনর্থ ঘটিবে! প্রমাণের স্বল্পতা সত্ত্বে ও তাহার প্রতি ফাঁসির আদেশ রাজনৈতিক হত্যা ভিন্ন আর কিছুই নয়। আইনজ্ঞ মাত্রেই বুঝিবেন যে প্রমাণের ভার এক্ষেত্রে সরকারের উপর এবং সন্তোষজনক প্রমাণের অভাবে উক্ত ধারা দুইটির অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া নৃশংতার পরিচায়ক হইয়াছে। কিশোরীলাল, মহাবীর সিং, বিজয়সিং, শিববর্ম্ম, ডাক্তার গয়াপ্রসাদ, জয়দেব কাপুর ও কমল তেওয়ারীর দণ্ড হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, কুন্দন লালের হয় ৭ বৎসর ও প্রেমদত্তের পাঁচ বৎসর। অজয় ঘোষ, যতীন্দ্র সান্যাল ও দেশরাজ মুক্তির আদেশ পায়। সকলেই পূর্ব্বে খালাস পায় কিন্তু দীর্ঘ ১৫ বৎসর দ্বীপান্তরে ও নানা জেলে বাস করিবার পরে ১৯৪৬ সালে ডাঃ গয়াপ্রসাদ, শিববর্ম্মা, জয়দেব ও কিশোরী লাল বিনাসর্ত্তে মুক্তি লাভ করে।

বিপ্লবীদের মধ্যে ভগবৎ সিং রণজিত সিং নামে অভিহিত হইত। সে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ও কর্ম্মঠ ছিল। পড়াশুনা বেশ করিত। তাহার পিতার নাম ছিল কিশেন

সিং, খুল্লতাত সর্দ্দার অজিত সিং। লালা লাজপতরায়ের সহিত ইনিই ১৯০৭ সালে দেশান্তরিত হইয়াছিলেন।

এই মোকদ্দমার কোন আপিল হয় নাই। ভগবত সিংহের মত ছিল আপিলের দিকে না যাওয়া; শীঘ্র শীঘ্র কাজ শেষ হইয়া গেলেই আরাম। তাহারা সরকারকে আবেদন জানায়, তাহাদিগকে গুলি করিয়া মারা হউক। কিন্তু এই অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই।

মহাত্মা গান্ধী ফাঁসি দ্বীপান্তরে পরিণত করিবার জন্য চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্যর্থ-কাম হওয়ায় মনে করেন, কংগ্রেস বসিবার পূর্ব্বে এই কাজ শেষ হইয়া গেলেই সব দিক ভাল হইবে। ২৩শে মার্চ্চ (১৯৩১) সন্ধ্যা পৌনে সাতটার সময় লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে ভগবত সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের ফাঁসি হইয়া যায়। গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বেলা ১১টার সময়ে ভগবত সিংএর পিতা কিশেন সিংকে আত্মীয়-স্বজন লইয়া জেলে পুত্রের সঙ্গে দেখা করিতে বলা হয়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া জেলের মধ্যেই সমাধা হয়, কিন্তু তাহাদের চিতাভস্ম শতদ্রু নদীতে ভাসাইয়া দেওয়ার অনু-মতি দেওয়া হয়। প্রায় পঁচাত্তর হাজার লোকের একটী শোভাযাত্রা হয় এবং 'ভগবত সিং জিন্দাবাদ' শব্দে চতুর্দ্দিক নিনাদিত ও প্রতিধ্বনিত হয়। সেদিন লাহোরের সব দোকান পাট ও কাজ কর্ম্ম বন্ধ থাকে।

এই মৃত্যু-বিষাদ-কালিমা লইয়াই পরদিন করাচীতে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে সকল প্রতিনিধিই ভগবত সিং প্রভৃতির সাহস ও ত্যাগের উজ্জ্বল আদর্শ সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা করেন। মহাত্মাজীও কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন আর সভাপতি হন সর্দ্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল। ভগবত সিংহ, রাজগুরু, শুকদেব সম্বন্ধে কংগ্রেস অধিবেশনে যে প্রস্তাব উপস্থিত হয় তাহাতে তাহাদের সাহস, দেশ-প্রীতি ও আত্মবলিদানের উচ্চ-প্রশংসা হয়। প্রস্তাবটি গোপীনাথ সাহার সম্বন্ধে প্রস্তাব অপেক্ষাও অধিকতর জোরালো।

প্রস্তাবটিতে ছিল যে "রাজনৈতিক হিংসাত্মক কার্য্যের সহিত সহানুভূতি বা সম্পর্ক নাই," তাহাতে ভিতরে যেমন কিছু কিছু আপত্তি হয়, বাহিরেও বহুসংখ্যক

লোক কোলাহল করিতে থাকে। কিন্তু অবশেষ প্রস্তাবে * ঐ কথাগুলি থাকিয়া যায়। তবে স্বেচ্ছাসেবক সম্মিলনীতে যে প্রস্তাব পাশ হয়, তাহাতে ঐ প্রতিবাদ-মূলক কথাগুলি ছিল না।

এই সময়ে ভগবত সিংহের নাম এতই প্রসিদ্ধি লাভ করে যে জনপ্রিয়তায় মহাত্মা গান্ধীর অপেক্ষাও বড় কম হয় নাই।* হাটে মাঠে ঘাটে ভগবত সিং জিন্দাবাদ প্রতিধ্বনিত হইত।

ফাঁসির কিছুদিন পূর্ব্বে দিল্লীতে এক বিরাট সভা হয়। তাহাতে পঞ্চাশ হাজারের ও অধিক লোক সমবেত হইয়াছিল। সকলেই একবাক্যে ঐরূপ দণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। সভার সভাপতি ছিলেন লক্ষ্মী নারায়ণ গদাদিয়া। দেশবন্ধু গুপ্ত, জনাব আসফালি প্রভৃতি উত্তেজনা পূর্ণ বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

* This Congress while dissociating itself from and disapproving of political violence in any shape or form, places on record its admiration of the bravery and sacrifice of the late Sardar Bhagat Sing and his comrades, Syts Sukha Dev and Raj Guru and mourns with the bereaved families the loss of these lives.

The Congress is of openion that this triple excution is an act of wanton vengence and is a deliberate flouting of unanimous demand of the Nation of Commutation. The Congress is further of openion that Government have lost the golden opportunity of promoting good will between the two nations, admittedly held to be essential at this juncture and of working over to the method of peace the party which being driven to despair, resorts to political violence.

† It is no exaggeration to say that at that moment Bhagat Sing's name was as widely known all over India and was as popular as Gandhiji.

The History of the Congress by P. Sittaramya pg. 767.

ভারতের সর্ব্বত্রই সভা ও শোভাযাত্রা হয়। কিন্তু কাণপুরে একটা বড় অপ্রীতিকর দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়। হিন্দুদের সব দোকান পাট বন্ধ হয়। মুসলমানেরা ইহাতে যোগদান করে না।' অজুহাত দেয় মহম্মদ আলীর মৃত্যুতে হিন্দুরা সকলে যোগদান করে নাই। বচসা, তর্ক হইতে ক্রমে হাতাহাতি, তারপরে ভীষণ দাঙ্গা। এই দাঙ্গায় ৩০০।৪০০ লোক আহত হয় এবং প্রায় শতাধিক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মান্তিক ঘটনা ঘটে যে, পণ্ডিত গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থী, যিনি অনেক মুসলমান পরিবারকে রক্ষা করিয়াছিলেন, ২৪ মার্চ্চ হইতে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। কয়েকদিন পরে তাঁহার মৃতদেহের উদ্ধার হয়।

ভগবত সিংহ প্রভৃতির এই মর্ম্মন্তুদ দেহাবসানে সমগ্র ভারতের আকাশ বিষাদ-কালিমায় আচ্ছন্ন হয়। অশ্রুজল ও কালোনিশান, দীর্ঘশ্বাস ও শোকধ্বনির ব্যথা-বিয়োগ গুঞ্জনের মধ্যেই করাচী কংগ্রেসের অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

এই কংগ্রেস অধিবেশনের সময় যে যুব সম্মিলনী হয় সুভাষ চন্দ্র উহার সভাপতি ছিলেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে ভগবত সিংহ সম্বন্ধে উচ্ছসিত প্রশংসা করিয়া বলেন—

"Bhagat Sing was a symbol of revolt which had taken possession of the country from one end to the other. The spirit was Unconquerable and the flame which the spirit had lit up would not die out. India might have to lose many more sons before she can hope to be free. The recent executions are to me there-fore a sure indication that there has been no change of heart on the side of the Government and the time for honourable settlement had not arrived.

এইবার একটা রাজসাক্ষী হত্যার কাহিনী বিবৃত করিব। বেতিয়ার ফণীন্দ্র নাথ ঘোষ বেহারের একজন বিপ্লবী ছিল। সেখানকার মনোহর মুখার্জ্জীকে সেই দলভুক্ত করে। ১৯২৮ সালের গোড়ায়, আমরা যখন দেওঘর ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা পরিচালনে নিযুক্ত হই, কাগজ পত্র হইতে ফণীন্দ্র এবং মনোহরের পরিচয়

পাই। মনোহরের মা সর্ব্বদাই ছেলের জন্য ভাবনায় সারা হইতেছিল এবং ছেলের ভবিষ্যতের জন্য ফণীকেই দায়ী করিত। পক্ষান্তরে কাগজ পত্র হইতে ফণী সম্বন্ধে কেমন একটা সন্দেহ মনে জাগিয়াছিল। এই ফণীর সঙ্গে যতীন দাসেরও পরিচয় ছিল। ১৯২৬ এর গোড়ায় উহারা এলাহাবাদে পরস্পরে মিলিত হয়। ভগবত সিং, ফণী ঘোষ, কানাই লাল তেওয়ারীকে যতীন্দ্রই **Gun Cotton** তৈয়ার করিতে শিখায়। গান কটন বোমার একটা বিশেষ উত্তেজক উপাদান।

কাশীতে একজন ডি, এস, পি ছিল রায় বাহাদুর জে, এন বানার্জ্জী। ইহার পূর্ব্বে অন্য একজন ছিলেন জে, এন মুখার্জ্জী। ১৩ ফেব্রুয়ারী (১৯২৮) ফণী একটা রিভলভার লইয়া উক্ত বানার্জ্জীকে হত্যা করিতে যায়। একজন নির্দ্দোষী লোক ধরা পড়ে এবং তাহার জেল হয়। উক্ত ব্যক্তিটি, রায়বাহাদুর জে, এন বানার্জির পুত্রের সহিত পুলের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। ছেলেটি উহার নির্দ্দোষিতা পিতার নিকট প্রমাণিত করিলেও উক্ত নির্দ্দোষী লোককে বিচারার্থ প্রেরণ করা হয়। ইহাতে রায়বাহাদুরের ছেলে মর্ম্মান্তিক দুঃখ পায়। এই মনোকষ্টই নাকি তাহার অকাল মৃত্যুর কারণ।

ফণী যে কেবল লাহোর ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় সাক্ষী দিয়াছিল (১৯৩০) তাহা নয়* মৌলনীতে দ্বিতীয়বারের ডাকতি মোকদ্দমায়ও সে রাজসাক্ষি হয় (১৯৩১)। ইহা ছাড়াও মতিহারী ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা এবং পাটনা ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায়ও সে এপ্রুভার ছিল। মতিহারি ষড়যন্ত্র মোকদ্দমাতে রায় বিনোদ সিং প্রমুখ ১৫ জন আসামী ছিল। বেতিয়াতে ফণীর একটি দোকান ছিল।

মনোহর ও মৌলমিনা প্রভৃতি মোকদ্দমায় সে সাক্ষী দেয়।

১৯৩২ সালের নভেম্বর বেতিয়ার মীনাবাজারে-সন্ধ্যা আন্দাজ ৭টার সময় ফণী ও গণেশ প্রসাদ ও অন্য এক ব্যক্তি, মুন্সীলালের দোকানে বসিয়া গল্প করিতেছিল, তখন দুইজন লোক আসিয়া উভয়কে ভোজালি দিয়া গুরুতর ভাবে আঘাত করে।

প্রথমবারে মোকদ্দমা হয় ১৯২৯ সালে

এবং দক্ষিণ দিকে গিয়া মীনাবাজারের পশ্চিম দরজা দিয়া পলাইয়া যায়। ফণী কাহাকেও চিনিতে পারে নাই, কিন্তু গণেশপ্রসাদ বলে দেখিলে চিনিতে পারিব। কিন্তু গণেশ প্রসাদের দেখিবার অবকাশ হয় নাই। কারণ ২০শে নভেম্বর সে হাসপাতালেই মারা যায়। ফণী মারা যাইবার তিন দিন পূর্ব্বে ১৭ই নভেম্বর ইহার এক বৎসর পরে ১৯৩৩ অক্টোবর মাসে বৈকুণ্ঠ সুকুল ও চন্দ্রমাসিংহকে চালান দেওয়া হয়। ১৯৩৪ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী T. Luby চন্দ্রমাসিংকে খালাস দিয়া বৈকুণ্ঠ সুকুলের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেয়।*

আহত ব্যক্তিগণ কাহাকেও চিনিতে পারে নাই। রাত্রিকালের খুন, বেতিয়ার কেহও আসামীদের জানিত না, কথারও গরমিল, অবস্থাঘটিত প্রমাণও অত্যন্ত অসম্পূর্ণ। হোষ্টেলের গোপাল নামক একব্যক্তি বলে যে ঘটবার দিন বৈকুণ্ঠও চন্দ্রমা আসিয়াছিল, কিন্তু ঘটনার পর একমাস পর্য্যন্ত সে কাহাকেও ইহা বলে নাই। তাহাকে শিখাইবার লোকের অভাব ছিল না। অন্য সেনাক্তের সাক্ষী ভগলু পূর্ব্ব উক্তির বিরোধী উক্তি করে; তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া হাকিম বৈকুণ্ঠের মৃত্যুদণ্ড দিয়া বিচারের যে প্রহসন করিয়াছে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এই মোকদ্দমার যে চারিজন এসেসার ছিল তন্মধ্যে তিনজনই উভয়কে নির্দ্দোষ বলা সত্ত্বেও যে হাকিম শাস্তি প্রদান করিয়াছে, তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। কারণ সন্ত্রাসবাদ নষ্ট করিতে ইংরাজ যে কোন পন্থা অবলম্বন করিতে কৃতসঙ্কল্প ছিল কিন্তু ইহাতে লোকের স্বাধীনতার স্পৃহা বরং শতগুণ বৃদ্ধি পায়।

গোপালের একখানা ধূতিতে রক্ত পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহার

* ১৯৩১, ১৪ই সেপ্টেম্বর চম্পারণ জেলার আস্থগ্রামের ধনপত মাহতোর বাড়ীতে ডাকাতি হয়। হাইকোর্টের জজ জে, ম্যাকফারসন ও কুলবন্ত সহায়ের বিচারে ১৫-১-৩৩ যোগেশ্বর প্রসাদের ৭ বৎসর জেল হয়। রামদেও গিরিরও সাজা হইয়াছিল। কিন্তু অল্পদিন পরে মুক্তির আদেশ পায়।

মুরুব্বি ছিল, সে জামিনে খালাস পায়, পরে এই কাপড় সে বৈকুণ্ঠকে ধার দিয়াছিল বলে। এই প্রমাণ এত মূল্যহীন ও অসন্তোষজনক যে ইহার উপর ভিত্তি করিয়া তাহার মৃত্যুদণ্ড দেওয়া বিচার না বলিয়া সরাসরি হত্যা বলাই উচিত। বৈকুণ্ঠ ফণীর খুনে লিপ্ত ছিল কি না তাহা আমাদের বক্তব্য নয়, তাহার বিরুদ্ধে দোষ নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণিত হইয়াছে কিনা তাহাই আলোচ্য বিষয়। কারণ তাহাই আইনের বিধান এবং আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি, অভিযোগ সন্দেহের অতীতভাবে প্রতিপন্ন হয় নাই।

বেহার গভর্ণমেণ্ট ১৯৩৩ সালের ২৭ জুলাই তারিখের আইনের নির্দ্দেশে রাজসাক্ষী ফণীর স্ত্রীকে তাহার যাবজ্জীবন মাসিক পঁচিশ টাকা করিয়া পেনসন দেওয়ার ব্যবস্থা করে।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন

অতঃপর আমরা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কাহিনী বিবৃত করিব। চট্টগ্রাম আক্রমণ ও সাময়িকভাবে ইহা অধিকার, জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধ, ধলঘাটের সংগ্রাম, পাহাড়তলি ক্লাব আক্রমণ, প্রভৃতি রোমাঞ্চকর ঘটনাবলী বিপ্লবের ইতিহাসকে একেবারে উপন্যাসে পরিণত করিয়াছে। অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হয় ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল, কিন্তু সেই বিস্ময়কর ঘটনাবলী উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে, চট্টগ্রামের প্রাক্তন বৈপ্লবিক অবস্থা আলোচনা করা আবশ্যক।

চট্টগ্রাম দলের নেতাই ছিলেন সূর্য্যকুমার সেন, তাঁহার নিবাস ছিল নোয়াপাড়া। বহরমপুর কলেজ হইতে বিএ পাশ করিয়া তিনি উমাতারা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন। এই জন্য তাঁহাকে সকলে 'মাষ্টার দা' বলিয়া ডাকিত। দলের অন্যান্য সভ্য ছিলেন অনন্ত সিংহ, অম্বিকা চক্রবর্ত্তী, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, নির্ম্মল সেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত প্রভৃতি।

১৯২৫ সালে ডিসেম্বরে ৪ নম্বর শোভাবাজার ষ্ট্রীট্ খানাতল্লাস কালে সূর্য্যসেন সেখানে ছিলেন। কিন্তু তিনি অদ্ভুত কৌশলে পুলিসের চোখে ধূলা দিয়া পলাইয়া যান। এই সময় তিনি অন্তরীণ হইতে পলাইয়া এক বৎসরের উপর এখানে বাস করিতে ছিলেন। ইনি বরাবরই সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী।

অনন্ত সিংহও ছিলেন একজন সন্ত্রাসবাদী। ইনি চট্টগ্রামের গোলাপ সিংহের পুত্র। অনন্ত বাবু জাতিতে শিখ। তাঁহার দেহে ছিল অসীম বল, এবং ডন, কুস্তি প্রভৃতিতেও তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। নোয়াপাড়া গ্রামে ১৯২৩ সালে একটী ডাকাতী হয়। চট্টগ্রাম রেলওয়ে ষ্টেসনের কাছে আর একটী ডাকাতিতেও ১৭ হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয়। অনন্তসিংহ প্রমুখ কয়েকব্যক্তি অভিযুক্ত হয়। কিন্তু জুরীরা নির্দ্দোষী বলায় ইহারা মুক্তিলাভ করে।

অতঃপর অনন্তসিংহ, সূর্য্যসেন, অম্বিকা চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ৬।৭ জন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া স্বলুক গ্রামে যাইতে ছিল, পথে পুলিস তাহাদের অনুসরণ করে। অনন্ত সিংহ পলাইয়া ক্রমে কলিকাতা পৌছেন আর সূর্য্যসেন অম্বিকা চক্রবর্ত্তী ধৃত হন। পুলিশ অবশেষে অনেক অনুসন্ধানের পর অনন্তসিংহকে মানিকতলা ৪ নম্বর ওয়ার্ড ইনষ্টিটিউসনে ধরিয়া ফেলে। যে পুলিসের দারোগা অনন্তসিংহকে ধরিতে সক্ষম হয় তাহার নাম প্রফুল্ল রায়। কিন্তু শীঘ্রই কাল তাহার অনুসরণ করে।

চাটগাঁয়ের হরিশ দত্তের পুত্র প্রেমানন্দ প্রফুল্লকে খবর পাঠায় যে সে বিপ্লবীদের সম্বন্ধে কিছু সংবাদ দিবে। বন্দোবস্ত মত উভয়ে একদিন রাত্রিতে (১৯২৪ সালের ২৫ মে) পলটন ময়দানে চট্টগ্রাম সহরের আসিয়া মিলিত হয়। প্রেমানন্দ কথায় কথায় বলে, "আপনিতো সাঙ্ঘাতিক লোক, অনন্ত সিংহকে ধরাইয়া দিলেন।"

প্রফুল্ল—আমি সরকারী চাকরী করি, আমার তো এই কাজ।

এই কথার পরই প্রেমানন্দ তাহাকে গুলি করে, আর অল্পক্ষণ মধ্যেই প্রফুল্ল পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

প্রেমানন্দের বিচার হইল জজ ষ্টর্ক সাহেবের আদালতে। কিন্তু

জুরীরা নির্দ্দোষ বলায় জজসাহেব নথিপত্র হাইকোর্টে পাঠাইয়া দেন। সেখানে বিচারপতি গ্রীভ্‌স ও মন্মথ মুখার্জ্জি কিন্তু প্রেমানন্দকে নির্দ্দোষী বলিয়া মুক্তি দিলেন।

এইরূপ যখন অবস্থা এই সময় অম্বিকা চক্রবর্ত্তী, অনন্ত সিংহ, নির্ম্মল সেন, সূর্য্যসেন, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল প্রভৃতি কেহ ১৯২৫ সালে, কেহ ১৯২৬ সালে অন্তরীণাবদ্ধ হয়। ফলে চাটগাঁয়ে সাময়িকভাবে সন্ত্রাসবাদ মূলক কার্য্যকলাপ বন্ধ হইয়া যায়।

আবার ইঁহারা মুক্তি পাইয়া গৃহে প্রত্যাগত হন ১৯২৮ এর সেপ্টেম্বর। সেই বৎসর কলিকাতায় কংগ্রেস, আর নেতাজী সুভাষচন্দ্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক। তাঁহার প্রবর্ত্তিত সামরিক কায়দা ও পদ্ধতি ইহাদের খুব ভাল লাগিল। যুব-শক্তির প্রতীক বলিয়া তাহারা সুভাষচন্দ্রকে আন্তরিক শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন করেন। এদিকে যতীনদাস, ও ভগবত সিং, সত্যগুপ্ত প্রভৃতি ৫টি শক্তি-শালী দল গোপনে পরামর্শ করিয়া সন্ত্রাসবাদ চালাইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল।

১৯২৯ সালের রংপুরে সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে যে প্রাদেশিক সম্মিলনী হয় তাহাতে ইঁহারা উপস্থিত ছিলেন এবং নিজেদের মধ্যে কে কতদূর কাজে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা আলোচনা করেন।

ইহার পর যতীনদাসের আত্মাহুতি ও কলিকাতায় বিপুল জনতা কর্ত্তৃক শ্রদ্ধা নিবেদন, ইহাদের কর্মধারাকে যেন দ্রুত গতিতে অগ্রসর করিল। ইতিমধ্যেই ইহারা কংগ্রেস দখল করিয়া ফেলিয়াছে, আর ঘটনাস্রোতও যেন এ বৎসরই তাহাদের কর্মতৎপরতার সহায় হইল। তাহারা যে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করে, সুভাষচন্দ্রের পরামর্শ মত সেখানে ভলেন্টিয়ার দিগকে সামরিক প্রথায় শিক্ষা দেওয়া হয়। এই বাহিনীর নেতা হয় গণেশ ঘোষ। আর কুস্তী ব্যায়াম শিক্ষা দিতেন অনন্ত সিং। তীর ধনুক ছোরা তাহারা সবাই অভ্যাস করিত। রঞ্জনসেন নামে একজন উকীলও তাহাদের দলভুক্ত ছিল। রঞ্জন বাবুর প্রাপ্ত বয়স্ক ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক সব কটি ছেলে, বিশেষতঃ ছেলে রজত এই দলে ছিল।

কংগ্রেস কমিটি নির্ব্বাচনে এই দল ছিল দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্তের প্রতিদ্বন্দ্বী। নির্ব্বাচনে যে গোলযোগ হয়, মারামারিতে সুখেন্দু বিকাশ দত্ত নামে এই দলেরই একটি ছেলে মারা যায়। কিন্তু ইহারা কংগ্রেস কমিটি দখল করিয়া ফেলে। শক্তিও তাহাতে বৃদ্ধি পায়।

ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্র, কিরণশঙ্কর রায় প্রভৃতির বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মোকদ্দমা চলিতেছিল এবং কলিকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কর্তৃত্ব লইয়া সুভাষচন্দ্র ও সেনগুপ্তের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীতা চলিতে ছিল। তাহারা সুভাষ চন্দ্রকেই সমর্থন করে। ইহাতে সুভাষচন্দ্রের প্রতি ইহাদের সম্পর্ক ঘনিষ্টতর হয়। তারপরে আসিল সমান্তরাল গর্ভণমেণ্ট চালাইবার জন্য লাহোর কংগ্রেসে সুভাষ-চন্দ্রের প্রস্তাবের প্রত্যাখান কিন্তু ১৯২৯ সালের কংগ্রেসে স্বাধীনতার প্রস্তাবের ও ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারীর পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতিজ্ঞা গ্রহণে দেশে যে উদ্দীপনার সঞ্চার হয়, তাহারও সম্পুর্ণ সুবিধা গ্রহণ করিতে পরিল এই দলটি। এই সময় সুভাষচন্দ্রের উপর করাদণ্ডের আদেশের কথা শুনিয়া দলটি আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। এই সব ঘরনার পটভূমিকায় চট্টগ্রামের বিপ্লবীদল যেন ক্রমে ক্রমে শক্তি সঞ্চার করিয়া ফেলিল। ভগবতসিংদের মোকদ্দমাও এই সময় চলিতেছিল আর পুলিসের হাতে তাহাদের নির্য্যাতনের কথাও সকলের কর্ণগোচর হইয়াছে। লোক সংগ্রহ হইতে লাগিল। অর্থও চারিদিক হইতে প্রচুর ভাবে আসিতে লাগিল। ডাকাতি বা চুরির সহায়তায় নয়, সকলে অকাতরে স্বইচ্ছায় অর্থ দিতে লাগিল। স্ত্রীলোকরা নিজেদের সব অলঙ্কার খুলিয়া দিতে লাগিল, ছেলেরাও টাকা উঠাইতে ছাড়িল না।

অতঃপর আসিল অহিংস বিপ্লব ও লবণ আইন অমান্যের আন্দোলন। মহাত্মাগান্ধী স্বয়ং গিযাছেন ডাণ্ডি অভিযানে (১২ মার্চ্চ ১৯৩০)। তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গীদের গ্রেপ্তার ও তাহাদের প্রতি দণ্ডাদেশ, সমগ্র দেশময় বন্দেমাতরম সত্যাগ্রহ, অবরোধ, বিদেশী বর্জ্জন। সমগ্র ভারতে অসম্ভব উদ্দীপনা ; দেশে এক নব ভাবের উন্মাদনা।

সূর্য্য সেন কিন্তু এই সুযোগে কর্ম্মীদলকে রিপাবলিক্যান বাহিনীতে যোগ দিতে আহ্বান করিলেন।

অবিলম্বে একটি সমারিক বাহিনী গঠিত হইল। ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল, ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত হইল। সূর্য্যসেনের প্রধান সহায়ক্ অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল ও গণেশ ঘোষের জন্য তিনখানি মোটর ক্রয় করা হইল। বিভিন্ন দল হইতে প্রধান প্রধান ঘাটিগুলি একই সময়ে আক্রমণ করিবার ব্যবস্থা সব ঠিক হইয়া গেল। ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি আক্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের কোনরূপ অভাব হয় নাই, স্বেচ্ছায় সকলেই আন্তরিক ভাবে সাহায্য করিয়াছিল।

চট্টগ্রাম আক্রমণের তারিখ স্থির হইল ১৮ এপ্রিল ১৯৩০। সেদিন ছিল গুডফ্রাইডে।

সব দলই সামরিক পোষাকে সজ্জিত হইয়া নেতা সূর্য্যসেনের আদেশে মোটরে আরোহণ করিয়া যুগপৎ ঘাঁটিগুলি আক্রমণ করিল।

প্রথম রিজার্ভ পুলিসের ঘাটি আক্রমণ করে যে দলটি তাহার নেতা ছিল অনন্তসিংহ। প্রধান সহায়ক ছিল গণেশচন্দ্র ঘোষ। ঘাঁটিটি সহরের বাইরে একটি পাহাড়ের উপরে অবস্থিত। গাড়ী আসিয়া অস্ত্রাগারের নিকটে উপস্থিত হইল, আর সকলে নামিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে লাগিল। রক্ষী হাকিল, কে আসে থাম—**Halt who comes there ?** উত্তর হইল বন্ধু, **friends,** অতঃপরই রক্ষী গুলির আঘাতে পড়িয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়, আর যে যেখানে ছিল গুলিবর্ষণের শব্দ শুনিয়া সব পলাইয়া যায়। পরে অস্ত্রাগারটি (**Armoury**) ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় ও মেগাজিন খুলিয়া ফেলা হয়। রিভালভার, পুলিস ব্যবহৃত বন্দুক এবং বারুদ সবই লইয়া যাওয়া হয়। কিন্তু যে স্থানে বারুদ ছিল আক্রমণকারীরা সেই ঘরটির সন্ধান পায় নাই।

খবর পাইয়া জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট উইলসন সাহেব আসিয়া পড়িল। সঙ্গে ছিল পুলিস সাহেব। সাহেব আসিয়াই গুলিবর্ষণ করিতে লাগিল। বিপ্লবীরাও সমানে গুলি চালাইতে লাগিল। উইলসন রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু গাড়ীতে

যে কনেষ্টবলটি ছিল সে নিহত হয়। আর ড্রাইভারও গুরুতরভাবে আহত হয়। কাল্সেন ও ওয়াটসানও রাইফেলের আঘাতে আহত হয়।

ইতিপূর্ব্বে হিমাংশু সেন ও রঞ্জন ভিতরে প্রবেশ করে। হিমাংশু পেট্রোলের সহায়তায় আগুন ধরাইতে গিয়া পুড়িয়া যায়। অতঃপর অনন্ত ও গণেশ গাড়ীতে করিয়া তাহাকে বাড়ীতে রাখিয়া যায়। সাংঘাতিকভাবে পুড়িয়া যাওয়ায় দুই একদিন মধ্যেই সে মারা যায়।

সহায়ক সামরিক বাহিনীর প্রধান ঘাটি (**Auxiliary force Head Quarters**) চট্টগ্রাম সহর হইতে পাঁচমাইল দূরে অবস্থিত। যে বাহিনী উহা আক্রমণ করিতে যায়, তাহার নেতা ছিল লোকনাথ বল, প্রধান সহায়ক নির্ম্মল সেন। সঙ্গে ছিল রজত সেন, মনোরঞ্জন সেন, জীবন (মাখন) ঘোষাল, ফণী নন্দী, সুবোধ চৌধুরী প্রমুখ আর ত্রিশজন। সামরিক পোষাকে সজ্জিত টর্চ্চ হাতে ইহারা রাত্রি দশটায় উক্ত স্থানে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল, প্রহরী হাঁকিল কে আস্‌ছ ? থাম, **Halt, who comes there ?** উত্তর হইল আমরা মিত্র **Friends**। সাহেব জেনারেলের পোষাকে লোকনাথ বল কথা বলিতেছিল সাহেবের মতই। রক্ষী কাছে আসিয়া রাইফেলে হাত দেওয়া মাত্র তাহাকে গুলি করা হয় - গুলির আঘাতে সে পড়িয়া যায়। তারপরে অবিরত গোলাবর্ষণ চলিতে থাকে—এবং আরও তিনজন রক্ষী নিহত হইল।

সার্জ্জেণ্ট মেজর ফ্যারেল (**Farrel**) তখন নৈশভোজনে রত ছিল। গোলমাল শুনিয়া চীৎকার করিয়া নীচে আসিতেই সেও গুলির আঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। বিবি ফ্যারেল চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেই ফ্যারেল উত্তর করে **All right darling, I am gone** আমি চলিলাম। অতঃপরে বিবি ফ্যারেল তাহার ও নিজ শিশুসন্তানের প্রাণ ভিক্ষা চায়, তাহারা অক্ষত থাকে! কিন্তু গার্ড ওয়াদ্দার আসিতেছিল বাধা দেওয়ার জন্য। অমনি সেও গুলির আঘাতে নিহত হয়। এতদ্ভিন্ন জনেক সহিস এবং আরও তিনজন নিহত হয়। ঘাটিটি সম্পূর্ণরূপে বিপ্লবীদের অধিকৃত হয়।

রাত্রি দুই ঘটিকার সময় কয়েকজন সামরিক অফিসার একটি মেশিন কামান লইয়া বিপ্লবীদের উপরে গোলাবর্ষণে প্রবৃত্ত হয়। বিপ্লবীরাও প্রত্যুত্তরে বিরত হয় না। শীঘ্রই মেসিনগানের গোলাবর্ষণও বন্ধ হয়। অতঃপর বিপ্লবীদল বাড়ীটি পোড়াইয়া দিয়া অস্ত্র শস্ত্র সব সঙ্গে লইয়া পাহাড় হইতে নীচে নামিয়া আসেন। যে সমস্ত অস্ত্র অপসারিত হয় তন্মধ্যে কতকগুলি পিস্তল ও রাইফেল এবং একটি লুইসগান্ (Lewis gun ছিল।

টেলিগ্রামের তারও কাটিয়া দেওয়া হয়। বাহিরে সংবাদ আদান প্রাদান আর কোন সম্ভাবনা ছিল না।

টেলিফোন আফিসের অপারেটারকে ক্লোরফর্ম করিয়া অজ্ঞান করিয়া দেওয়া হয়। সুইচ বোর্ডটি হাতুড়ীর আঘাতে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলা হয় এবং বাড়ীটিও পোড়াইয়া দেওয়া হয়।

টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন ধ্বংসের ভার ছিল অম্বিকা চক্রবর্ত্তীর উপরে।
একদিন পূর্ব্বেই রেল পথের পাটি তুলিয়া দিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা হয়। ফলে ধূম ষ্টেশনের নিকটে একটি মালগাড়ী লাইনচ্যুত হইয়া পড়ে।

কেবল সেই রাত্রিতে পাহাড় তলির ইউরোপীয়ান ক্লাবটির উপরে আক্রমণ চালানো যায় নাই। কিন্তু পরে যে সে ক্ষোভ মিটিয়াছিল, তাহা পরে বলিব।

আইরিস প্রজাতন্ত্রবাহিনী যে দিন বিদ্রোহ ঘোষণা করে, বিপ্লবীরা সেই ১৮ই এপ্রিল দিনটিই স্থির করিয়াছিল।

দুইটি অস্ত্রাগার দখল ও টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, রেলপথ বিচ্ছিন্ন :হইবার পরে সাহেবেরা স্ত্রীপুত্র লইয়া বন্দরের জাহাজে পলাইয়া গিয়া আশ্রয় লয়। তিন দিন সহরটি বিপ্লবীদেরই অধিকারে ছিল।

দুইদিন পরে সকলে বুঝলেন যে বিভিন্ন স্থান হইতে সেনাবাহিনী আসিয়া তাহাদের উদ্দেশ্য পণ্ড করিয়া ফেলিবে। তাই তাহারা চট্টগ্রামের পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। অনাহারে অভুক্ত অবস্থায় তাহারা এইখানে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইল। বিপক্ষ দল আসিয়া

পড়িল। দুইপক্ষ হইতে অস্ত্রের ঝনঝনানি, গুলি গোলার আওয়াজ কর্ণ বধির করিয়া ফেলিল। বিপ্লবীদের, অনেকে হত ও আহত হইল, কিন্তু তাহাদের ঘাঁটি অধিকৃত হইল না। হরিগোপাল বল (ওরফে টেগ্‌রা) জ্যেষ্ঠ লোকনাথবল ও অন্যান্য সকলকে যুদ্ধ চালাইতে বলিয়া বীরের ন্যায় মৃত্যু বরণ করিল। যাহারা মরিল তাহাদের মধ্যে ঢাকার ত্রিপুরা সেন, ময়মনসিংহের নরেশ রায়, কুমিল্লার বিধু ভট্যাচার্য্য, প্রভাসবল, মধুসূদন দত্ত (বিদগ্রাম, চট্টগ্রাম) নির্ম্মল লালা, যতীন্দ্র দাশগুপ্ত (কৈবল্য), পুলীন বিকাশ ঘোষ, শশাঙ্ক সেন ও মতিলাল কাননগুর নাম বিশেষ উলেখযোগ্য। ইহাদের পবিত্র শোণিতে জালালাবাদের পাহাড় রঞ্জিত হইল।

"বীরগণ জননীরে
রক্ততিলক ললাটে পরাল
জালালবাদ পাহাড়ে।"

ক্যাপটেন Taite (টেইট্) ও কর্ণেল স্মীথ (Smith) জালালাবাদ ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলে—

"আমরা জালালাবাদ গিয়েছিলাম—বিদ্রোহীরাই প্রথমে আমাদের উপরে গুলিবর্ষণ করে। উভয় পক্ষ হইতেই এইরূপ গুলি চলে। সন্ধ্যার পর হইতেই গুলিবর্ষণ থামিয়া যায়। ইতিমধ্যে আমরা একটা জনরব শুনিতে পাইলাম যে, রাত্রিতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক আক্রান্ত হইবে, তাই আমরা রাত্রে চলিয়া গিয়া আবার সকালে আসি। সকালে আসিয়া আমরা দেখিলাম দশজন মরিয়া রহিয়াছে। মতিলাল কাননগু মৃতপ্রায় হইয়াছে আর অর্ধেন্দু দস্তিদারের আঘাতও খুবই গুরুতর হইয়াছে।"

জালালাবাদ পাহাড়ে যাহারা আহত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ হাঁসপাতালে মরিল। সদর ঘাটের অমরেন্দ্র নন্দী আত্মহত্যা করে। অম্বিকা চক্রবর্ত্তীও গুরুতরভাবে আহত হন। এইভাবে অনেকে মরিল বা অর্দ্ধমৃত হইল, কিন্তু সূর্য্যসেন, নির্ম্মল সেন, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ

প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল—কেহ তাহাদের সন্ধানও পাইল না।

৩।৪ দিন পরে, ২৩শে এপ্রিল ফেনী ষ্টেশনে পুলিসের সঙ্গে কয়েকজন বিপ্লবীর সংঘর্ষ হয়। কেহ কেহ ধরা পড়ে। এই দলে অনন্ত সিং, লোক নাথ বল, গণেশ ঘোষ ও ছিল। কিন্তু তাহাদিগকে সেখানে কেহ ধরিতে পারিল না।

ইহার দিন পোনর পরে, ৭ই মে কর্ণফুলী নদীর অপর পারে কালারপুল নামক স্থানে কয়েকজন বিপ্লবী ও পুলিসের সংঘর্ষ হয়। তাহাতে রজত সেন, দেবপ্রসাদগুপ্ত, মনোরঞ্জন সেন ও স্বদেশ রায় নিহত হয়।

ইহার পরেও অনেকে ধরা পড়িল, কেহ কেহ স্বীকারোক্তি করিতেও আরম্ভ করে। অনন্ত সিংহ এই সব শুনিয়া পুলিসের কাছে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করেন। ১৯৩০ সালের ২৫শে জুন, আই. জি লোম্যান সাহেবের কাছে তিনি নিম্ন লিখিত পত্রখানি লেখেন—

Dear Lowman

I shall meet you on the 28th June. I am sure you will never miss that opportunity to arrest me then and there. I am also quite ready for it. Never think it please, that I am going to surrender.

Do you think I am repentant for any of my actions? No, never. It is my personal affair and absolutely private that compells me to take this step.

Yours sincerely
Revolutionary Ananta Sinha

পত্রানুবাদ—

প্রিয়-লোমান,

আমি আগামী ২৮ শে জুন আপনার—সহিত দেখা করিব। আমি জানি আপনি আমাকে তৎক্ষণাৎ সেই স্থলেই ধৃত করিবার সুযোগ ত্যাগ করিবেন না। আমি সে জন্যে প্রস্তুত হইয়াই যাইতেছি। কখনও মনে করিবেন না আমি আত্মসমর্পণ করিতেছি।

আপনি কি মনে করেন, আমি আমার কৃতকর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত? না, কখন না। আমি নিতান্ত ব্যক্তিগত এবং গোপন কারণে-ই ধরা দিতেছি

ইতি—বিদ্রোহী অনন্তসিং

তারপর অনন্ত যথা সময়ে পুলিস আফিসে আসিয়া কার্ড পাঠাইয়া ধরা দিলেন।

অতঃপর অনন্ত সিংহ, ধীরেন দস্তিদার, ফণীন্দ্র নন্দী, সুবোধ চেধুরী সহায়রাম দাস, নিতাইপদ ঘোষ, লালমোহন সেন, ফকির সেন, অনীল বন্ধু দাস প্রভৃতি ১৭।১৮ জনের বিরুদ্ধে চার্জ্জসিট দেওয়া হয় এবং চট্টগ্রামের সেসন জজ ইউনি (**Younie**), রায়বাহাদুর ডি, পি, ঘোষ ও **A. H. M.** আবুল হস্‌নত, মহম্মদ আবদুল হাই ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট) কে লইয়া একটি স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল গঠিত হয়।

এই ট্রইবুন্যাল গঠিত হইবার পূর্ব্বে **Chittagong Armouray Raid Ordinance** জারী হয়।

২৪শে জুলাই হইতে বিচার আরম্ভ হয়। কিন্তু মোকদ্দমা কিছুদিন চলিবার পরে আবার নূতন করিয়া আরম্ভ হয়। ইহার কারণ বিবৃত করা আবশ্যক।

প্রথম মোকদ্দমার আরম্ভের সময় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ফেরারী ছিল—

(১) আনন্দ গুপ্ত—পিতা মনাগুপ্ত (আউটগাছি, ঢাকা)

(২) সরোজকান্তি গুহ—পিতা নন্দলাল গুহ, উকীল

(৩) হেমেন্দ্র দস্তিদার—পিতা ডাঃ অক্ষয় দস্তিদার

(৪) জীবন ঘোষাল—পিতা যশোদা ঘোষাল, বেত্‌কা—ঢাকা

(৫) লোকনাথ বল—পিতা প্রাণকৃষ্ণ বল

(৬) সূর্য্য সেন—নওয়াপাড়া

(৭) নির্ম্মল সেন—নওয়াপাড়া

(৮) রামকৃষ্ণ বিশ্বাস—পিতা দুর্গাবিশ্বাস, নারোয়াটুলি, চট্রগ্রাম

(৯) কালীপদ চক্রবর্ত্তী—পিতা শ্যামাচরণ স্মৃতিতীর্থ

(১০) বীরেন্দ্র দে—পিতা চন্দ্রকুমার দে

(১১) কৃষ্ণ চৌধুরী

(১২) গণেশ ঘোষ—পিতা বিপিন ঘোষ

(১৩) অম্বিকা চক্রবর্ত্তী—পিতা নন্দ শিরোমণি

(১৪) হরিপদ মহাজন

(১৫) বিনোদ দত্ত

(১৬) ভবতোষ ভট্টাচার্য্য

(১৭) তারকেশ্বর দাস্তীদার—পিতা—শরৎ দস্তিদার

(১৮) দীপ্তিমেধা চৌধুরী—পিতা—অতুল চৌধুরী

(১৯) ক্ষীরোদ বানার্জ্জী—বরিশাল

(২০) নারায়ণ সেন—ঢাকা

(২১) সীতারাম বিশ্বাস

(২২) শৈলেশ্বর চক্রবর্ত্তী

(২৩) সুরেশদেব—ঢাকা

(২৪) বিনোদ চৌধুরী, পিতা কামিনী চৌধুরী—চট্টগ্রাম

ইহার পরের ঘটনা, ২রা সেপ্টেম্বর (১৯৩০) চন্দননগরের লোমহর্ষক আকস্মিক ঘটনা। চন্দননগরে গোন্দলপাড়ায় একটী বাড়ীতে শশধর আচার্য্য ও সুহাসিনী গাঙ্গুলি বাস করিত। বাড়ীটা ছিল একটু নির্জ্জন স্থানে, দক্ষিণ-পশ্চিমে গলি, উত্তর পূর্ব্বে পুকুর। লোকে মনে করিত তাহারা স্বামী-স্ত্রী। বাড়ীটী দোতলা। শশধরের বাড়ী খুলনা জেলার সেনহাটি—সে রেলবিভাগে ক্রুর (crew) কাজ করিত। সুহাসিনী কাশীশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিত। যশোদা নাম্নী একটি ঝি বাসন মাজিত, বাজার করিত। সবই যেন কেমন অদ্ভুত বলিয়া মনে হইত। ইহারা কম কথা কয়, কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইত না। এইখানেই গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, আনন্দ গুপ্ত ও জীবন (ওরফে মাখন) ঘোষ লুক্কায়িত ছিল। পুলিস অবশেষে গোয়েন্দার সহায়তায় ইহাদের সন্ধান পাইল।

২রা সেপ্টেম্বর রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বে, পুলিস আসিয়া বাড়ীটি ঘিরিয়া ফেলে, সঙ্গে আসেন স্বয়ং গোয়েন্দা কর্ত্তা টেগার্ট সাহেব। বেগতিক দেখিয়া

লোকনাথ বল, জীবন ঘোষাল প্রভৃতি গৃহের বাসিন্দারা গুলি ছুড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলিল, অবশেষে জীবন ঘোষাল প্রাণ হারাইল, আর তিনজন ধরা পড়িল। যথাসময়ে তাহারা চট্টগ্রামে প্রেরিত হয়।

শশধর ও স্থহাসিনী ধৃত ও প্রহৃত হইল। তাহাদের প্রতি প্রহারের কথা তাহারা হাকিমকে আদালতে জানাইয়াছিল। তাহাদিগকে প্রহার করিতে করিতে জলে ফেলিয়া দেওয়া হইয়া ছিল। জীবনের মৃতদেহ পুকুর হইতে তোলা হইয়াছিল।

এইস্থানে আর একটি শোকবহ ঘটনা ঘটে। অর্জ্জুন মণ্ডলের বাড়ী ছিল খুবই নিকটে, তাহার কনিষ্ঠ ভাই চিত্ত পুলিসের গুলিতে মারা যায়। চতুপার্শ্বস্থ গ্রামের যাবতীয় লোক তাহার মৃত্যুতে আসিয়া শোকযাত্রায় যোগদান করে।

তিনজনকে চট্টগ্রামে লইয়া অনন্ত সিংহদের সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া হয়। নূতন করিয়া আবার বিচার আরম্ভ হয়—৩রা সেপ্টেম্বর হইতে। যে কয়জন স্বীকারোক্তি করিয়াছিল, তাহারা উহা প্রত্যাহার করে।

পরে (১৯৩২, ১লা মার্চ্চ তারিখে) প্রায় দুইবৎসর পরে বিচারের ফলাফল বাহির হয়। অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল ও গণেশ ঘোষ, লালমোহন সেন, স্থবোধ চৌধুরী, ফণীন্দ্র নন্দী, আনন্দ গুপ্ত, ফকির সেন, সহায়রাম দাস, বনবীর দাশগুপ্ত, স্থবোধ রায় ও স্থখেন্দু দস্তীদার—এই বারজনের হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। অনাথবন্ধু দাস ও নন্দলাল সিংহকে নাবালক বিধায় ৫৬২ধারা কাঃ বি,অনুসারে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

এই মোকদ্দমা চলিবার সময়ে অনেক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে—তন্মধ্যে দুইটি প্রধান, একটি তারিণী মুখার্জ্জির হত্যা, অপরটি ইন্স্পেকটার আসামুল্লা হত্যা।

প্রথমটি হয় চাঁদপুর সহরে, ১৯৩০ সালের ১৮ ডিসেম্বর তারিখে।

তারিণী মুখার্জ্জির হত্যা

পূর্ব্বে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসকে ফেরার দেখান হইয়াছে। সেও সূর্য্যসেনের দলভুক্ত ছিল। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মাস দুই আগে ফেরারী অবস্থায় সে কিছুদিন সাবিত্রীদেবীর বাড়ীতে লুক্কায়িত অবস্থায় ছিল। তাহার ও কালীপদ মুখার্জ্জির উপরে পুলিসের বড় কর্ত্তা (আই. জি অব পুলিস) ক্রেইগ সাহেবকে হত্যা করিবার ভার পড়িয়াছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে লোম্যান সাহেব নিহত হইবার পরে ইনিই এই পদে অধিষ্ঠিত হন।

১৯৩০ সালের ১লা ডিসেম্বর রাত্রিতে ক্রেইগ সাহেব চট্টগ্রাম হইতে কলিকাতার পথে যখন চাঁদপুরে ষ্টিমারে উঠিবেন, ইনস্পেকটার তারিণী মুখার্জ্জি রাস্তায় তাঁহার রক্ষীর কাজ করিবেন ও চাঁদপুরে ষ্টীমারে উঠিবার সময়ে তাঁহাকে অভিবাদন করিবেন, এইরূপ কথা ছিল। তারিণীবাবু লাকশামে অনুমান রাত্রি দুইটায় উঠেন কিন্তু ২য় শ্রেণীর কামরাতে জায়গা না থাকায় প্রথম শ্রেণীর কামরাতেই উঠিয়া পড়েন। ইঁহার চেহারা বেশ ফর্সা ছিল ও দেখিতে বেশ লম্বা। চাঁদপুরে গাড়ী আসিবার পরে ভোরে ৪টার সময়ে তারিণীবাবু যেমন নামিয়া থার্ড ক্লাসের দিকে আসিতেছে, রামকৃষ্ণ ও কালীপদ তাহাকে ক্রেইগ ভ্রমে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলে। উভয়েই চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মোকদ্দমার আসামী ছিল। ইহারাও লাকশামে গাড়িতে উঠিয়াছিল। গুলি করিয়া উভয়ে পলাইয়া যায়, কেহ তাহাদিগকে তখন ধরিতে পারে নাই।

কুড়ি মাইল হাঁটিয়া মেহের কালীবাড়ী ষ্টেসনের কাছে ক্লান্ত অবস্থায় একটা দোকানে তাহারা বিশ্রাম করিতেছিল। একজনের গায়ে ছিল সবুজ রংয়ের আলোয়ান, আর এক জনের ছিল লাল রংয়ের। একজন ছিল ফর্সা আর একজন একটু ময়লা।

এই সময় ত্রিপুরা জেলার য়্যাডিসন্যাল এস পি, মিঃ বি সি দাশগুপ্ত সদলবলে মোটরে করিয়া আসিতেছিল। সন্দেহ হওয়ায়, তাহাদের কাছে আসে,

কিন্তু উভয়েই দৌড়িয়া পলাইয়া যায়। পুলিশের লোক বেশী থাকায় অবশেষে তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলে।

উভয়ের কাছে যে রিভলভার পাওয়া যায়, তাহা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগারের আগ্নেয়াস্ত্র। আর যে বোমা পাওয়া যায়, তাহাও ডালহাউসী স্কোয়ারের বোমার অনুরূপ।

যাহা হউক ইহাদের বিচার হয় আলিপুরে ট্রাইবুন্যালে। জজ হন মিঃ গার্লিক, এন, কে, বসু ও খান আদিলজুমান চৌধুরী। বিচার আরম্ভ হয় ১৯৩১, ৩রা জানুয়ারী। বিচারে রামকৃষ্ণের হয় মৃত্যুদণ্ড আর কালীপদের বয়সের অল্পতাবশতঃ হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। *

দ্বিতীয় ঘটনাটি ১৯৩১ সালের ৩০শে আগষ্ট চট্টগ্রাম সহরে আসানুল্লার হত্যা।

ইনি অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ব্যাপারের তদন্ত করিতেন। পাঁচ ছয়মাস পূর্ব্বে হরিপ্রসাদ ভট্যাচার্য্যের সঙ্গে সূর্য্যসেনের পরিচয় হয় এবং তাহাকে একটি রিভালভার ও গোটা ১২ কার্ত্তুজ দেওয়া হয়। ২৯শে আগষ্ট হরিপ্রসাদ খেলার মাঠে প্রথম একবার আসানুল্লার জীবননাশের চেষ্টা করে, কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও সুযোগ পায় না। ৩০শে পরদিন, এই সুযোগ আসিল। সে পরপর ৪টি গুলির আঘাতে তাহাকে হত্যা করিতে সক্ষম হয়। বিচারে সুকুমার সেন আই, সি, এস বিশেষ জুরীর সহায়তার তাহার মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে, কিন্তু হাইকোর্টের আপিলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। হরি প্রসাদের বয়স ছিল মাত্র ১৮ বৎসর। ইহার পরে চট্টগ্রামে অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়।

চট্টগ্রাম ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমাতে ১৯৩১ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর তারিখে অর্দ্ধেন্দুগুহ, নিবারণ ঘোষ, রবীন্দ্রসেনের তিনবৎসর করিয়া জেল হয়। সুশীল সেন ও প্রফুল্ল মুখার্জ্জীর হয় দুই বৎসর। অপূর্ব্ব সেন ফেরার হয়। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের দ্বিতীয়বার বিচার আরম্ভ হয় ১৯৩৩ এর ৩রা জানুয়ারী হইতে। আসামী ছিল অম্বিকা চক্রবর্ত্তী, হেমেন্দ্র দস্তিদার ও

* এ সম্বন্ধে পরে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব।

সরোজ গুহ। ১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাসে পটিয়া মহকুমার কচুয়াই গ্রামে অম্বিকাবাবু ধরা পড়েন।

হেমেন্দ্র ঘোষ দস্তিদারকে ১৯৩২ সালের ২৬ আগষ্ট তারিখে কলিকাতার ১৩০ মাণিকতলা ষ্ট্রীটের ফ্রেণ্ড ইউনিয়ান মেস হইতে বাহিরে আসিবার সময় বড়তলা থানার সব ইন্স্পেক্টর যতীন্দ্র মুখার্জ্জি ধরিয়া ফেলে। সেখানে সে বরিশালের সুরেন্দ্র রায় নামে বাস করিতেছিল।

হেমেন্দ্রের সহোদর অর্দ্ধেন্দুই জালালাবাদে গুলির আঘাতে মৃতপ্রায় হয়। তাহাদের খুড়তুত ভাই সুখেন্দুর অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের প্রথম মোকদ্দমায় দ্বীপান্তর হয়।

সরোজ গুহ, শৈলেশ রায় নামে প্রাইভেট শিক্ষকের কাজে নোয়াখালি জেলার ধবলপুর গ্রামে ধরা পড়ে।

১৯৩৩এর ১০ই ফেব্রুয়ারী এই মোকদ্দমায় অম্বিকা চক্রবর্ত্তীর ফাঁসীর আদেশ হয়, আর সরোজগুহের হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। সে অল্পবয়স্ক ছিল। হাইকোর্টের যে আপিল হয়, তাহাতে অম্বিকা চক্রবর্ত্তীর ফাঁসীর পরিবর্ত্তে দ্বীপান্তর আদেশ হয়।

তৃতীয় মোকদ্দমার আসামী হয় সূর্য্যসেন, তারকেশ্বর দস্তীদার ও কল্পনা-দত্ত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সূর্য্যসেনই ছিলেন সমগ্র দলের নেতা এবং তাঁহার পরে তারকেশ্বর হয় নেতা। কল্পনা বিএ পরীক্ষা দিয়াছিল। কিরূপে তাহারা গ্রেপ্তার হয়, কাহিনীটি এইখানে বিবৃত করিব—।

চট্টগ্রামের ধলঘাটগ্রামে নবীনচক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে সূর্য্যসেন, নির্ম্মলসেন প্রভৃতিকয়েকজন ফেরারী বিপ্লবী নেতা আশ্রয় লয়।

স্থানটি পটিয়া সামরিক আবাসের (military camp) ৪মাইল দূরবর্ত্তী।

নবীনচক্রবর্ত্তীর বিধবা স্ত্রী সাবিত্রীদেবীর সহায়তাই ইহা সম্ভব হয়। বাড়ীতে সাবিত্রী দেবীর চৌদ্দবৎসররের কন্যা স্নেহলতা ও সহোদর মনীন্দ্র থাকিত।

১৯৩২ সালের ১৩ই জুন তারিখে কাপ্টেন ক্যামারান, সৈন্য, পুলিসের দারোগা মনোরঞ্জন সেন ও কয়েকজন পুলিস সহ নবীন চক্রবর্ত্তীর বাড়ী ঘেরাও করে। বাড়ীটি দেতলা। সূর্য্য ও নির্ম্মল উপরে থাকিত। এইখানে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারও ১১ই জুন হইতে আসিয়া বাস করিতেছিল। চাঁদপুর যাইবার পূর্ব্বে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস এবং কালীপদ চক্রবর্ত্তীও এই বাড়ীতে ছিল।

প্রীতিলতা গত ১৯৩২ সালে বেথুন কলেজ হইতে বিএ পাশ করিয়া সূর্য্যসেনের নেতৃত্বে বিপ্লবী সঙ্ঘে যোগদান করে। তাহার পিতা জগবন্ধু ওয়াদ্দেদার ছিলেন ম্যাজিষ্ট্রেট আফিসের হেড্ ক্লার্ক। পড়াশুনায় তাহার বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। তাহার ডাক নাম ছিল 'রাণী'। রাণীকে দলভুক্ত করে অশ্বিনী। প্রীতি বা রাণী তাহাকে 'মণিদা বলিয়া ডাকিত। প্রীতিলতা এই সময়ে নন্দনকানন বালিকা বিদ্যালয়ের হেড্‌মিসট্রেস ছিল।

কাপ্টেন ক্যামারান বাহিরের একটি বাঁশের মই বাহিয়া দোতালায় উঠিতে প্রয়াস পায়, কিন্তু সূর্য্যসেন চীৎকার কবিয়া, বলে", বোমা নিক্ষেপ করো"। ক্যামারান যখন বাইরের সিড়ি দিয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করে—সূর্য্যসেনের গুলিতে সে তৎক্ষণাৎ নিহত হয়। উভয় পক্ষ হইতে গুলি চলে। নির্ম্মল সেনও দোতালার ঘরে গুলির আঘাতে ভূতলশায়ী হইয়া জল জল করিয়া চীৎকার করিতে থাকে। নির্ম্মলের ঘরে ট্রটস্কিরচিত পুস্তক, রামকৃষ্ণদাসের ফটো প্রভৃতি পাওয়া যায়।

অপূর্ব্ব সেনও (ওরফে মনীন্দ্র) গুলির আঘাতে নীচে নিহত হয়। অপূর্ব্ব সেন ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার অন্যতম আসামী। সূর্য্যসেন, প্রীতিলতা ও সীতারাম বিশ্বাস অত্যন্ত ক্ষিপ্রকারিতার সহিত পলাইয়া যায়।

সকাল হইতেই জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিস সাহেব ও সৈনাধ্যক্ষ মেজর গর্ডন আসিয়া উপস্থিত হয়। পুলিশ সাহেব, ও ম্যাজিষ্ট্রেট আসিয়া পড়ায় সাবিত্রী দেবী ও স্নেহলতা দেবী আত্মসমর্পণ করে। তাহাদের বিরুদ্ধে ফেরারী আসামী লুকাইয়া রাখিবার জন্য মোকদ্দমা হয়। আসামীদের বিচার হয় নৃসিংহ

মুখার্জ্জি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে। সাবিত্রী দেবী, স্নেহলতা, রামকৃষ্ণচক্রবর্ত্তী, মহেন্দ্রলাল দে, ননীগোপাল দাশগুপ্ত, অজিত বিশ্বাস আসামী শ্রেণীভুক্ত ছিল।

এই ধলঘাটে কতকগুলি কাগজপত্র ও দুইখানি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়—। পুস্তক দুইখানি জেল হইতে কোন লোকের মারফতে কৌশলে প্রেরিত হইয়াছিল। ইহার একখানির বিষয় বস্তু ছিল, ভারতে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস—লেখকের নাম ছিল 'অমরধামের যাত্রী'। প্রকৃতপক্ষে গণেশ ঘোষই ইহা রচনা করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়খানিতে ১৮ই প্রিলের অভিযানের বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়। ইহা পাঠ করিয়া জানা যায় যে ১২০০০ টাকা, ১০০০০ কার্ত্তুজ ও শতাধিক লোক এই কার্য্যের জন্য সংগৃহীত হইয়াছিল। কোথায় কি হইয়াছিল সব বিবরণ ইহাতে বর্ণিত ছিল। বিবরণটি স্থর্য্যসেন কর্ত্তৃক লিখিত। তিনি বড় দুঃখ করিয়াছেন যে সেই রাত্রে (১৮ এপ্রিল ১৯৩০) কেবল ইউরোপিয়ানদের ক্লাবটি আক্রমণ করা বাকী ছিল। রাত্রি অধিক হইয়াছিল, সভ্যরা সব চলিয়া গিাছিল, আরও অন্যান্য কারণ বশতঃ এই কাজটি অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়।

যাহা হউক এবার স্থর্য্যসেন ঐ ক্লাবটি আক্রমণের ভার দেন প্রীতিলতার উপর। প্রীতিলতা ভিন্ন, কল্পনা দত্তও বিপ্লব আন্দোলনে যোগদান করে। তাহাকেও অশ্বিনীই দলভুক্ত করে। মাষ্টার দার উপর প্রীতিলতার শ্রদ্ধা ছিল অসীম ; সে ইহা বিশেষ আবেগভরে লিপিবদ্ধ করে।

কল্পনাদত্ত, রায় বাহাদুর দুর্গাদাস দত্তের পৌত্রী। চট্টগ্রাম হইতে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করিয়া সে কলিকাতার বেথুন কলেজে গিয়া ভর্ত্তি হয়। ১৯২৯, আই এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। ১৯৩১ বিএস-সি পরীক্ষা দিয়া চট্টগ্রামে আসে এবং বিপ্লবান্দোলনে যোগদান করে, এবং অনেক অর্থ ও অলঙ্কার সংগ্রহ করিয়া দেয়। প্রবল ঝড় বৃষ্টির মধ্যে একদিন সে স্থর্য্যসেন ও নির্ম্মল সেনের সঙ্গে দেখা করিতে যায়। সেখানে প্রথমে সে রিভলভার ছুড়িবার অভ্যাস করে। তাহাকে পুলিস ইতিপূর্ব্বেই একবার ধরিয়াছিল

কিন্তু অভিভাবকগণ জামিন হইয়া ছাড়াইয়া আনেন। আরতি দাস নামে সে ফাঁসীর আসামী রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সহিত জেলে দেখা করিত। তবে বিপ্লবীদের কাছে তাহার নাম ছিল অনিমা।

১৯৩২ এর ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে তাহাকে পাহাড়তলী রেলওয়ে ইনিষ্টিউটের নিকটে-দুইটি যুবকের সহিত পুরুষের বেশে দেখা যায়। পাহাড়-তলীতে-উক্ত ক্লাবের অবস্থান সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জ্ঞাত হইবার জন্য সেখানে সে উপস্থিত হইয়াছিল। ইতিমধ্যে পাহাড়তলীর ডাক্তার কুণ্ডু পুলিশে খবর দেয়। দারোগা সঞ্জীব নাগ আসিয়া উহাদিগকে পাহাড়তলীর লম্বা ডাক্তারের ডিস্‌পেন্সারীতে উপবিষ্ট দেখে। কল্পনার পরিধানে ধুতি সার্ট ও গায়ে খদ্দরের চাদর ও মাথায় রুমাল বাঁধা ছিল। সঙ্গী যুবকদের নাম ছিল নির্ম্মল সেন ও দীনবন্ধু মজুমদার—। এই নির্ম্মল সেন আসামী নির্ম্মল নহে। এই নির্ম্মল সেন ও দীনবন্ধু উভয়েই পাহাড়তলী রেলওয়ে কারখানায় কাজ করিত।

তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু ইহার ৮।১০ দিন পরে তাহাকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। এই অবস্থায়ই সে ২৬শে ডিসেম্বর হইতে ফেরারী হইয়া যায়। তখন তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি ১০৯ ধারানুসারে বিচার চলিতেছিল।

যে দিন কল্পনা ধৃত হয়, তাহার ঠিক ছয়দিন পরে, ২৪শে সেপ্টেম্বর, (১৯৩২) সূর্য্যসেনের দল কর্ত্তৃক প্রীতিলতার নেতৃত্বে পাহাড়তলী ক্লাব আক্রান্ত হয়। উক্ত ক্লাবের পূরা নান ছিল Assam Bengal European Railway Institute at Phartali. আর সূর্য্যসেনের দল তাহাদের সৈন্যদলের নাম দিয়াছিল Indian Republican Army. কল্পনা এই ঘটনার দিন হাজতে ছিল।

যাহা হউক প্রীতিলতার নেতৃত্বে ১০।১২ জন যুবক মুসলমানের বেশে রাত্রি সাড়ে দশটার পরে ক্লাবটি চারিদিক হইতে আক্রমণ করে। তাহাদের হাতে বোমা ছিল, এবং অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বন্দুক রিভলভার প্রভৃতিও ছিল। ক্লাবঘরে প্রবেশ করিয়াই তাহারা মুহুর্মুহু বোমা নিক্ষেপ করিতে থাকে। ইউরোপিয়ানগণ

তাস ও বিলিয়ার্ড খেলিতেছিল, তাহারা যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল। মিসেস সানিভাবা গুরুতরভাবে আহত হয় এবং অচিরেই পঞ্চত্ব লাভ করে। মিঃ ম্যাকডোলেণ্ড ও তাহার মেম আহত হয়। মিঃ ও মিসেস লোয়ার, মিঃ মিডিলটন ও তাহার মেম রোজারেও আরও অনেক পুরুষ ও স্ত্রী সাংঘাতিকভবে আহত হয়। সার্জ্জেণ্ট ব্লাকবার্ণ ত্বরিত গতিতে গিয়া পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ হিক্‌সকে খবর দেয়। কিন্তু- হিক্‌স কাহাকেও ধরিতে পারে নাই। কারণ ইতিপূর্ব্বেই আক্রমণকারী দল সরিয়া পড়িয়াছিল।

ক্লাবগৃহের প্রায় একশত হাত দূরে প্রীতিলতার মৃতদেহ পাওয়া যায়। তখন তাহার পুরুষের বেশ ছিল। পটেসিয়াম সাইনাড্ গলধঃকরণ করিয়া সে আত্মহত্যা করে।

কিন্তু তাহার আত্মহত্যার কারণ কি? কেহ কেহ বলেন মেয়েরাও যে মৃত্যুভয় তুচ্ছ করিয়া বিপ্লবের কাজে আত্মসমর্পণ করিতে পারে প্রীতি সেই দৃষ্টান্ত রাখিয়া গেল।

অতঃপর বহুলোক ধৃত হইল। বহু নির্দ্দোষীর প্রতি অতিমাত্রায় পীড়ন ও অত্যাচার হইতে লাগিল। নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে ৮০০০০ টাকা পাইকারী জরিমানা নির্দ্ধারিত হইল।

নির্ম্মলসেন নিহত হইল। প্রীতিলতা আত্মহত্যা করিল। বাকী রহিল ফেরারী সূর্য্যসেন, তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্ত। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে ধরিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল। হাজার হাজার টাকা পুরস্কার দিবার ঘোষণা হইল।

সূর্য্যসেন ধলঘাট হইতে পলাইবার ৮মাস পরে ও পাহাড়তলী ক্লাব আক্রমণের পাঁচমাস বাদে গৈরুলা গ্রামে সারদা সেনের বাড়ী এক বিশ্বাস ঘাতকের চক্রান্তে ধৃত হয়। গ্রামটি পটিয়া হইতে ৫ মাইল দূরে। এখানে কল্পনা প্রভৃতি আরও অনেকে ছিল। ১৯৩৩ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে এক সেনাবাহিনী আসিয়া গ্রামটি ঘিরিয়া ফেলে। সূর্য্য সেন এবং তাহার সঙ্গীগণও গুলি ছুড়িতে

আরম্ভ করে। মনবিহারী ক্ষেত্রী নামক একজন গুর্খা সূর্য্যসেনকে ধরিয়া ফেলে। কিন্তু কল্পনা ও আর আর সব পলাইয়া যায়। সাতকানিয়ার ব্রজেন্দ্র দাসও গ্রেপ্তার হয়। এ যাবৎ সূর্য্যের গ্রেপ্তারের জন্য দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষিত হয়।

সূর্য্যসেন জেলে অবরুদ্ধ হইবার পরেও তাহাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা চলে। অনুমান মাস দেড়েক পরে শৈলেন রায় নামক জনৈক যুবক এই উদ্দেশ্যে জেলখানার আশে পাশে ঘুরিতে থাকে। ২৮শে মার্চ্চ (১৯৩৩) শৈলেন পুলিশ কর্তৃক ধৃত হয়। ইহারই একদিন আগে পটিয়া থানার দারোগা মাখন দীক্ষিত গুলির আঘাতে পঞ্চত্ব লাভ করে।

ইহার পরের অর্থাৎ শেষ অধ্যায় কল্পনা দত্ত ও তারকেশ্বর দস্তিদারের গ্রেপ্তার। ইহারা গাইরা গ্রামে আত্মগোপন করিয়াছিল। হঠাৎ সেনাবাহিনী ও (১৯৩৩ সালের ১৯ মে) পুলিশ আসিয়া যে বাড়ীতে উহারা ছিল একেবারে ঘিরিয়া ফেলে। উভয় তরফ হইতেই বন্দুক চলিতে থাকে। ফলে শচীন্দ্র দাস, পূর্ণ তালুকদার, মনোরঞ্জন দাস গুলির আঘাতে নিহত হয়। প্রসন্ন তালুকদারও সংঘাতিক ভাবে আহত হয়। এইখানেই কল্পনা ও তারকেশ্বর ধৃত হয়। তারকেশ্বরই সূর্য্যসেনের পরে নেতৃত্ব করিত। সে চট্টগ্রাম কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে বি. এস. সি পড়িত। তাহার তখন বয়স ২৩ বৎসর।

গাইরা গ্রমে ইহাদের নিকটে অনেক অস্ত্রশস্ত্র, বিস্ফোরক ও বোমা নির্মাণের নানারূপ উপাদান পাওয়া যায়। সূর্য্যসেন, তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্তের বিচারই অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের তৃতীয় বা শেষ মোকদ্দমা। W. Macsharpe, রজনী ঘোষ ও খঞ্জকার আলি তায়েফকে লইয়া একটী ট্রাইবুন্যাল গঠিত হয়। ১৯৩৩ এর ২৬শে জুন হইতে বিচার আরম্ভ হয়। পাহাড়ের উপরে যেখানে ফৌজদারী আদালত আছে সেইখানেই বিচার আরম্ভ হয়। আলিপুরের পাবলিক প্রসিকিউটার রায়বাহাদুর নগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ই সরকার পক্ষে মোকদ্দমা চালান। শ্রীশ রায়

চৌধুরীও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। কৌঁসিলি জে ঘোষল, রজনী বিশ্বাস, বিনোদলাল সেন আসামীদের পক্ষ সমর্থন করেন। প্রায় ১২৫ জন সাক্ষী উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দেয়। পর পর সব ঘটনাই বিবৃত হয়। তারকেশ্বর যে ১৯৩১, ১৬ই মার্চ্চ ইনস্পেক্টার শশাঙ্ক ভট্যাচার্য্যকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, সে প্রমাণও দেওয়া হয়।

বিচারে সূর্য্যসেন ও তারকেশ্বরের চরম দণ্ড হয়। আর কল্পনা দত্তের হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। এইভাবে পর পর তিনটি মোকদ্দমা শেষ হইয়া গেল। সম্মুখ সংগ্রামে অনেক লোক নিহত হইল, বিচারে অনেকের ফাঁসি হইল, অনেকে দ্বীপান্তরিত হইল কিন্তু অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও জালালাবাদের যুদ্ধ বিপ্লব ইতিহাসে একটি গৌরবময় স্থান অধিকার করিয়াছে। বীরত্বে, সাহসিকতায় সংগঠন নিপুণতায় ইহার সহিত এই জাতীয় অপর কোন ঘটনার তুলনা হইতে পারে না। দেশবাসী সেই সব বীর শহীদের কথা কখনও বিস্মৃত হইতে পারে না।

১৯৩৪ সালের ১২ জানুয়ারী প্রত্যুষে সূর্য্য সেনের ফাঁসী হইয়া যায়।

ইতিপূর্ব্বে দীপ্তিমেধা চৌধুরীকে ফেরারী দেখান হইয়াছে। সে চট্টগ্রামের এক গ্রামে স্বর্ণসীতাদেবী নামে একটি সাহসিকা মহিলার বাড়ীতে ছদ্মবেশে অবস্থান করিতেছিল। পুলিস দীপ্তিমেধাকে ১৯৩৩ সালের ৮ই জানুয়ারী তারিখে ঐ বাড়ী হইতে গ্রেপ্তার করে এবং বেঙ্গল অর্ডিনান্সে অন্তরীণাবদ্ধ করে—। ফেরারী আসামী লুকাইয়া রাখিবার জন্য স্বর্ণসীতা দেবী ও তাঁহার পুত্র মনীন্দ্রের তিনবৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। সতীশ দে নামক আর একব্যক্তিরও হয় ৪ বৎসর। মনীন্দ্রের স্ত্রী ললিতাদেবীকেও চালান দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু বিচারে তিনি খালাস পান।

পুঁটিয়া মেল ব্যাগ লুণ্ঠন ও সুশীলের আত্মদান

উত্তর বাঙ্গলায়ও একটি বিপ্লবী দল গড়িয়া উঠে, আর সুশীল দাশগুপ্তই ছিল উহার প্রধান সংগঠক ও নেতা। সুশীল রিপণ কলেজ হইতে আই, এ পাশ করিয়া রংপুর কলেজে ভর্ত্তি হয়। সেখানে তাহার নেতৃত্বে বিপ্লবী যুগান্তর দলের একটী শাখা গড়িয়া উঠে। বহু পূর্ব্বে বাংলার প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চাকীও রংপুর হইতেই বারীন্দ্র ঘোষের দলভুক্ত হয়। নাটোরের নিকটবর্ত্তী পুটিয়ার ডাকগাড়ীর ডাকাতি এই সুশীলের দলের দ্বারাই সংঘটিত হয়।

নাটোর হইতে রাজসাহী যে বাস্ যাতায়াত করিত, তাহাতেই পোষ্টাফিসের ডাক বহন করা হইত। ১৯২৯ সালের ১১ সেপ্টেম্বর, নাটোর হইতে ডাক সহ বাসটি পুটিয়ায় আসিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। বাসে যাত্রীরাও ছিল। তন্মধ্যে সুশীল এবং তাহার কয়েকজন সহকর্ম্মীও ছিল। তাহাদের নাম ধরণীকান্ত বিশ্বাস, রাখাল দাস প্রভৃতি।

পুঁটিয়া হইতে গাড়ী ছাড়িবার একটু পরেই কে একজন চীৎকার করিয়া উঠিল, "থামাও, থামাও, ঘড়ি পড়িয়া গিয়াছে।" সকলেরই দৃষ্ট সেই দিকে নিবদ্ধ হয়। অতঃপর ড্রাইভার যেমন বাস থামাইল, সুশীল ও তাহার সঙ্গীগণ ছোরা বাহির করিয়া অন্য যাত্রীদের নামিতে বলে। যাত্রীরা প্রাণভয়ে নামিতে লাগিল, আর একজন সম্মুখস্থ হেডলাইট্‌টি ভাঙ্গিয়া ফেলিল এবং সম্মুখের টায়ার ফুটা করিয়া দিল। বাসের ম্যানেজারও গাড়ীতে ছিল, সে আপত্তি করিলে সুশীলকুমার দাশগুপ্তই তাহার প্রতি গুলি নিক্ষেপ করে। এদিকে ধরণী মেল ব্যাগ লইয়া পলাইয়া যায়। পলাইবার সময়ে কেহ তাহাদের পেছনে পেছনে না আসে তাই তাহারা গুলি ছুড়িতে ছুড়িতে দৌড়াইতে থাকে। একজন যাত্রী সাহস করিয়া সুশীলকে ধরিয়া ফেলে, সুশীলও ছাড়াইতে চেষ্টা করে। উভয়ে কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি হয়, কিন্তু সুশীল তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া পলাইতে সক্ষম হয়। কয়েকজন তাহার পেছনে দৌড়াইতে থাকে। সুশীল ক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করিল

কিন্তু একটু দূরে গিয়া পায়ে চোট খাইয়া পড়িয়া গেল, সেখানেই সে ধৃত হইল।

পুলিসের তদন্তের পরে সুশীল, ধরণীকান্ত বিশ্বাস ও রাখাল দাসের ট্রাইবুন্যালে বিচার হয়। সেখানে বিচারক থাকেন মিঃ জে, এম, প্রিঙ্গল, যতীন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী ও এমামুদ্দিন আলিওয়াল। বিচারে সুশীলের দণ্ড হয় ৬ বৎসর, ধরণী বিশ্বাসের ও রখাল দাসের হয় ৭ বৎসর।

অতঃপর আপিল হয়। সেখানে বিচারপতি চারুচন্দ্র ঘোষ ও সত্যেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক রায়ে রাখালকে ছাড়িয়া দেন, কিন্তু অন্য দুইজনের দণ্ড পূর্ব্ববৎ বহালই থাকে।

ইহার পরে সুশীলকে মেদিনীপুর জেলে রাখা হয়। জেলের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া ইনি, দীনেশচন্দ্র মজুমদার এবং শচীন করগুপ্ত পলাইয়া যান। অপর দুইজন সম্বন্ধে পরে অনেক কথা বলিবার আছে। দীনেশ ডালহৌসী স্কোয়ারে টেগার্টের উপর বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিল আর শচীন করগুপ্ত ছিল মেছুয়া বাজার ষড়যন্ত্র মোকদ্দার আসামী। যাহাহউক সুশীল পলাতক অবস্থায়ও দল সংগঠন করিতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু পুলিস সন্ধান পাইয়া তাহাকে কলিকাতায় ধরিয়া ফেলে। এবার হইল সুশীলের দ্বীপান্তর বাসের আদেশ। যথা সময়ে সুশীল আসিয়া আন্দামানে উপস্থিত হইল।

কিছুদিন যায়, জেলের অত্যাচার ক্রমে অসহনীয় হইয়া উঠিল। অতঃপর সুশীল এবং তাহার সঙ্গীগণ অনশন ধর্মঘটে প্রবৃত্ত হইল। সকলের আশঙ্কা হইল পাছে আবার যতীনদাসের ইতিহাস পুনরাবৃত্তি হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও গভর্ণমেণ্টকে উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারই মধ্যস্থতায়, গভর্ণমেণ্ট অনাচারের প্রতীকার করিবে প্রতিশ্রুতি দেয়, সঙ্গে সঙ্গে তাহারও অনশন ভঙ্গ করে। ইহার পরে সুশীল প্রভৃতিকে দেশে আনা হয় এবং তাহারা মুক্তিলাভ করে। ইহা ১৯৩৭ সালের কথা। ইহার পরেও সুশীল দুই একবার বন্দী হয় এবং ১৯৪২ সালের "ভারত ছাড়"—প্রস্তাবের পরে মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি ভারতীয় নেতৃবৃন্দ

যখন ধৃত হন, সুশীলও গণ আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়ে। ফলে আবার সুশীল ধৃত হয় এবং আড়াই বৎসরের জন্য অন্তরীণে আবদ্ধ হয়।

১৯৪৫ সালে আবার ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সুশীল এবার মুক্তিলাভ করিয়া গঠন মূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। সে ও অন্যতম কর্ম্মী স্মৃতিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করে। এখন গঠন মূলক কার্য্যই সুশীলের লক্ষ্য হইল।

এবার আসিল সুশীলের শেষ কার্য্য—জীবনের আহুতি। ১৯৪৭, ১৫ই আগষ্ট তারিখে যে ক্ষমতা হস্তান্তর হয়, তাহা সকলেই বিদিত। সেই সময় বড় আশঙ্কা হইয়াছিল ঐ তারিখে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার হইবে। এই আশঙ্কা বিদূরীত হয় মহাত্মাজীর আপ্রাণ চেষ্টায়। তিনি বেলিয়াঘাটার এক পল্লীতে থাকিয়া সকলের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। মহাত্মাজীর অনশন, তাঁহার প্রতি আক্রমণ, মহাত্মাজীর শান্তি প্রচেষ্টা—ঐতিহাসিক ঘটনা। বাঙ্গলা দেশ যে এখন শান্ত, সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানের প্রতি সংখ্যা গরিষ্ঠ সম্প্রদায় যে ভাল ব্যবহার করিতেছে, তাহার মূলে একদিকে যেমন বাঙ্গলার ঐতিহ্য, অন্যদিকে মহাত্মাজীর নিকটেও বাঙ্গলা কম ঋণী নয়।

এই শান্তি বাহিনীর অন্যতম সেবক ছিল সুশীল। সে ও তাহার সহকর্ম্মী স্মৃতীশ বানার্জ্জি ও বীরেশ্বর ঘোষ একটী শোভাযাত্রা লইয়া শান্তি বাণী প্রচার করিতে যাইত। গত ১৭ই ভাদ্র (৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭) প্রচার কার্য্য রত এই সেবকের দল যখন লোয়ার সার্কুলার রোড্ ও পার্ক ষ্টিটের মোড়ে আসিয়াছে, একদল দুর্ব্বৃত্ত তাহাদিগকে আক্রমণ করে। বলাবাহুল্য এই আততায়ীদের মধ্যে মুসলমান কেহ ছিলনা। তিনজন নেতাই আহত হয়। এবং তাহাদিগকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। আঘাত গুরুতর হওয়ায় ২৫সে ভাদ্র ১১ই সেপ্টেম্বর শম্ভুনাথ হাসপাতালে সুশীলের আত্মা কর্ম্মময় দেহ হইতে চির বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়—। পরদিন ২৭ ভাদ্র একটি বিরাট শোভাযাত্রায় সুশীলের দেহ কেওড়াতলা ঘাটে নীত হইয়া অবশেষে পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়।

আমাদের এই বাঙ্গলা দেশ হিন্দুরও মুসলমানেরও, বরাবর এখানে হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি ছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন হিন্দু মুসলমান ঐক্যের ভিত্তিতেই শাসনতন্ত্র রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন। কালস্রোতে সেই বন্ধন ছিন্ন হয়,—গুণ্ডামী, লুণ্ঠন, হানাহানি হত্যায় তাহা রূপান্তরিত হয়। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস আছে বাঙ্গলায় সেই বন্ধন আবার অটুট থাকিবে। সুশীল, স্মৃতীশ, বীরেশ্বর প্রভৃতির আত্মাহুতি দধীচির ত্যাগের ন্যায়ই সেই ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিবে।

মেছুয়াবাজার বিস্ফোরক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা

১৯২৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর নিরঞ্জন সেন, সতীশ পাকড়াশী, রমেশ বিশ্বাস প্রভৃতি কয়েকজন যুবক কতকগুলি বিস্ফোরক পদার্থ সমেত মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলাবাগান বস্তিতে ধৃত হয়। সুধাংশু নামে এক যুবক বোমা ও রিভলভার সহ ঐ বাড়ীতে উপস্থিত হইলে, সেও গ্রেপ্তার হয়। এই যুবকও নাটোর মেল ডাকাতি ষড়যন্ত্রের মধ্যে ছিল। এই মোকদ্দমায় বরিশালের কয়েকজন যুবকও আসামী ছিল, ঢাকারও কয়েকজন ছিল। এখানে তাহারা অভিযানের ষড়যন্ত্র করে।

১৯৩০ এপ্রিল হইতে আলিপুরের জজ মেসার্স সাঙ্কি এবং এন কে বসু ও রায় বাহাদুর সুরেশচন্দ্র সিংহ কমিশনারের কাছে মোকদ্দমা হয়। সাঙ্কি সাহেব চলিয়া গেলে লেথব্রিজ প্রেসিডেণ্ট হন (Mr. H. B. Lethbridge).

নিরঞ্জন সেন ও সতীশ পাকড়াশীর ৭ বৎসর করিয়া দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। রমেশ বিশ্বাসের হয় ৫ বৎসর সশ্রম কারাবাস, সুধাংশুর হয় ৭ বৎসর। সুধাংশুর সুটকেস্ হইতে কাপড়ে জড়ানো একটা বোমার খোল পাওয়া গিয়াছিল।

বরিশালের মুকুল সেন, শচীনকর, জগদীশ চাটার্জ্জিও আসামী ছিল। খুলনার নির্ম্মল দাসও ছিল। এই মোকদ্দমায় ধরণীকান্ত বসু স্বীকারোক্তি করে এবং পরে এপ্রুভার হয়। বিচারে ৯ জন খালাস পায়।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের সাজা হয়

নিরঞ্জন সেন	মুকুলরঞ্জন সেন
সতীশ পাকড়াশি	সুধাংশু মজুমদার
রমেশচন্দ্র বিশ্বাস	বেহারীলাল বিশ্বাস
সুধাংশু দাশগুপ্ত	মহেন্দ্র রায়
নিশাকান্ত রায়চৌধুরী	তারাপদ গুপ্ত
সুধীরকুমার আইচ্	সত্যব্রত সেন
দেবপ্রিয় চাটার্জ্জি	রবীন্দ্রনাথ বসু
শচীন্দ্র করগুপ্ত	সুবোধ চক্রবর্ত্তী

১৯৩০এর ২৬ মে তারিখে ভোলা, নবীন দাশ উকীলের ঘরে একটি বোমা ফাটে দেবেন নামক এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। কান্তি ভূষণ রায় ও অমল দাশগুপ্ত আহত হয়। ১১ জন ধৃত হন।

বিচারে কান্তিভূষণ এপ্রুভার হয়, কিন্তু স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করায় তাহার ২ বৎসর জেল হয়। ১৯সে সেপ্টেম্বর মোকদ্দমার রায় হয়।

ব্রজগোপাল সাহা ও অমল দাসের দুই বৎসর করিয়া জেল হয়।

কামেখ্যা বানার্জ্জি এবং সুবোধ পাল নির্দ্দোষ প্রমাণিত হয়, কিন্তু পরে তাহাদিগকে Bengal Ordinance অনুসারে আটক করা হয়।

মোকদ্দমায় উকীল ছিল পঞ্চানন বসু। তিনিও পিকেটিং অর্ডিনান্স অনুসারে ধৃত হন।

দাসপুরের স্বদেশী আন্দোলন ও দারোগা হত্যা

১৯৩০ সালটি ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের একটি স্মরণীয় বৎসর। লাহোর কংগ্রেসে (১৯২৯) স্বাধীনতা প্রস্তাব গ্রহণের পরেই ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে সর্ব্বত্র জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়। তারপরে আসে মহাত্মাজীর

ইতিহাস প্রসিদ্ধ ডাণ্ডী অভিযান। সেইবারে ১২ই মার্চ্চ সবরমতী আশ্রম হইতে মহাত্মা গান্ধী ৮০ জন সহকর্ম্মীসহ একপোষাকে ব্যাগ ও লাঠিসহ 'বন্দেমাতরম' বলিতে বলিতে রওনা হন। কয়দিন পদব্রজে হাটিয়া সমুদ্রের উপকূলস্থ ডাণ্ডী নামক বন্দরে উপস্থিত হইয়া লবণ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হন। অবশ্য তাঁহারা সকলেই ধৃত হন। এই উপলক্ষ্যে সসাগরা সমস্ত ভারতবর্ষ আইন-অমান্য, স্বদেশী গ্রহণ ও বিলাতী বর্জ্জন আন্দেলনে একেবারে বিকম্পিত হইয়া উঠিল। জেলগুলি সবই পূর্ণ হইয়া গেল। লবণ আইন অমান্যের সঙ্গে নানা ভাবেই লোকে বিলাতী সংস্রব ছাড়িতে থাকে। এই আন্দোলন সহর অপেক্ষা গ্রামাঞ্চলেই বেশী ব্যাপ্ত হইয়াছিল। বাঙ্গলা দেশে মেদিনীপুর, ডায়মণ্ড হারবার, ঢাকা বিক্রমপুর, চব্বিশ পরগণা, খুলনা প্রভৃতি স্থানে আন্দোলনের প্রাবল্য খুব বেশী হইল।

মেদিনীপুরে স্বদেশী আন্দোলন খুব জোর চলিতে থাকে এবং পুলিসের বাড়াবাড়িতে ভয়ানক অনর্থ ঘটিয়া যায়।

ঘাটাল মহকুমার দাসপুর থানার অন্তর্গত চেচুয়া হাটে কয়দিন খুব বিলাতি বর্জ্জন চলিয়াছে। একদিন দফাদার আসিয়া দারোগাকে খবর দিল—

"হুজুর, চেচুয়া হাটে কাল অসংখ্য বিলাতী কাপড় ভস্মীভূত হইবে, স্বদেশী-ওয়ালারা ঠিক করিয়াছে, আপনি চলুন।"

—তাই নাকি? আচ্ছা দেখা যাক্ শ্যালাদের বাঁধিয়া আনিব—

এই বলিয়া ভোলানাথ ঘোষ দারোগা, অনিরুদ্ধ সামন্ত সহকারী দারোগা এবং কতিপয় কনেষ্টবল সহ সেখানে গিয়া উপস্থিত হয়।

সেদিন ৩রা জুন, হাটের দিন। দারোগা বাবুরা আসিয়া চারিদিক হইতে নেতৃস্থানীয় চারিজন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করিয়া হাটে লইয়া আসে। তন্মধ্যে শীতল ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণ যুবকের কি দুর্ব্বদ্ধি হয়, সে, দারোগা যে বেঞ্চখানায় বসিয়াছিল, সেখানেই বসিয়া পড়ে। আর কথা কি? দারোগাবাবু তাহাকে—"কি তুমি আসামী হয়ে আমাদের সঙ্গে বস্‌তে সাহস কর—" এই কথা বলিয়া গালাগালি দিয়া বেত্রাঘাত করিতে থাকে। ইতিমধ্যেই হাটে

লোকজন অল্প অল্প করিয়া আসিতেছিল, এই খবর পাইয়া চারিদিক হইতে লোকজন সত্রাসে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। হাটবার বলিয়া দারোগাবাবুর সন্দেহ করিবার কোন কারণ হয় নাই।

দারোগাবাবুর কি দুর্ব্বুদ্ধি হইল যে তিনি সেখানে খাইবার জন্য অপেক্ষা করিতে রাজী হইলেন। ধৃতব্যক্তিগণও ভোজন সারিয়া লইয়াছে, আর দারোগা-বাবুও ভোজনান্তে অপর একটি ঘরে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে, ঠিক সেই সময়ে কয়েকশত লোক একত্র হইয়া নেতা ও ব্রাহ্মণের প্রতি দুর্ব্বহার করিবার জন্য পুলিশের লোকদিগকে প্রহার করিতে করিতে উক্ত দারোগা ও সহকারী দারোগাকে ধরিয়া লইয়া যায়। ভোলানাথকে পিটাইতে পিটাইতে একেবারে মারিয়া ফেলে, আর অনিরুদ্ধ ঘোষকে অন্যত্র লইয়া গিয়া মাথাটা কাটিয়া ফেলে। ভোলা নাথকে তারপরে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলে। অনিরুদ্ধের মাথাটা পোড়াইয়া ফেলিয়া দেহ জলে ফেলিয়া দেয়। অতঃপরে কাহারও দেহ আর সনাক্ত করিবার কোন উপায় রহিলনা।

সংবাদ পাইয়া ঘাটালের মহকুমা হাকিম ফজলুল করিম, পুলিস প্রহরী সহ তদন্ত করিবার জন্য রওনা হন। ৭ই জুন তাঁহারা কংসাবতী নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হন। অপর তীরে পোনর ষোল হাজার লোক সমবেত হয়। তাহারা তদন্ত করিতে নিষেধ করিয়া চলিয়া যাইতে বলে। হাকিম তখন বন্দুক হাতে লইলেন এবং গুলি করিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন। পুলিসের ডেপুটী সুপারিণ্টেডেণ্ট বিচক্ষণ লোক, গুলি করিতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন—

"হুজুর গুলি করিবেন না, গুলি করিলে এই উত্তেজিত জনসঙ্ঘকে থামানো অসম্ভব হইবে।" হাকিম শুনিলেন না—গুলি চলিল। এই ভাবে এক এক করিয়া চতুর্দ্দশটি শহীদ ধরাশায়ী হইল। এই চতুর্দ্দশটী শহীদ শিক্ষিত যুবক নহে চাষা, মুটে মজুর, মধ্য বিত্ত বা স্কুলের ছাত্র। ইহাদের শোণিতে পুণ্য কংসারতীর তীর রঞ্জিত হইয়া গেল—

"মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়
রঞ্জিত করি কাগার তীর
দেশের জন্য ঢালিল রক্ত
অযুত যাহার ভক্তবীর—"

অতঃপর চারিদিক হইতে পুলিস আসিতে লাগিল—অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা হইল। চেচুয়া হাটের চারিমাইলের মধ্যে আর কোন লোক রহিলনা—কেহ মরিল, কেহ ঘর ছাড়িয়া পলাইল, কেহ অসুখে ভুগিয়া ভুগিয়া পঞ্চত্ব লাভ করিল।

ইহার পরে ইন্‌স্পেক্টার জেনারেল লোম্যান সাহেব একজন বিচক্ষণ ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্টেকে পাঠাইয়া দেয়। পেডিসাহেব তখন জিলার মাজিষ্টের। সে পুলিসের জুলুমে ক্ষুব্ধ সন্ত্রস্ত গ্রামগুলি জনশূন্য হওয়ায় ব্যথিত হইয়াছে, কিন্তু থামাইবার জন্যও চেষ্টা করে নাই। ন্যায়পরায়ণ বলিয়া পেডি সাহেবের বেশ সুনাম ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে আগত সিভিলিয়ান একটি সম্প্রদায় বিশেষ, এখানে ভারতীয়দের সঙ্গে ব্যবহারে ব্যক্তিত্ব বলিয়া কোন কথা ছিল না। তাহাদের সংস্পর্শে ভারতীয়গণও শাসনকে সেবা ধর্ম্মের ভাবে নিতে পারেন নাই। যখন সম্পূর্ণ সেইভাব আসিবে তখন তাহাদের দোষ অন্তর্হিত হইবে। ভগবান করুন শীঘ্রই সেই দিন সমাগত হোক।

অতঃপরে ৩রা জুন তারিখের ব্যাপারের জন্য মেদিনীপুরের স্পেসাল ট্রাই-বুন্যালে বিচার হয়। ২৪ পরগণার এডিসন্যাল জজ মিঃ লেথ্‌ব্রিজ, রায় বাহাদুর সুরেশচন্দ্র সিংহ ও মহেন্দ্রনাথ দাসকে লইয়া ট্রাইবুন্যাল গঠিত হয়। তাহাতে মুনীন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ভুতনাথ মান্না, শীতল ভট্টাচার্য্য, কালীপদ সামন্ত, জীবন পতি, ব্রজ ভূঁইয়া, অনন্ত হাজরা, কালাচাঁদ ঘাটি, সুরেশ বাগ, যোগেন হাজরা, বিনোদ বেগ ও পার্ব্বতী তুলা—এই ১২ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়, পাঁচজনের দুই বৎসর করিয়া করিয়া সাজা হয়। ৯ জনকে খালাস দেওয়া হয়। আর ৭ জনকে পূর্ব্বের প্রমাণের অল্পতার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল।

মৃত ব্যক্তিদ্বয়কে চেচুয়া হাটে মারিয়া ফেলিয়াছে, কি আহত হইবার পরে

অন্য লোক তাহাদিগকে খুন করিয়াছে, প্রথমে যাহারা ধরিয়া লইয়া যায় তাহাদের উদ্দেশ্য খুন করা না হইতেও পারে, ইত্যাদি বিষয় ভাবিয়া হাকিমগণ যে কাহাকেও ফাঁসির হুকুম দেন নাই, ইহাতে তাঁহাদের বিচার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে হয়।

হাইকোর্ট চীফ জষ্টিস ও মিঃ জাষ্টিস চারুচন্দ্র ঘোষের কাছে আপিলের বিচার হয়, তবে কোন ফল হয় না।

এই ঘটনার কয়েক মাস পরে মেদিনীপুরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পেডিকে হত্যা করা হয়। অজুহাত ছিল ইহার সময়ে বন্দীদের উপর অত্যাচার হইয়াছিল। ইনি মেদিনীপুরে কলেজিয়েট স্কুলের শিল্পপ্রদর্শনীতে সভাপাতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে কে তাহাকে গুলি করিয়া পলাইয়া গেল, কেহ তাহাকে ধরিতে বা চিনিতে পারেন নাই। ইনি দৌড়াইয়া পার্শ্বের ঘরে যান এবং সেখানে পড়িয়া যান। ক্রমে তাঁহার প্রাণবায়ু বিনির্গত হয়।

এই ঘটনা হয় ১৯৩১, ৭ই ফেব্রুয়ারী।

সরিষাবাড়ী ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা

ইণ্টালি, ১৬ নম্বর গোপলেনে বিনোদবিহারী রায় নামে জনৈক ভদ্রলোক, স্ত্রী শৈলবালা, পুত্র শিশির, কন্যা স্মৃতিকণাকে নিয়া বাস করিতেন। আত্মীয় অবনীরঞ্জন ঘোষ এবং সুনির্ম্মল সেনও সেখানে আসিত। ১৯৩০, ৭ আগষ্ট অবনী তাহার আত্মীয়া মনোরমা ঘোষের সঙ্গে শিশিরকে ময়মনসিংহ পাঠাইয়া দেয়। ময়মনসিংহে মনোরমার মাতুল ৺অশ্বিনী ঘোষ মোক্তারী করিতেন। তারক কর নামক অন্য একটি ছেলেও শিশিরের সঙ্গী হয়। একটি ট্রাঙ্কে নাইট্রিক ও সালফিউরিক এসিডের ৭টি বোতল ও প্যাকেটে অন্যান্য কতকগুলি জিনিষ দিয়া মনোরমাকে স্ত্রীলোকদের কামরাতে দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য যে ময়মনসিংহে বোমা বা অপর বিস্ফোরক পদার্থ প্রস্তুত হইবে। গোয়েন্দা বিভাগ, গোপলেনের বাড়ীতে

যে বিপ্লবী যুবকরা সমবেত হয়, এই খবর রাখিত। তাহারা পূর্ব্বেই ময়মনসিংহের সরিষাবাড়ী থানায় খবর পাঠাইয়া দেয়।

৮ই, ষ্টীমার জগন্নাথগঞ্জ ঘাটে পৌছিলে পরে মনোরমা, শিশির ও তারককে পথে ধরিয়া সরিষাবাড়ী থানায লইয়া যাওয়া হয়। এদিকে অবনী ঘোষ, সুনির্ম্মল সেন, ক্ষিতীশ ও অনিলকৃষ্ণ বসুকেও কলিকাতায় ধরা হয়।

এই মোকদ্দমা ১৯৩০এর অক্টোবর মাসে আলিপুরে এক স্পেশাল ট্রাইবুন্যালে বিচার হয়। মিঃ গার্লিক, রায় বাহাদুর নলিনীকান্ত বসু ও শ্রীলালবিহারী দাস সহ ট্রাইবুন্যাল গঠিত হয়। রায় বাহির হয ২রা নভেম্বর (১৯৩০)। সুনির্ম্মল, অবনী ও ক্ষিতিশের ৫ বৎসর করিয়া জেল হয়। তারক ও শিশিরের হয় ৩ বৎসর করিয়া। অনিলকৃষ্ণ বসু মুক্তিলাভ করিলেও তাহাকে অর্ডিনান্সের বলে আটক রাখা হয।

এই মোকদ্দমার আপিল হয় হাইকোর্টে। প্রধান বিচারপতি রাঙ্কিন, মিঃ পিয়ারসন ও মিঃ জাষ্টিস মল্লিকের রায়ে পূর্ব্ব দণ্ডই বহাল থাকে। ট্রাইবুন্যালে লেখকই এড্‌ভোকেট ছিল, হাইকোর্টেও লেখক সুনির্ম্মল, অবনী ও ক্ষিতীশদের পক্ষ্য সমর্থন করে। শ্রীসুরেশ তালুকদার দাঁড়ান তারকের পক্ষে।

ড্যালহৌসী স্কোয়ার বোমা ষড়যন্ত্র

১৯২৯ এর শেষ দিক হইতেই ইউরোপীয় এবং ভারতীয পুলিসের বড় কর্ত্তাদের হত্যা করিবার জন্য একটী ষড়যন্ত্র হয়।

১৯৩০ এর ২৫সে আগষ্ট সোমবার অনুমান ১১টা ১৫ মিনিটের সময়, গোয়েন্দা বিভাগের অধ্যক্ষ টেগার্ট সাহেব যখন কীড ষ্ট্রীট হইতে ওলড্‌কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট্ হইয়া লালবাজার পুলিস অফিসের দিকে আসিতেছিল, ড্যালহৌসী স্কোয়ারের পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে পূর্ব্ব হইতে একখানি মোটরে দীনেশচন্দ্র মজুমদার ও অনুজ সেনগুপ্ত এবং আরও একটি যুবক বোমা লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। উদ্দেশ্য তাহাকে বোমা মারিয়া হত্যা করিবে। টেগার্টের গাড়িতে তাহারা বোমা নিক্ষেপ

করে, কিন্তু টেগার্ট সাহেব বাঁচিয়া যায়। দীনেশের বাড়ী বসিরহাট, বয়স ২২ বৎসর, অনুজের বাড়ী খুলনা জিলার সেনহাটি গ্রামে। সে কার্ব্বলা ট্যাঙ্ক লেনে থাকিত। দীনেশ থাকিত ১৩৬।৩বি কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে। দীনেশ ও অনুজ পশ্চিম দিকে দৌড়াইয়া যায়। দীনেশ হেয়ার ষ্ট্রীটে ধরা পড়ে, অনুজ আত্মহত্যা করে, তাহার গায়ে একটী ওয়াটার প্রুফ ছিল। তৃতীয় ব্যক্তি পোষ্টাফিসের দিকে দৌড়াইয়া যায়, তাহাকে ধরা যায় না।

দীনেশের কাছে একটী তাজা বোমা, রিভলভার ও কিছু গুলি পাওয়া যায়। অনুজের কাছে দুইটি বোমা ও একটী রিভলভার পাওয়া যায়। এই রিভলভার দুইটি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের রিভলভার বলিয়া প্রমাণিত হয়। বোমাগুলির খোল ছিল এলুমিনিয়মের।

স্পেসাল ট্রাইবুন্যালের বিচারে ১৮ই সেপ্টেম্বর (১৯৩০) দীনেশ মজুমদারের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়।

পুলিস এই হত্যাচেষ্টার পরে অনেক বাড়ী ঘর তল্লাস করে, এবং ঐ তারিখেই ৭ নম্বর কৈলাসবসু ষ্ট্রীটে নারায়ণ রায়, এম বি ডাক্তারের (ডাক্তার ক্ষেত্রনাথ রায়ের পুত্র) বাড়ী খানা তল্লাস করে। এই সম্পর্কে পুলিস ভূপাল বসু, এম বি (বিক্রমপুর বহর নিবাসী, কামিনী বসুর পুত্র), বকুল বাগানের নীলাদ্রি চক্রবর্ত্তী (শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তীর পুত্র) ৮ নম্বর লালমাধব মুখার্জ্জির লেন, সুরেন্দ্র দত্তের বাসা, ৭।১ ভীমঘোষ লেন প্রভৃতি অনেক স্থান ১০।১৫ দিনের মধ্যে খানা-তল্লাস করে, এবং কয়েকজন লোককে গ্রেপ্তার করে। সুরেন্দ্র দত্তের বাসা তল্লাসের সময় এলিউমিনিয়াম, গান কটন, রাসায়নিক দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। উহা বিনয় রায় নামে এক ব্যক্তি তরকারীর মধ্যে লুকাইয়া একটী পুঁটলীতে করিয়া লইয়া আসে। তাহাতে ৮টি এলুমিনিয়াম খোসা shell পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে কয়েকটি মহিলা, শোভারাণী দত্ত, শৈলরাণী দত্ত, কমলা দাশগুপ্তা প্রভৃতিকে ধরা হয়। তবে তাহা-দিগের বিরুদ্ধে কোনরূপ অভিযোগ উপস্থিত করা হয় না। শোভারাণী দত্ত, শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দত্তের কনিষ্ঠা কন্যা, কমলা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির

মহিলা বিভাগের সম্পাদিকা, শৈলরাণী সুরেন্দ্র বাবুর স্ত্রী। শ্রীনারায়ণ রায়, ভূপাল বসু, অম্বিকারায় (গরিফার প্রফুল্ল রায়ের পুত্র) অদ্বৈত দত্ত, রসিকলাল দাস, যতীশ ভৌমিক (শ্রী সরস্বতী প্রেস), সুরেন্দ্র দত্ত (বানরী পাড়ার গোপাল দত্তের পুত্র) রোহিণী অধিকারী প্রভৃতি অভিযুক্ত হন। ইঁহারা অধিকাংশই যুগান্তর দলের সভ্য ছিলেন বলিয়া মনে হয়।

১৯৩০ এর নভেম্বর মাসে আলিপুর ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে ট্রাইবুন্যালের বিচার আরম্ভ হয়। বিচারক হয়েন **H. C. Stork** (ষ্টর্ক) বাবু আশুতোষ ঘোষ, ও মোঃ আদিলজ্জমান চৌধুরী।

প্রমাণে বাহির হয়, ভূপাল বসু, নীলাদ্রির কাছে ফরমাস দিয়া এলুমিনিয়ামের খোল তৈয়ার করিত। নারায়ণ রায়ের বাড়ীতে **T. N. T** (তয়স্তিকা), গান কটন প্রভৃতি বিস্ফোরক পদার্থ তৈয়ার হইত। তাহার ওখানেই রাসায়নিক দ্রব্যাদি কিনিয়া আনা হইত। রোহিণী খোল নিয়া সুরেন্দ্রের লালমাধব মুখার্জ্জির লেনে যাইত। সেখানেই বোমার খোলের ভিতরে বিস্ফোরক পদার্থ পুরিয়া বোমা তৈরী হইত। নীলাদ্রি চক্রবর্ত্তীকে আসামী শ্রেণী হইতে সরাইয়া সাক্ষী করা হয়। তবে আসামী ছিলনা বলিয়া তাহাকে এপ্রুভার বলা চলে না। নারায়ণ রায়ের একটী **Bacteriological Institute,** পি ২১ মাণিকতলা স্পার (বর্ত্তমান বিবেকানন্দ রোড) এ ছিল, উহা এখনও বর্ত্তমান আছে। সেখানে উক্ত ২৫শে আগষ্ট তারিখেই কতকগুলি এসিড্ পাওয়া যায়। তবে বিশেষ প্রয়োজনীয় এই যে নারায়ণ রায় ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে পুলিসকে নিয়া **Test tubes, B. tubes, Gun Cotton, Fulminate of Mercury** দেখায় এবং একটি বিবৃতিতে স্বীকার করে যে বিস্ফোরক পদার্থ-তৈয়ারীর জন্য এইগুলি ব্যবহৃত হইত। সুরেন্দ্রদত্ত একটি স্বীকারোক্তি করিয়া কতকগুলি কেনেস্ত্রা দেখায় ও একটিতে কতকগুলি কাগজে মোড়া তাজা বোমা দেখায়। একটী সুটকেসে বোমা, গানকটন, **T. N. T** কার্ত্তুজও পাওয়া যায়। যতীশের ঘরে অনুরূপ একটি কার্ত্তুজ পাওয়া যায়। এই সব কার্ত্তুজ দীনেশ মজুমদারের ব্যবহৃত কার্ত্তুজেরই

অনুরূপ ছিল। এই মোকদ্দমায় ট্রাইবুন্যাল কয়জনকেই কঠোর শাস্তি দেয়। কিন্তু হাইকোর্টে আপিল হইলে প্রধান বিচারপতি রাঙ্কিন, পিয়ারসন ও শরৎকুমার ঘোষ ১৯৩১ সালের ২৭ জুলাই নিম্নলিখিত শাস্তি প্রদান করেন—

নারায়ণ রায় ও ভূপাল বসু—১৫ বৎসরের দ্বীপান্তর, সুরেন্দ্র দত্ত—১২ বৎসরের দ্বীপান্তরসহ কারাদণ্ড, রোহিণীর ৫ বৎসরে কঠোর পরিশ্রমসহ কারাবাস, যতীশ ভৌমিক ২ বৎসর কঠোর পরিশ্রম। অম্বিকা রায়, রসিকলাল দাস ও অদ্বৈত খালাস পায়। শরৎ দত্ত এবং অতুল গাঙ্গুলীকে ট্রাইবুন্যালই খালাস দিয়াছিল।

এই মোকদ্দমায় সিতাংশু সরকার এবং ব্রজদুলাল সেন এই দুইজনই এপ্রুভার হইয়াছিল।

কার্তুজের অভিন্নতা, এলুমিনিয়মের খোলের সমতা প্রভৃতি কারণে ড্যালহৌসী স্কোয়ার ঘটনার সহিত সংশ্রব থাকায় এই মোকদ্দমা 'ডালহৌসি স্কোয়ার বোমা ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা' নামেই অভিহিত হইত। জেল হাজতে, নারায়ণ রায়, ভূপাল বসু প্রভৃতির উপর অমানুষিক অত্যাচার ও পীড়ন হয়।

দীনেশের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হওয়ার পরে সে মেদিনীপুর জেলে ছিল। সেখান হইতে সে পলাইয়া যায়। নলিনীদাস এবং জগদানন্দ মুখার্জ্জিও হিজলী বন্দীনিবাসে কারাভোগ করিতেছিল। ইহারাও পলাইয়া যায়।

অনুমান জুন ১৯৩৩, পুলিস কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের চিত্রা সিনেমার সম্মুখের একটা বাড়ী ঘেরাও করে। উভয় দলে কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত সংঘর্ষ হয়। অতঃপর তিনজনই ধরা পড়ে। দীনেশের ফাঁসির আদেশ হয়, নলিনী দাস এবং জগদানন্দের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়।

পুলিশের আই, জি, লোমান হত্যা

১৯৩০—২৯ আগষ্ট বাঙ্গালার পুলিশ বিভাগের বড় কর্ত্তা এফ, জে, লোম্যান এবং ঢাকার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ই, হড্‌সনকে গুলি করা হয়।

নারাণগঞ্জের জল-পুলিশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ বার্ট (H. A. S. Burt) পূর্ব্ব রাত্রিতে ঢাকার গভর্ণমেণ্ট হাউসে মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যায়: তাহাকে সেই

রাত্রেই মিটফোর্ড হস্‌পিট্যালে লইয়া যাওয়া হয়। পরের দিন সকালে (২৯শে শুক্রবার) উক্ত লোমান সাহেব, হড্‌সনকে সঙ্গে লইয়া তাহাকে দেখিতে যায়। দেখিবার পরে যখন তাহারা আফিসের, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট যাইতেছিল সেই সময় ৩০।৩৫ হাত দূর হইতে প্রথমে হড্‌সনকে ও পরে লোমানকে গুলিকরা হয়। হড্‌সনের পাছায় গুলির আঘাত লাগে কিন্তু লোম্যানের মেরুদণ্ড ভেদ করিয়া গুলি চলিয়া যায়। সত্যেন্দ্র সেন নামে একজন কণ্ট্রাক্টর সেখানে দাঁড়াইয়াছিল ও রাজমিস্ত্রীরা কাজ করিতেছিল। আততায়ী গুলি করিয়া দৌড়ায়, মিস্ত্রীদিগকে উহার অনুসরণ করিতে বলা হয়। কিন্তু তাহারা উত্তর করে—"পয়মাল চল্‌ছে, ওরে ধরবে কে—আমরা পারুম না।"

সত্যেন্দ্র কতকদূর দৌড়াইয়া গেল। কিন্তু কেহই আততায়ীকে ধরিতে পারিল না। আক্রমণকারী যাইবার সময় একটি রিভলভার ফেলিয়া যায়।

সকলে মনে করিল—ইনি আর কেউ নন্—বিনয় বসু। বিনয় বসু মেডিকেল স্কুলের ফোর্থ ইয়ার ক্লাসে পড়িত।

১লা সেপ্টেম্বর লোম্যান সাহেবের প্রাণবায়ু বিনির্গত হইয়া গেল।

ইহার পরে ঢাকার সহরে নানাস্থানে খানাতল্লাস, ধর পাকড় ও মারধর অবাধ ভাবে চলে। দুদিনের মধ্যেই অর্দ্ধশতাধিক লোক আহত অবস্থায় মিট্‌ফোর্ড হাসপাতালে নীত হইল। অনেক নির্দ্দোষী লোক ধৃত ও প্রহৃত হইল। কিন্তু বিনয়কে কেহই খুঁজিয়া পাইল না।

৩রা সেপ্টেম্বর, বিনয় বসুকে ধরাইয়া দিলে পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হয়। পরিচয় দেওয়া হয় বয়স ২২, **Fair complexion, strong build, short stature, round face, pointed nose, normal eyes hair black, ordinary cut.**

ইহার পরে ১৯৩০ এর ৮ই ডিসেম্বর তারিখে সাহেবের পোষাক পরিহিত তিনটি বাঙ্গালী যুবক বেলা সাড়ে বারটার সময় রাইটারস্ বিল্ডিংএর উপরে উঠিয়া যায়। তাহাদের মাথায় টুপি ছিল, তাহাদের রংও বেশ পরিষ্কার। তাহাদিগকে বিলাতী

সাহেব, অন্ততঃ এংলো ইণ্ডিয়ান মনে করিয়া কেহ কিছু বলে নাই বা বাধাও দেয় নাই। ফোর্ড নামক জনৈক সার্জেণ্ট, মেডিকেল বোর্ড কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হওয়ার জন্য দ্বিতলের বারান্দায় অপেক্ষা করিতেছিল। তাহারই দৃষ্টি কেবল ইহাদের প্রতি আকর্ষিত হয়।

বাঙ্গালার জেল সমূহের প্রধান কর্ত্তা (Inspector General of Prisons) কর্ণেল সিমসন তখন টেবিলে বসিয়া কাজ করিতেছিল, এবং তাহার ব্যক্তিগত সহকারী তাহাকে কাগজপত্র দেখাইয়া অর্ডার (আদেশ) গুলি লিখাইয়া লইতেছিল। সিমসনের ঘরে ঢুকিয়াই যুবকরা তাহাকে গুলি করে। তাহার হাতের কলম হাতেই রহিয়া গেল। অর্ডারটিও অসমাপ্ত রহিল, কর্ণেল টেবিলে ঢলিয়া পড়িল। অতঃপরে তাহারা বারান্দায় আসিয়া চারিদিকে গুলিবর্ষণ করিতে লাগিল। কৃষি ও গ্রামবিভাগের সেক্রেটারী তাহাদের দিকে লক্ষ্য করিয়া কি একটা ছুড়িয়া দেয়। কিন্তু উহা তাহাদের গায়ে লাগে না। তাহারাই উক্ত সাহেবকে গুলি করে, সে পড়িয়া যায়। অতঃপর তাহারা হোম সেক্রেটারী আলবিয়ন মারের ঘরের দিকে আসিয়া চীৎকার করিয়া বলে—

"মার্ সাহেব টেবিল পর হ্যায" ? তাহাদের গুলিতে মার্ সাহেবের ঘরের দরজার কাচ ভাঙ্গিয়া যায়। পুলিসের ইনস্পেকটার জেনারেল ক্রেগ সাহেব রিভলবার লইয়া বাহির হইয়া গুলি ছুড়ে, কিন্তু উহা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ফোর্ড আসিয়া ক্রেগের হাতের রিভলভার লইয়া গুলি ছুঁড়িতে থাকে কিন্তু তাহাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। আসিণ্টাণ্ট ইনসপেক্টার জেনারেল জোনস্ সাহেব আসিযা ৩।৪ বার গুলি ছুড়ে কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হয না।

অতঃপর ইহারা পাসপোর্ট আফিসে প্রবেশ করিযা রিভালভারে গুলি ভরিয়া লয়। সেখানকার কেরাণী K. C Bhattacharjee ভিতরের ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া দেয়।

একজন মিশনারি সাহেব সেখানে বসিয়া আলাপ করিতেছিল। ভয়ে সে একটা বৃষ্টির জলের নল বাহিয়া নীচে নামিয়া যায়। জুডিসিয়াল সেক্রেটারী

মিঃ নেলসন তাহার দরজার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া উঁকি মারিতেই যুবকরা তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া তাহাকে গুলি করে। তাহার জানুতে লাগে এবং ঘরের মধ্যেও কয়েকটি গুলি মারা হয়। রক্তাক্ত দেহে কাতর শব্দ করিতে করিতে নেলসন সাহেব বাহিরে আসে ও প্রেনটিস সাহেবের ঘরে আশ্রয় লয়। জোনস ও নেলসনের দেহরক্ষী পুলিস যুবকদিগকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়ে, প্রত্যুত্তরে তাহারাও গুলি ছুড়ে। শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তা ষ্টেপলটন সাহেব অবিলম্বে তেতলা হইতে লালবাজার থানায় ফোন করিয়া দেয়। ফলে সেখান হইতে টেগার্টসাহেব, গর্ডন, বার্ট প্রভৃতি অবিলম্বে ঘটনাস্থানে আসিয়া পড়ে।

ফোর্ড হামাগুড়ি দিয়া নীচ হইতে দেখিতে পাইল ঘরের মধ্যে দুইজন শুইয়া রহিয়াছে। আর চেয়ারে একজন বসিয়া রহিয়াছে। টেবিলের উপরে দুইটি রিভালভার ও কতকগুলি কার্ত্তুজ রহিয়াছে। চেয়ারে উপবিষ্ট ব্যক্তি পটাসিয়াম সাইনাইড খাইয়াছে, তাহার মাথা চেয়ারে হেলান রহিয়াছে। এবং অল্প সময় মধ্যেই সে পঞ্চত্ব পাইল। এই যুবকের নাম ছিল সুধীর গুপ্ত, পিতা অবনী মোহন গুপ্ত, বাড়ী বিদগাঁও। দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম ছিল দীনেশ গুপ্ত, পিতার নাম সতীশচন্দ্র গুপ্ত, বাড়ী যশোলঙ্গ।

তৃতীয় ব্যক্তির নাম ছিল বিনয় বসু, পিতার নাম রেবতী মোহন বসু, জামসেদপুরে থাকিতেন, বাড়ী রাউতভোগ। তিনজনই ঢাকা বিক্রমপুরের।

দীনেশের বামদিগের গলায় একটি গুলির আঘাত-চিহ্ন রহিয়াছে, মনে হইল সে আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার পার্শ্বে একটি ছয়নলা রিভালভার ছিল। বিনয় বোসের কপালের দুইদিকেই গুলির আঘাত চিহ্ন রহিয়াছে।

পুলিশ অফিসার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে একমাত্র বিনয়ই বলিল—

"আমার নাম বিনয় বসু, উহার (সুধীরের প্রতি দেখাইয়া) নাম সুপতি রায়, আর আমার পার্শ্বে যে রহিয়াছে তাহার নাম বীরেন ঘোষ (দীনেশ গুপ্ত)

বিনয়ের পকেটে একটা বড় রিভালভার ও কয়েকটি তাজা গুলি ছিল আর সুধীরের পকেটে ছিল একটি ছোট ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা।

দীনেশকে জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর করে—"আমার পিতা সতীশচন্দ্র গুপ্ত জামালপুরের পোষ্টমাষ্টার, আমি তাঁর তৃতীয় পুত্র। আমি চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতাম। গত লবন আইন অমান্যের সময়ে জুলাই মাসে পড়া ছাড়িয়া দিই। আমার জ্যেষ্ঠ যতীশ গুপ্ত মেদিনীপুরের উকীল, দ্বিতীয় ভাই ডিব্রুগড় মুরিয়ানীর ডাক্তার।"

ক্রমে দীনেশ সুস্থ হইয়া উঠিল আর বিনয় ১৩ই ডিসেম্বর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেল। অন্তিমকালে মাতা প্রিয় পুত্রের সহিত দেখা করিতে গেলেন, বিনয় কোন প্রকারে দুখানি হাত তুলিয়া কপালে স্পর্শ করিয়া মাকে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া চক্ষু মুদিত করে।

দীনেশের বিচার হয় মেসার্স গার্লিক, এন কে বসু ও আদিলজ্জমানের ট্রাইবুন্যালে। বিচারে দীনেশের ফাঁসির আদেশ হয়। হাইকোর্টের আপিল শুনেন বিচারপতি চারুচন্দ্র ঘোষ ও মিঃ বাকল্যাণ্ড, কিন্তু কোন ফল হয় না. প্রিভি কাউন্সিলেও আপিল করিয়া কোন ফলোদয় হইল না।

৭ই জুলাই (১৯৩১) আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে দীনেশের ফাঁসী হইয়া যায়। সেইদিন মধ্য কলিকাতায় হরতাল হয়। অকটারলনী মনুমেণ্টের পাদদেশে একটি বৃহৎ সভা হয় ও দীনেশের আত্মার উদ্দেশে প্রার্থনা করা হয়। বৈকালে একটি শোভাযাত্রা কাল পতাকা ও পোষ্টার বহন করিয়া চৌরঙ্গীরোড, ভবানীপুর, হাজরারোড্ হইয়া সেণ্ট্রাল জেলের ফটক পর্য্যন্ত যায়।

৮ই জুলাই, ১৯৩১ কলিকাতা কর্পোরেসনের সভায় একটি প্রস্তাবে দীনেশের আদর্শের জন্য আনন্দ প্রকাশ করা হয়, প্রস্তাবটি এই :—

"The Corporation expresses its sense of grief at the execution of Dinesh, who lost his life in the pursuit of his ideal."

অন্য এক প্রস্তাবে কর্পোরেসন সভা মুলতবী করা হয়। (**Corporation adjourns until Friday, owing to the execution of Dinesh Gupta**)

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তখন কলিকাতা কর্পোরেসনের মেয়র। তিনি দীনেশের ফাঁসীর সম্বন্ধে যে মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা দেন, নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল—

"We have all heard of the execution of Dineshchandra Gupta. As a matter of personal conviction, as a matter of policy followed by the Congress, one does not accept the method adopted by him at the pursuit of his ideal.

But at the same time, we can not but show our respect and pay our homage at the courage and devotion however misdirected it might have been, which he showed.

As appeal Judge Mr. Buckland said in his finding that he felt that this young man was not actuated by any sense of self interest or personal hate. As a matter of fact Mr. Justice Buck land was simply recording the verdict of history.

We have read instances in history, where the perpetrators of acts like those in one generation having been punished for them have been acclaimed as martyrs by the next generation. Therefore let us pay our respect to the courage and devotion shown by this young man in the pursuit of his ideal."

প্রস্তাবটির সংক্ষিপ্ত অনুবাদ—"আমরা সকলেই দীনেশগুপ্তের ফাঁসির বিষয় অবগত আছি। ব্যক্তিগত মতবাদ এবং কংগ্রেসের অনুসৃত নীতির ফলে আমরা, দীনেশ, স্বীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছে উহা সমর্থন করিতে পারি না। কিন্তু বিপথগামী হইলেও, আমরা তাহার নিষ্ঠা, সাহস, ও আত্মত্যাগের অকুণ্ঠ প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না।

বিচারপতি বাকলাণ্ড তাহার রায়ে বলিয়াছেন, "আমি বুঝিতে পারিয়াছি, এই কার্য্যের পশ্চাতে যুবকের কাহারও প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বা নিজ স্বার্থ সিদ্ধির কোনরূপ প্রেরণা ছিল না"।

এই উক্তি দ্বারা বিচারপতি বাকলাণ্ড চিরন্তন ঐতিহাসিক সত্যেরই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন।

"আমরা ইতিহাস পাঠে অবগত আছি, কোন এক যুগ এইরূপ কার্য্যের জন্য যাহাদিগকে চরম দণ্ড দিয়াছে—অন্যযুগ তাহাদিগকেই শহীদের মর্য্যাদা দান করিয়াছে।

"অতএব, আসুন, আদর্শের জন্য এই যুবকের আত্মত্যাগ, সাহস ও একাগ্রতার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।"

৺মদন মোহন বর্ম্মন প্রস্তাবটি উপস্থাপিত করেন এবং শ্রীইন্দ্রবিদ সমর্থন করেন, স্বর্গত ডাক্তার যতীন্দ্র নাথ মৈত্র অনুমোদন করেন।

হিজলীর হত্যাকাণ্ড

হিজলীর হত্যাকাণ্ড বিপ্লব ইতিহাসের এক মর্ম্মন্তুদ ঘটনা আর এই হত্যাসাধন হয় কতিপয় নরপশু পুলিস হেড্‌কনেষ্টবল ও কনেষ্টবল দ্বারা। কিন্তু এই সকল অশিক্ষিত পুলিশ জানিত, রাজবন্দীদের নির্য্যাতন করিবার তাহাদের ক্ষমতা ছিল অসীম, আর এ কার্য্যের জন্য কেহ তাহাদের কৈফিয়ৎ পর্য্যন্ত চাহিবে না।

হিজলী বন্দী নিবাসে প্রায় ছয়শত রাজনৈতিক বন্দী ছিল। ইহাদের সকলকেই বিনা বিচারে অন্তরীণাবদ্ধ করা হইয়াছিল। হিজলী, মেদিনীপুর জিলায়, খড়গপুর রেলষ্টেশন হইতে প্রায় দেড়মাইল পূর্ব্ব দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। এক সময়ে স্থানটি জিলার সদরে পরিণত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল, তাই অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর বাড়ী তৈয়ার হইয়াছিল। ইহার কয়েকটি বৃহদাকার বাড়ীতে প্রায় ছয়শত রাজবন্দীকে একত্র রাখা হয়। স্থানটি স্বাস্থ্যকর এবং প্রত্যেক বন্দীই দৈনিক খোরাকের জন্য একটাকা দশ আনা করিয়া পাইত। যে দিনের কথা বলিতেছি সে সময় প্রায় আড়াই শত কয়েদী সেখানে ছিল।

বন্দীরা কাপড় চোপড়ের জন্যও আলাদা টাকা পাইত। কিন্তু ইহারা সকলেই বাড়ী ঘর ছাড়িয়া আটক রহিয়াছে। সেখানে যতই গল্পগুজবে ভোজে বা আমোদে সাময়িক তৃপ্তিলাভ করুক না কেন, যখনই মনে হইত

ঐ প্রাচীরের চতুপার্শ্বের বাহিরে যাওয়ার তাহাদের সাধ্য নাই, বাড়ীতে আত্মীয় স্বজনের কি হইতেছে, তাহাদের দেখিবার কোন উপায় নাই, তাহাদের স্বাধীন মনোবৃত্তি প্রতি কথায় ও কাজে ব্যাহত হইতেছে, তাহাদের বিদ্রোহী মন আরও বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। নিতান্ত সাধক শ্রেণীর লোক ব্যতীত এমতাবস্থায় কেহই কোন বিষয়েই চিত্ত স্থির রাখিতে পারে না। বিশেষতঃ দোষ গুণের কোনরূপ বিচার হয় নাই, পুলিসের অভিযোগে বা অপর কাহারও স্বীকারোক্তিতেই তাহারা আটক রহিয়াছে, নির্দোষিতা প্রমাণ জন্য তাহাদের নিজেদের কথা প্রকাশ্যভাবে বলিবার সুযোগ তাহারা পায় নাই, একটু ভাবিলে বা একাকী থাকিলেই তাহাদের মন যে বিষাদে পূর্ণ হইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

তাহাদের মনস্তত্ত্ব না বুঝিয়া, তাহাদের সহিত কয়েদীর মত ব্যবহার করিলেই যে অনর্থ ঘটিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। মিঃ বেকার সিভিলিয়ান হইলেও তাহাদের মনোভাব বুঝিতেন। তিনি তাহাদের সঙ্গে বেশ সদ্ভাব রাখিতে সমর্থ হন। কিন্তু কয়েকটি ঘটনায় পূর্ব্বের ভাব বেশীদিন আর বজায় রহিল না।

একটি নিয়ম ছিল, কোন লোক অসুস্থ হইয়া অথবা দুর্ব্বলতা সারিবার জন্য বন্দীনিবাস সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে যাইবে। এই সময় সে দৈনিক খোরাকী খরচ পাইত সোয়াতিন টাকা। দ্বিগুণ খোরাকী খরচ পাওয়া যাইবে বলিয়া অনেকেই হাঁসপাতালে যাইতে চাইত। অবশেষে অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে, এক পক্ষ যেমন সামান্য অজুহাতে হাসপাতালে যাইতে ইচ্ছুক হইত, অন্যপক্ষও অসুস্থাবস্থায়ও রোগীকে হাসপাতালে পাঠাইতে দ্বিধাবোধ করিত। এইটি হইল দ্বন্দ্বের প্রধান বিষয়।

দ্বন্দ্বের দ্বিতীয় বিষয়টা তাহাদের মাসিক খরচের টাকা কমিয়া যাওয়া। তাহারা বাড়াইবার চেষ্টা করিয়া নিরাশ হয়, কিন্তু দ্বন্দ্বের বিশেষ কারণ আলিপুরের জজ নিহত হইবার পরে বন্দীগণ বন্দীনিবাসে আলোক সজ্জা করে। প্রশ্ন করা হইলে

তাহারা উত্তর করে, ডালহৌসী স্কোয়ার বোমা· ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় হাইকোর্টের আপিলে অনেকে মুক্ত হইয়াছে বলিয়া তাহারা আলো দিয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ এইজন্য আপত্তি করায়, তাহারা তাহা মানিয়া লয়।

এইভাবে কয়েকদিন পর্য্যন্ত মন কষাকষি চলিতে থাকে। কিন্তু ইনস্পেক্টার মার্শেলের ব্যবহার অত্যন্ত অপমান সূচক ও বিরক্তিকর হয়। বন্দীগণ আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে সমর্থ রহিল না। অতঃপর হিজলী বন্দী আবাস হইতে ১৫ই সেপ্টেম্বর দীনেশ সেনকে বক্সা বন্দী নিবাসে স্থানান্তরিত করা হয়। ঐ দিন রাত্রিতে দীনেশের বন্ধুবান্ধব তাহাকে সদর দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। প্রহরীরা তাহাদিগকে বাহির হতে ঘরে যাইতে বলে, কিন্তু তাহারা শুনে না। ইহাতে জনৈক প্রহরী কড়াকথা বলিলে উহারা তাহাকে ঠেলিয়া দেয়, সমস্ত সান্ত্রীদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দেয়।

১৬ই সেপ্টেম্বর রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় যাহারা রাত্রিতে কম্পাউণ্ডের মধ্যে বেড়াইতেছিল, তাহাদের সঙ্গে পুনরায় সান্ত্রীদের বচসা হয়। পূর্ব্ব রাত্রির ঘটনার পরে তাহারা একরকম প্রস্তুত হইয়াছিল। সামান্য গোলমাল শুনিয়াই সান্ত্রীরা বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করে। বাহিরের সান্ত্রীরা ময়মনসিংহ বাসী একজন মুসলমান হেড কনেষ্টবলের নেতৃত্বে কম্পাউণ্ডের মধ্যে চীৎকার করিতে থাকে—

"হুকুম মিল গিয়া। শ্যালা লোগ্‌কো মার ডালো"

ইহার পর বেপরোয়াভাবে তাহারা গুলি করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। বহু যুবক তখন ভোজনে নিরত ছিল। কেহ পড়িতেছিল। কেহ গল্প করিতেছিল। সেই নৃশংস বেপরোয়া গুলি নিক্ষেপে শতাধিক লোক আহত হইয়া যায়। আর সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেনগুপ্ত নিহত হয়।

অতঃপর ম্যাজিষ্ট্রেট ডাগলাস্ আসেন, মেদিনীপুর হইতে; কমাণ্ডাণ্ট বেকারও খড়গপুর গিয়াছিল সেও দ্রুত আসে, আর পুলিশ, ইনসপেক্টর, সুপারিণ্টেডেণ্ট প্রভৃতিতে স্থানটি ভরিয়া গেল। ডাগলাস তো টেবিলের উপরে পা

তুলিয়া তিরস্কার করিয়া কমাণ্ডাণ্টকে বলে—"বেকার, তুমি বড় ছেলে মানুষ, তুমি এদের অত্যধিক আদর দিয়াছ।"

বেকার—"আমার জায়গায় তুমি এস। তবেই অবস্থাটা ঠিক বুঝিতে পারিবে।

"Exchange our posts, you will see"

অতঃপর কলিকাতা হইতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র, দেশপ্রিয় যতীন্দ্র সেনগুপ্ত মেসার্স বি, সি, চাটার্জ্জী, নিশীথ সেন, নীরদ রঞ্জন দাশগুপ্ত প্রভৃতি অনেকেই সমাগত হইলেন। সরকার পক্ষ হইতে ঐ আহত অন্তরীণ আবদ্ধদের বিপক্ষেই একটী মোকদ্দমা খাড়া করিবার পরামর্শ হয়। কিন্তু তুইব্যক্তির জন্য তাহা সম্ভব হয় নাই। একজন মুসলমান ইনস্পেকটার আলতাফ্ আলি, অপর ব্যক্তি আলিপুরের পাবলিক প্রসিকিউটার স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনেস্পেকটার রিপোর্টে বলে ইহাদের বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা চলিতে পারে না। নগেন্দ্রবাবুও উহা সমর্থন করেন।

অতঃপর একটি বিভাগীয় তদন্ত হয়। মিঃ জাষ্টিস সত্যেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক এবং ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ড্রামণ্ড তদন্ত করেন। তুইপক্ষ হইতেই সাক্ষী সাবুদ উপস্থিত হয়। সুভাষচন্দ্র, মেসার্স চ্যাটার্জ্জী, সেনগুপ্ত ও দাশগুপ্ত তদন্তের জন্যও তদ্বির করিতে আসেন। তদন্তে স্থির হয়—আসামীদের ব্যবহার সময় সময় উত্যক্ত জনক ছিল, তবে বেপরোয়া গুলি চালান খুবই অন্যায় হইয়াছে।

১৭ই তারিখ দ্বিপ্রহরে হাওড়া ষ্টেসনে সন্তোষমিত্র ও তারকেশ্বরের মৃতদেহ পৌছে। অতঃপর একটী বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া কেওড়াতলা শ্মশান ঘাটে তাহাদিগকে দাহ করা হয়।

বহুলোক এই তুই শহীদের চিতাভস্ম নিজ নিজ পল্লীতে লইয়া যায় এবং ইহাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে।

সুভাষচন্দ্র ও সন্তোষ মিত্র একবৎসরই (১৯১৯) সম্মানের সহিত বি এ পাশ করেন। সন্তোষের পিতার নাম তুর্গাচরণ মিত্র, তাঁহার আর কোনও পুত্রসন্তান ছিল না। সন্তোষ এম-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ হইয়াছিল।

তারকেশ্বরের পিতার নাম ছিল হরিনারায়ণ সেন। তাহার জন্ম ১৩২২ সালে। তাহার ৭ ভাই ও এক ভগিনী ছিল। লবণ আইন অমান্যের সময় সে সত্যাগ্রহ করে। তারকেশ্বর সূতাকাটা ও খদ্দর তৈয়ারের জন্য গৈলাতে একটী আশ্রম করিয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট লবণ আইন অমান্যের সময় আশ্রমটি বন্ধ করিয়া দেয়।

দেহমুক্ত আত্মার বেদীমূলে কবীগুরু রবীন্দ্রনাথের অর্ঘ্য

১৯৩১ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর কলিকাতার গড়ের মাঠে লক্ষাধিক লোকের জনসভায়, হিজলীর শহীদদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া সভার সভাপতি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ নিম্নোক্ত ভাষণ দেন :—

"প্রথমেই বলে রাখা ভালো, আমি রাষ্ট্রনেতা নই ; আমার কর্মক্ষেত্র রাষ্ট্রিক আন্দোলনের বাইরে। কর্ত্তৃপক্ষদের কৃত কোন অন্যায় বা ত্রুটি নিয়ে সেটাকে আমাদের রাষ্ট্রিক খাতায় জমা করতে আমি বিশেষ আনন্দ পাইনে। এই যে হিজলীর গুলিচালনা ব্যাপারটি আজ আমাদের আলোচ্য বিষয়, তার শোচনীয় কাপুরুষতা ও পশুত্ব নিয়ে যা কিছু আমার বলবার সে কেবল অবমানিত মনুষ্যত্বের দিক তাকিয়ে। এত বড়ো জনসভায় যোগ দেওয়া আমার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর, মনের পক্ষে উদ্‌ভ্রান্তিজনক ; কিন্তু যখন ডাক পড়ল, থাকতে পারলুম না। ডাক এলো সেই পীড়িতদের কাছ থেকে, রক্ষক নামধারীরা যাদের কণ্ঠস্বরকে নরঘাতন নিষ্ঠুরতার দ্বারা চিরদিনের মতো নীরব করে দিয়েছে।

যখন দেখা যায়, জনমতকে অবজ্ঞার সঙ্গে উপেক্ষা করে এত অনায়াসে বিভীষিকার বিস্তার সম্ভবপর হয়, তখন ধরে নিতেই হবে যে; ভারতে বৃটিশ শাসনের চরিত্র বিকৃত লোকের পক্ষে এত সহজ অথচ যেখানে দুর্দ্দম দৌরাত্ম্য উত্তরোত্তর বেড়ে চলবার আশঙ্কা ঘটল। যেখানে নির্বিবেচক অপমান ও অপঘাতে পীড়িত হওয়া দেশের লোকের পক্ষে এত সহজ, অথচ যেখানে যথোচিত বিচারের ও অন্যায় প্রতিকারের আশা এত বাধাগ্রস্ত, সেখানে প্রজারক্ষার

দায়িত্ব যাঁদের পরে সেই সব শাসনকর্ত্তার এবং তাঁদেরই আত্মীয় কুটুম্বদের শ্রেয়োবুদ্ধি কলুষিত হবেই এবং সেখানে ভদ্র জাতীয় রাষ্ট্রবিধির ভিত্তি জীর্ণ না হয়ে থাকতে পারে না।

এ সভায় আমার আগমনের কারণ আর কিছুই নয়, আমি আমার স্বদেশ-বাসীর হয়ে রাজপুরুষদের এই বলে সতর্ক করতে চাই যে, বিদেশীরাজ যত পরাক্রম-শালী হোক না কেন, আত্মসম্মান হারানো তার পক্ষে সকলের চেয়ে দুর্ব্বলতার কারণ। এই আত্মসম্মানের প্রতিষ্ঠা ন্যায়পরতায়, ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও অবিচলিত সত্যনিষ্ঠায়। প্রজাকে পীড়ন স্বীকার করে নিতে বাধ্য করা রাজার পক্ষে কঠিন না হতে পারে, কিন্তু বিধিদত্ত অধিকার নিয়ে প্রজার মন যখন স্বয়ং রাজাকে বিচার করে, তখন তাকে নিরস্ত্র করতে পারে কোন্ শক্তি? এ কথা ভুললে চলবে না যে, প্রজাদের অনকূল বিচার ও আন্তরিক সমর্থনের পরেই অবশেষে বিদেশী শাসনের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। আমি আজ উত্তেজনাবাক্য সাজিয়ে সাজিয়ে নিজের হৃদয়াবেগের ব্যর্থ আড়ম্বর করতে চাইনে এবং এই সভার বক্তাদের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, তাঁরা যেন একথা মনে রাখেন যে, ঘটনাটা স্বতঃই আপন কলঙ্কলাঞ্ছিত নিন্দার পতাকা যে উচ্চে ধরে আছে, তত উর্দ্ধে আমাদের ধিক্কারবাক্য পূর্ণবেগে পৌঁছিতেই পারবে না। একথাও মনে রাখতে হবে, আমার নিজের চিত্তে সেই গম্ভীর শান্তি যেন রক্ষা করি, যাতে করে পাপের মূলগত প্রতিকারের কথা চিন্তা করবার ধৈর্য্য আমাদের থাকে এবং আমাদের নির্য্যাতিত ভ্রাতাদের কঠোর দুঃখ স্বীকারের প্রত্যুত্তরে আমরাও কঠিন দুঃখ ও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হতে পারি।

উপসংহারে শোকতপ্ত পরিবারদের নিকট আমাদের আন্তরিক বেদনা নিবেদন করি এবং সেই সঙ্গে একথাও জানাই যে, এই মর্ম্মভেদী দুর্য্যোগের একটা সম্পূর্ণ অবসান হলেও দেশবাসী সকলের ব্যথিত স্মৃতি দেহমুক্ত আত্মার বেদীমুলে পুণ্য শিখায় উজ্জ্বল দীপ্তি প্রদান করবে।”

আরও কয়েকটি পূর্ব্বের ঘটনা এখানে বলা দরকার।

বড়লাটের ট্রেনের উপর আবার আক্রমণ

দক্ষিণ আফ্রিকা পরিদর্শনের পরে বড়লাট লর্ড আরউইন যখন দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, নূতন দিল্লীর একমাইল দূরে পুরাতন কেল্লার নিকটে তাঁহার ট্রেনে একটী বোমা ফাটে। বোমাটির অভ্যন্তরে লুক্কায়িত একটী ঘড়ির কলের সহিত বৈদ্যুতিক তার সংলগ্ন ছিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে বোমা ফাটে কিন্তু সৌভাগ্যবলে লর্ড আরউইন অক্ষত থাকেন। তবে তাঁহার ভোজনের সেলুনটি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। আর একজন আরদালীও আহত হয়।

এই ঘটনা হয় ১৯২৯ সালের ২৩ ডিসেম্বর।

কালীঘাটে রিভলভার

১৯৩০—১২ ডিসেম্বর তারিখে কালীঘাট ৪১নং ঈশ্বর গাঙ্গুলীলেনে শ্রীচূনীলাল মুখার্জ্জীকে একটী রিভালবার সহ পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

চূণীলাল ছাড়া মনীন্দ্রলাল সেন ও সুবোধ দাশগুপ্তকেও গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারে তিনজনেরই জেল হয়। চূণীলাল ছিল তরুণসঙ্ঘের সম্পাদক, সুবোধ দাশগুপ্ত আইন পড়িত, আর মণিসেন ছিল পাটনার উকিল। মেসার্স গার্লিক, এন. কে. বসু, আদিলজ্জমানের ট্রাইবুন্যালে প্রত্যেকের একবৎসর করিয়া জেল হয়

পাঞ্জাব গভর্ণরের প্রতি আক্রমণ

১৯৩০ সালের ২৩শে ডিসেম্বর পাঞ্জাবের গভর্ণর Sir G. D Montworency বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন সভায় গিয়াছিলেন। ভাইস চেন্সালার এ, সি, ওলভার (Walver) এবং অন্যান্য সভ্য সভামঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। এইসময় হরিকিশন নামক এক যুবক গভর্ণরকে উদ্দেশ করিয়া গুলি নিক্ষেপ করে।

গভর্ণর প্রাণে বাঁচিয়া যান। কিন্তু তাঁহার দক্ষিণ হস্তে আঘাত লাগে। গভর্ণরকে বাঁচাইতে আসিয়া সহকারী দারোগা চলন সিং গুলির আঘাতে নিহত হয়। প্রথমে দুইটি শব্দ হয়—মনে হয় যেন পট্‌কা। কিন্তু পরে একাদিক্রমে চারিটি গুলি মারা হয়। ইন্‌স্পেকটার ওয়ালডেওয়ান আহত হয়। গভর্ণর গুলি খাইয়া বারেন্দায় যান; তারপরে পাশের ঘরে গিয়া রক্ত ধুইয়া আসেন। এ পর্য্যন্ত কাহাকেও তিনি আহত হইবার কথা জানিতে দেন নাই। কিন্তু কর্ণেল হার্পার নেলসন, আই, এম, এস, সেখানে ফেলো হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানিতে পারিয়া গভর্ণরের হস্তে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া ঔষধ দিয়া দেন। একটি শ্বেতাঙ্গ মহিলা, **Miss Mc Dermott** ও আহত হয়।

আসামী তৎক্ষণাৎই ধৃত হয়। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর করে, তাহার বয়স ২২ বৎসর, বাড়ী পেশোয়ার জেলায়, সে গভর্ণরকে গুলি করিবার জন্যই উপস্থিত হইয়াছে। রিভালভারটি সে জনৈক আফ্রিদির নিকট হইতে খরিদ করিয়াছিল। ১৯৩১, ২৬ জানুয়ারী হরকিশেনের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়।

গভর্ণরকে হত্যা করিবার জন্য যে ষড়যন্ত্র হয় তার মধ্যে প্রধান উদ্‌যোক্তা ছিল "মিলাপ" সংবাদপত্রের সম্পাদক দুর্গাদাস, মহেশ কুশলচাঁদের পুত্র রণবীর সিং এবং চমন লাল। দুর্গাদাস সকলকে বুঝাইয়া বলে মহাত্মাজী সত্যাগ্রহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কোন ইহাতে ফল হইবে না। ক্ষাত্র শক্তির নিকট ভিন্ন গভর্ণমেণ্ট কিছুতেই নতি স্বীকার করিবে না।

বিচারে ইহাদের উপর প্রাণদণ্ডের আবেশ হয়। বড়লাটের স্পেশাল ট্রেণ উড়াইবার জন্যও ষড়যন্ত্র হয়।

বোম্বাই প্রদেশস্থ গভর্ণরের প্রতি আক্রমণ

পুণা সহরেও একটি লোমহর্যক ঘটনা ঘটে। প্রদেশের গভর্ণর, স্যার আরনেষ্ট হট্‌সন, ১৩৩১ সালের ২৩ জুলাই পুণা সহরের ফার্গুসন্‌ কলেজে গমন করেন। তিনি যে সময় লাইব্রেরী ঘরে প্রবেশ করিয়া ছাত্রদের সম্মুখে একটি অভিভাষণ দিতে ছিলেন, সে সময় বাসুদেব বলবন্ত গোগাটি নামক ১৯ বৎসরের একটি মহারাষ্ট্র যুবক গভর্ণরের প্রতি গুলি নিক্ষেপ করে। কিন্তু ইহা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ঘটনার পরে তিনি বলেন,

"নির্ব্বোধ যুবক, কেন এরূপ কাজ কল্লে?" **A foolish thing to do, my boy, what made you do it ?** ইহার পরে ছাত্রগণ সঙ্গিটির সম্মানের জন্য একটি শোভাযাত্রা করে।

জজ গার্লিক সাহেবের হত্যা

মিঃ আর, আর গার্লিক আই, সি, এস আলিপুরের ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ ছিলেন। তিনি হাইকোর্টের বিচারপতির আসনেও কিছুদিন উপবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু বধিরতা দোষ ছিল বলিয়া স্থায়ী জজ হইতে পারেন নাই। ইনি অতিশয় সদাশয় ও ন্যায়পরায়ণ জজ ছিলেন। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে পরপর কয়েকটি বিপ্লবী আসামীর বিচার তাঁহার নেতৃত্বাধীন ট্রাইবুন্যালে হয়। রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, দীনেশ গুপ্ত, প্রভৃতির প্রাণদণ্ডের আদেশ ইনিই প্রদান করেন। ইনি জানিতেন যে তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে আততায়ীরাও তাঁহার প্রাণ বিনাশের জন্য ঘুরিতেছে। ইতিপূর্ব্বে ভয় দেখাইয়া একখানি চিঠিও তাঁহাকে লেখা হইয়াছিল।

২৭সে জুলাই গার্লিক সাহেব খাস কাম্‌রা হইতে এজলাসে আসিয়া বসিয়াছেন। দরখাস্ত গুলি শুনিবার পরে একটি কি মোকদ্দমা ধরিয়াছেন, তখন ঘরে বেশী লোকজন ছিল না। হঠাৎ একটী যুবক আসিয়া তাঁহাকে গুলি করে, তিনি

ঢলিয়া পড়েন। অবিলম্বে তাঁহাকে প্রেসিডেন্সি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

গার্লিক সাহেবকে যখন গুলি করা হয়, ঘরে একজন সার্জ্জেণ্ট ও সরিফ খাঁ নামে একজন কনেষ্টবলও ছিল। সাধারণ পরিচ্ছদে আই, বির একজন দারোগাও উপস্থিত ছিল। যুবকের সঙ্গে ও উহাদের সঙ্গে তারপর হাতাহাতি হয়। উভয় দিক হইতেই গুলি নিক্ষিপ্ত হয়, সরিফখাঁও গুরুতর আহত হয়। সঙ্গে সঙ্গেই পটাসিয়াম সহিনাইড গলার্ধঃ করণ করিয়া ঘটনাস্থলেই যুবক আত্মহত্যা করে। যুবকের পকেটে একখানি কাগজ ছিল, তাহাতে এই কয়েকটি কথা লেখা ছিল—

"তুমি নিপাত যাও, দীনেশের প্রতি যে অবিচার করিয়াছ, তাহার ফলভোগ কর।"
ইতি বিমলগুপ্ত"

যুবকের কাছে ১৪টি তাজা গুলি ছিল কিন্তু বিমল গুপ্ত এই যুবকের প্রকৃত নাম কিনা কেহ বলিতে পারে না, কারণ ইহার দেহ সনাক্ত হয় নাই, কেহ কেহ বলে উহার বাটি ছিল জয়নগর মজিলপুর, উপাধি ভট্টাচার্য্য।

পূর্ব্বে যে দীনেশগুপ্তের ফাঁসি হয়, এবং কলিকাতা কর্পোরেশনে তাহার দেশভক্তির প্রশংসা করিয়াও কার্যেরে নিন্দা করিয়া প্রস্তাব পাশ হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইহার তিনদিন পরেই (৩০শে জুলাই) ডালহাউসি ইনষ্টিটিউটে এই কার্য্যের নিন্দা করিয়া এবং কর্পোরেসনের প্রস্তাবের কঠোর সমালোচনা করিয়া কয়েকটি প্রস্তাব পাশ হয়। এই সভায় দেশীয় ও বিদেশীয় বহু লোক উপস্থিত ছিলেন। দেশীয়দিগের মধ্যে স্যার আর, এন মুখার্জ্জি, জাষ্টিস্ চারুচন্দ্র ঘোষ, জাষ্টিস বি, বি, ঘোষ, শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস (পরে জাষ্টিস) মিঃ এস, এস সারওয়ার্দ্দি, আর. সি বনার্জ্জি, আবুল কাসেম, স্যার আবদুল হালিম গজনভি, আর এস শর্ম্মা প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। প্রেসিডেণ্ট হন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার লেনসেট স্যাণ্ডারসন। শ্রীযুক্ত বিশ্বাস তাঁহার পিতার শোচনীয় মৃত্যুর কথা বিবৃত করেন এবং বলেন কর্পোরেশনের সঙ্গে

যে সংশ্লিষ্ট আছেন তাহাতে তিনি লজ্জাবোধ করেন—**I was a member of the house which was responsible for that shameless proceeding.**

মৌলভী আবুল কাসেম বলেন "চৌরীচুরার পরে মহাত্মাজী কেবল উপবাসই করিয়া আসিতেছেন—কিন্তু উপবাসে কিছুই হইবে না, যে পর্য্যন্ত না তিনি তাঁহার নীতি পরিবর্ত্তন করেন"।

এই ধীরপন্থী সভায় উপস্থিত সভ্যগণ যাহা বলেন, প্রতিক্রিয়াশীল ইউরোপীয়ান-গণও অনুরূপ মতই প্রকাশ করিতেন।

বিভাগস্থ কমিসনারের উপর আক্রমণ

ইহার পর ঢাকার কমিসনার এ ক্যাসেল সাহেব যখন ১৯৩১ সালের ২১ আগষ্ট তারিখে টাঙ্গাইল সেণ্ট্রাল কো অপারেটিভ অফিসে যান, সে সময় একটি যুবক তাঁহাকে গুলি করে। তিনি আহত হন বটে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে বাঁচিয়া যান।

ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর আক্রমণ

ইহার পরের ঘটনা ঢাকা জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট ডুরনো সাহেবের উপর আক্রমণ। ইহা ২৮ অক্টোবর সংঘটিত হয়। তিনি তখন নবাবপুর রাস্তা দিয়া রায় সাহেবের বাজারের নিকট একটি দোকান হইতে বাহিরে আসিতে ছিলেন। কে এক অজ্ঞাত নামা ব্যক্তি ইহাকে গুলি করে। অবিলম্বে ইনি হাসপাতালে প্রেরিত হন এবং সুস্থ হন। কিন্তু ইহার ফলে ঢাকার সহরের

উপর যে ভীষণ অত্যাচার হয়, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। কত লোক প্রহৃত হয়, কত নির্দ্দোষী গ্রেপ্তার হয়, কত স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার হয়, কত গৃহ লুণ্ঠিত হয় তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। এই অত্যাচার সংঘটিত মর্ম্মান্তিক দৃশ্য আমরা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। পতিতাদের গৃহাদিও নির্ম্মম-ভাবে তল্লাস করা হয়। সেখান হইতে অনেক জিনিস পত্র অপসারিত হয়। গভীর রাত্রে লোক জাগাইয়া গ্রেপ্তার, প্রহার ও তল্লাসে লোক একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। ঢাকার কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও পুত্রসহ ধৃত হইয়া অনেক দিন সেণ্ট্রাল জেলে আবদ্ধ ছিলেন।

এই সব অত্যাচার অনাচারের অধিনায়কই ছিল এডিসনাল পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এলিসন। ইনি সুভাষচন্দ্রকে লইয়া এক হাস্যকর ব্যাপার করেন। অত্যাচারের অনুসন্ধান কল্পে কলিকাতায় এলবার্ট হলের সভায় ৫ই নভেম্বর একটি কমিটি গঠিত হয়। অনেকে ইহার সভ্য ছিলেন। তবে ঢাকা রওনা হয় নেতাজী, শ্রী যোগেশচন্দ্র গুপ্ত ও বর্ত্তমান লেখক।

সুভাষচন্দ্রের প্রতি যে ব্যবহার করা হয় তাহা যে কোন রাজকর্ম্মচারীর পক্ষেই নিতান্ত অযোগ্য ও লজ্জাকর। ৭ই নভেম্বর নারায়ণগঞ্জে ষ্টিমার পৌঁছিলে সুভাষচন্দ্রকে প্রথমে অবতরণ করিতে নিষেধ করা হয়, কিন্তু ঐ নিষেধবাক্যে তিনি কর্ণপাত না করিয়া পারে উঠিলে, তাঁহাকে থানায় লইয়া যাওয়া হয়। এবং অনেক বাদানুবাদের পরে তাঁহাকে সেখান হইতে চাঁদপুর পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সুভাষচন্দ্রের উপস্থিতিতে নিপীড়িত ঢাকাবাসীগণ সাহস ও উৎসাহ পাইত কিন্তু অকারণে তাঁহার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খর্ব্ব করিয়া ঢাকানিবাসীদের উপর এলিসন যে আরও অত্যাচার করে, তাহাতে সে লোকচক্ষে আরও হেয় হয়। ইহারই ফলে, কয়েকবৎসর পরে এলিসন যখন কুমিল্লার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পদে অধিষ্ঠিত, জনৈক সন্ত্রাসবাদী কর্ত্তৃক সেখানে সে নিহত হয়।

উল্টাডাঙ্গার ডাকাতি

১৯৩১ ২রা অক্টোবর ২৮।১ ক্যানেল ওয়েষ্ট রোডে (উল্টাডিঙ্গি) কৈলাশ চন্দ্র সনাতন পালের গদিতে যাইয়া কয়েকজন রিভলভার দেখাইয়া লোহার সিন্দুকের চাবি চাহিয়া লয়। তারপর সিন্ধুক খুলিয়া ৩০০৲ লইয়া প্রস্থান করে। কিন্তু কয়েকজন লোক একত্র হইয়া তাহাদিগকে অনুসরণ করে। ডাকাতগণ মোটরে দ্রুতগতিতে চলিতে থাকে। কিন্তু মোটরখানি একটা গর্ত্তে পড়িয়া থামিয়া যায়। ক্যানেল ওয়েষ্ট রোড ধরিয়া কয়জন দৌড়াইতে থাকে,। যাহারা মোটরে আসিয়াছিল তাহাদের সঙ্গে শ্রীযুক্তা বিমল-প্রতিভা দেবী ও ছিলেন কিন্তু তিনি মোটরেই উপবিষ্ট থাকেন। মোটর চালক ধীরেন চৌধুরী ও ইনি ধৃত হন, আরও দুইজন যুবককে পুলিস ধরিয়া ফেলে। যে ট্রাইবুন্যালে বিচার হয় তাহার প্রেসিডেন্ট ছিলেন মিঃ ব্লাক (পরে হাইকোর্টের বিচারপতি) অন্যান্য বিচাররতি থাকেন আর, এন্ রায়, ও এ, সি চাটার্জ্জী।

ঘটনার দুইমাস পার ১৪ ডিসেম্বর ১৯৩১ যে রায় বাহির হয় উহাতে বিমল প্রতিভা দেবী ও প্রফুল্ল ভট্টাচার্য্য মুক্তিলাভ করে, ধীরেন চৌধুরীর হয় পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাবাস, কালিপদ রায়ের পাঁচ বৎসর ও নরহরি সেনের তিন বৎসর।

শ্যামবাজারের বোমা

অক্টোবর ১৩ই শ্যামবাজার বোমার মোকদ্দমা। ইহাতে ফণীভূষণ গুপ্ত প্রফুল্ল কুমার দে, অশ্বিনী কুমার দত্ত, সন্তোষ ব্যানার্জ্জি, সুধীর দত্ত প্রভৃতি কয়েকজনের সাজা হয়—কাহারও একবৎসর, কাহারও ২।৩ বৎসর, কাহারও ৬ বৎসর।

মানকুণ্ডে

মানকুণ্ড মোকদ্দমা হয় ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩১।

এইবার ১৯৩০ সালের ও ১৯৩১ সালের ঘটনাবলীর একটা ধারাবাহিক বিবরণ পর পৃষ্ঠায় দিতেছি—

১৯৩০—১৮ এপ্রিল—চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। ২২শে এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়ে যুদ্ধ। ১৯ মে—শিবপুর দারোগার উপরে বোমা নিক্ষেপ। ৩রা জুন দাসপুরে দারোগা খুন। ৭ই জুন কংশাবতী নদীর তীরে চতুর্দ্দশ শহীদ নিহত। ৭ই আগষ্ট সরিষা বাড়ীতে বোমাসহ বাক্স। ২৫ আগষ্ট ড্যালহৌসি স্কোয়ারে পুলিশের গোয়েন্দা বড় সাহেব টেগার্টের উপর আক্রমণ; অনুজ সেনের আত্মহত্যা ও দীনেশ মজুমদার ধৃত। ২৯ আগষ্ট পুলিশের ইনস্পেক্টার জেনারেল লোমান নিহত ও হড্‌সন আহত। ২ সেপ্টেম্বর—টেগার্ট সাহেব কর্ত্তৃক চন্দননগরে বাড়ী ঘেরাওকরিয়া চট্টগ্রামের আত্মগোপনকারী আসামীদের ধৃতকরণ।

১লা ডিসেম্বর চাঁদপুরে তারিণী মুখার্জ্জি নিহত। ৮ ডিসেম্বর কর্ণেস সিমসন নিহত, মিঃ নেলসন আহত। ১২ ডিসেম্বর চুণীলাল মুখার্জ্জির নিকট রিভলবার প্রাপ্তি। ২৩ ডিসেম্বর কনভোকেসনে পাঞ্জাব গভর্ণরের উপর আক্রমণ।

১৯৩১—৩ জানুয়ারী—চাঁদপুর ব্যাপারে রামকৃষ্ণের বিচার আরম্ভ। ২০ জানুয়ারী—দীনেশ গুপ্তের বিচার আরম্ভ। ৭ই ফেব্রুয়ারী ম্যাজিষ্ট্রেট পেডি হত্যা। ২৫ ফেব্রুয়ারী—দীনেশের মৃত্যুদণ্ড। ২৭ ফেব্রুয়ারী—এলাহাবাদে পুলিস ও চন্দ্রশেখর আজাদের মধ্যে গুলি বিনিময়ে চন্দ্রশেখর নিহত। ৭ জুলাই—দীনেশের ফাঁসি। ৮ জুলাই কর্পোরেসনে প্রস্তাব। ২৩ জুলাই—বোম্বাই গভর্ণরের উপর আক্রমণ প্রচেষ্টা। ২৭ জুলাই—গার্লিক সাহেব নিহত। ৩০ জুলাই—ড্যালহৌসি স্কোয়ারে সাহেবদের ও লিবারেল পার্টির সভা। ২১ আগষ্ট—কমিসনার ক্যাসেল সাহেবের উপরে আক্রমণ। ৩০ আগষ্ট—চট্যগ্রামে ইন্‌স্পেক্টার আসানুল্লা সাহেবের হত্যা। ১৬ই সেপ্টেম্বর—হিজলীর শোচনীয় ঘটনা। ২৬ সেপ্টেম্বর—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে সভা। ২রা অক্টোবর—উণ্টাডাঙ্গা ডাকাতি। শ্রীমতী বিমলপ্রতিভা দেবী ধৃত। ২৮ অক্টোবর—ঢাকা মাজিষ্ট্রেট ডুর্ণো সাহেবের উপরে প্রচেষ্টা। ২৯ অক্টোবর—ইউরোপীয় সভার সভাপতিকে গুলি মারা হয়।

আবার নূতন চণ্ড আইন

১৯২৫ সালে আইন পরিষদে বেঙ্গল অর্ডিনান্স পাশ না হওয়ায়, গভর্ণর লর্ড লীটন অতিরিক্ত ক্ষমতা বলে (Certification) উহা পাশ করেন। সেই বিশেষ ক্ষমতা বলেই উহার প্রয়োগ নিরঙ্কুষ ভাবে চলে। এই আইন প্রবর্ত্তিত হইবার পরে বাঙ্গলার বাহিরে কাকোরী ষড়যন্ত্র ও লাহোর ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা সংক্রান্ত ঘটনা ছাড়া ভারতের অন্য প্রদেশে অপর কোন ঘটনার কথা শুনা যায় নাই। বাঙ্গলা দেশে অবশ্য চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন একটি প্রধান ঘটনা এবং তজ্জন্য দুই একটি অর্ডিনান্সও হয়। অতঃপর ১৯৩০ সাল ও ১৯৩১ সালে বাঙ্গলা দেশে অনেক হিংসাত্মক ঘটনা হইয়াছে সত্য এবং তাহাতে অনেক নিরীহ ইংরাজেরও মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই সব ঘটনার দায়িত্ব বিপ্লবীদের অপেক্ষা তুলনায় গভর্ণমেণ্ট এবং ইংরাজেরই বেশী। একটু বিবেচনা করিলেই ইহার সত্যতা সপ্রমাণিত হইবে।

১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারীর জাতীয় পতাকা উত্তোলনের অনুষ্ঠানের পরেই ইংরাজ অত্যন্ত রুষ্ট ও উষ্ণ হইয়া উঠে। লবণ আইন সত্যাগ্রহের পরে বাঙ্গলার সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ মেদিনীপুর, ঢাকায় নিদারুণ অত্যাচার হয়। ১৯৩০ সালে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা ইংরাজের প্ররোচনার ফলেই হয়। একথা শ্বেতাঙ্গ তদন্তকারীও স্বীকার করিয়াছেন। দাসপুরে যে ভীষণ নিষ্ঠুরতা প্রদর্শিত হয়, এবং মিলিটারী পুলিস মেদিনীপুরে যেরূপ বর্ব্বরতার পরিচয় দেয়—তাহাতেই মেদিনী-পুরে গুপ্ত বিপ্লব সমিতি গড়িয়া উঠে এবং ইহারই ফলে পেডি, ডগলাস, বার্জ্জ প্রভৃতির হত্যা সাধিত হয়। ঢাকার অত্যাচারের ফলেই ক্যাসেল, ডুর্ণো প্রভৃতির হত্যা চেষ্টা, পুলিস অত্যাচারী হইয়াছিল বলিয়াই লোমানের হত্যা ও ক্রেইগের প্রাণনাশের চেষ্টা হয়। আলিপুর ও অন্যান্য স্থানে বন্দীদের উপর অত্যাচার সংঘটিত হয় বলিয়াই কর্ণেল সিমসনের প্রতি আক্রমণ ও তাহার নিধন সাধন হয়। ইংরাজের অত্যাচারেই যে সন্ত্রাসবাদ পুষ্ট হইয়া উঠে, তাহার অসংখ্য প্রমাণ দিয়াছি ও

পাঠক স্বচক্ষে দেখিতে পাইবেন। ইংরাজ যদি তখন স্বাধীনতার দাবী স্বীকার করিয়া লইত, এমনকি যদি ২৬সে জানুয়ারীর পরে ও লবণ সত্যাগ্রহে ধৈর্য্যহীন না হইত, বেপরোয়া লাঠি চালাইতে আদেশ না দিত, নির্ব্বিচারে গেরেফতার ও খানা তল্লাসি না হইত তাহা হইলে কতকগুলি ইংরাজ রাজ পুরুষের অতিতায়ীর হস্তে জীবন দিতে হইত না। কিন্তু ইংরাজ দেখিল ১৯২৫ সালের বিশেষ আইন পাঁচ বৎসর পরে অচল হওয়ায়—আটমাস মধ্যে বাঙ্গলায়—১৯৩০ সালে উনিশজন রাজ কর্মচারী নিহত হইয়াছে, ৩৬টি সন্ত্রাস মূলক ঘটনা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, আর ১৯৩১ সালেও ১১৮টির উক্ত ধরণের ঘটনা ঘটিয়াছে। তাই তাহারা একটি কঠোর আইন প্রবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিল। কিন্তু বিচক্ষণতার অভাবে তাহারা একবারও ভাবে নাই, যে, কঠোর পন্থায় সন্ত্রাসবাদ বিদূরিত হয় না বরং প্রসারিত হয়। গভর্ণমেণ্টের এইরূপ মনোভাব, কিন্তু জনসঙ্ঘ বুঝিল অন্যরূপ। এই দ্বন্দের মধ্যেই ১৯৩১ সালের ২৯ অক্টোবর বেঙ্গল অর্ডিনান্স পাশ হইল। ইহার বলে জজ ও জুরীর সহায়তা ব্যতীত ডাকাতি, হত্যা প্রচেষ্টা প্রভৃতি অপরাধ বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেটদিগকে বিচার করবার ক্ষমতা দেওয়া হয়, যখন তখন লোককে সন্দেহ করিয়া অন্তরীণে আবদ্ধ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং যে কোন স্থানে পাইকারী জরিমানা আদায় করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। বাঙ্গলার অর্ডিনান্‌স্ পাশ হইবার পূর্ব্বে ও পরে সুভাষচন্দ্র প্রাণপণে ইহার প্রতিবাদে তৎপর ছিলেন।

ইতিমধ্যে অনেককে ধরা হইয়াছে এবং অনেককে ধরিবার জন্য তদানীন্তন গভর্ণয় জেনারেল লর্ড উইলিংডন অস্ত্র শানাইয়া রাখিলেন। এদিকে বেঙ্গল অর্ডি-নান্সের পরে ভারতীয় নেতৃবৃন্দও নীরব রহিলেন না। এবারকার বেঙ্গল অর্ডি-নান্‌স্ পাশ হয় ১৯৩১ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে।

বেঙ্গল অর্ডিনান্স ও মহাত্মাজী

মহাত্মাগান্ধী এই সময়ে লণ্ডনে ছিলেন। তিনি গোল টেবিল বৈঠকে মহাদেব দেশাইকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। ইতিমধ্যেই তাঁহার মতামত সম্বন্ধে মহাদেব লিখিয়া পাঠান—

এবারকার অর্ডিনান্স, ১৯২৫ সালের অর্ডিনান্স অপেক্ষাও মারাত্মক। একমাত্র সিপাহী বিদ্রোহের পরের বেপরোয়া মৃত্যুদণ্ড এবং জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গেই ইহার তুলনা হইতে পারে—

"The Bengal Ordinance of 1931 is more ghastly than that of 1925 It reminds us of th days of the Sepoy Mutiny and the Amritsar massacre of 1919."

মহাত্মাজী লণ্ডন হইতে দেশে ফিরিবার সময় অত্যন্ত বিরসবদনে প্রত্যাগত হন। ভবিষ্যতে আবার দেশকে যে গভর্ণমেণ্টের সহিত অনিবার্য্য কারণে সংঘর্ষে আসিতে হইবে তাহাতে তিনি অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হন। বেঙ্গল অর্ডিনান্সের ধারাগুলি এত মারাত্মক যে তিনি কিছুতেই মনে শান্তি আনিতে পারেন নাই। জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি বলেন—

"এই বিষয়ে আমি যত চিন্তা করি, আমার মন বিষাদে ভরিয়া উঠে। কি সর্ব্বনাশ, হত্যা করা হয় নাই, কেবল চেষ্টা হইয়াছে মাত্র, তারও দণ্ড মৃত্যু! কেবল ইহার জন্য নয়, বেঙ্গল অর্ডিনান্সের প্রায় সমস্ত ধারাগুলিতেই প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে কেবল কয়েকটি মূল্যবান জীবনই যে নষ্ট হইবে তাহা নয়, সমগ্র জাতিটাকেই পঙ্গু করিবার উদ্দেশ্যে এই ধারাগুলির সৃষ্টি হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট সুবুদ্ধি বশতঃ যদি এই জরুরী আইনটি নাকচ করিয়া দেয় তবেই সুদিন, নতুবা ইহার ফলে যে কি হইবে আমি ভাবিয়া কূল পাইতেছি না। আমার যেন মনে হয় এই অর্ডিনান্সের ফলে

সংগ্রাম অনিবার্য্য হইয়া আসিবে। চণ্ডনীতি প্রয়োগে ভারত শান্ত হইবে না। ভারতীয় সমস্যা মুষ্টিমেয় লোকের আন্দোলনে নিবদ্ধ নহে, ইহা সমস্ত জাতির সমস্যা।"

বেঙ্গল অর্ডিনান্সরূপে চণ্ডনীতি প্রয়োগ কেন হইতেছে, তাহারও কারণ ১৯৩১ সালের ১লা ডিসেম্বর মহাত্মাজী লণ্ডনে কমনওয়েলথ অব ইণ্ডিয়ার একটি সভায় অভিনন্দনের উত্তরে বলেন—

"আমি গোল টেবিল বৈঠকে আহূত হইয়া আসিয়াছি বটে, কিন্তু দেখিলাম কোন ফল হওয়ার সম্ভাবনা নাই। ভারতীয় সিভিল সার্ভিস বিন্দুমাত্র ক্ষমতাও হস্তান্তর করিতে ইচ্ছুক নয়। ইতিমধ্যেই চণ্ডনীতির প্রয়োগ ভীষণভাবে আরম্ভ হইয়াছে। হিজলীতে, চট্টগ্রামে, মেদিনীপুরে অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা হইয়াছে। কেবল তাহাই নয়, আজ সমগ্র বঙ্গদেশই রুদ্রনীতি ও পীড়নের অবাধ লীলাক্ষেত্র হইয়া পড়িয়াছে। একসময়ে আয়ার্লণ্ডে ব্লাক্ ও ট্যানদের যে ভীষণ অত্যাচার দেখা দিয়াছিল, বাংলাদেশে তাহা অপেক্ষাও ভীষণ দুঃসময় উপস্থিত। আমরাতো গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে প্রীতিসম্বন্ধ স্থাপন করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু জনকতক বিপ্লবীর জন্য সমগ্র জাতির উপরে অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন অরাজকতার নামান্তর মাত্র।"

ইহার পরে মহাত্মাজী দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বেঙ্গল অর্ডিনান্স এবং যুক্তপ্রদেশে ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে প্রবর্ত্তিত কয়েকটি অর্ডিনান্স উঠাইয়া লইতে বড়লাট ওইলিংডনকে অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁহার অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হইলে ওয়ার্কিং কমিটি সত্যাগ্রহ করিতে মনস্থ করে। এবার ধরপাকড়ই কেবল আরম্ভ হইল না, বেপরোয়া লাঠি চলিল, কংগ্রেস আফিস, কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের বাড়ী ও বৈঠকখানা পুলিস কর্ত্তৃক তালা বন্ধ হইল। অসংখ্যলোক গ্রেপ্তার হইল, কাকারুদ্ধ হইল। মহাত্মাজী, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই গ্রেপ্তার হইয়া দূরবর্ত্তী প্রদেশে স্থানান্তরিত হইলেন।

কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে গ্রেপ্তারের পরে গ্রেপ্তার চলিল। ১২ দিনের

মধ্যে বাঙ্গালায় ২৭২টি সমিতি বে-আইনি বলিয়া ঘোষিত হইল। ৫ই জানুয়ারী লেখকের বৈঠকখানা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য তালাবদ্ধ হয়, ইহাতে তাহার ওকালতি ব্যবসা নষ্ট হইয়া যায়। ইহাতেই প্রত্যক্ষভাবে বুঝা যায় যে, লোক কেবল হাতে মরে নাই, ভাতেও মরিতে লাগিল।

এলাহাবাদের স্বরাজ ভবনটি পুলিস দখল করিয়া লইল। বহু স্ত্রীলোক ধৃত হইলেন, এখন কি মাহাত্মাজীর সহধর্ম্মিনী কস্তুরীবাঈ এবং গান্ধীজীও ছয়মাসের জন্য কারারুদ্ধ হন। 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' আফিসও তালাবদ্ধ হয়। অত্যাচারও পীড়ন এত অধিক হইল যে মনীষী রোমা রোঁলা পর্য্যন্ত আন্তর্জাতিক প্রতিবাদের জন্য সকলকে উৎসাহিত করিলেন।

মেদিনীপুরে তিনটি ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যা

মেদিনীপুরে দাসপুরের নৃশংস গুলিবর্ষণ, ম্যাজিষ্ট্রেট পেডির প্রাণবিনাশ এবং হিজলীতে অমানুষিক হত্যাকাণ্ড—এযুগে মেদিনীপুর জিলাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু মেদিনীপুরে গুপ্ত সমিতি কেবল পেডিকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্রেই উদ্ভব হয় নাই। মুরারীপুকুর উদ্যানের সত্যেন্দ্র বসু, ক্ষুদিরাম বসু, হেমচন্দ্র দাস সকলেই ছিলেন মেদিনীপুরবাসী। তাঁহাদের কার্য্যকলাপ প্রথম খণ্ডে বিবৃত হইয়াছে। ক্ষুদিরাম বসু যখন রাজদ্রোহমূলক প্রচারপত্র বিলি করিবার জন্য অভিযুক্ত হইয়া পরে মুক্তিলাভ করে, স্বর্গীয় ব্যারিষ্টার কে, বি, দত্তের সুসজ্জিত গাড়ীতে বসাইয়া শোভাযাত্রায় তাহাকে সমস্ত সহর ঘুরাইয়া আনাহয়, সেই শোভা-যাত্রার নেতাই ছিলেন সত্যেন্দ্র বসু। মেদিনীপুরেই জিলাসম্মিলনীতে ১৯০৭ সালের ডিসেম্বরে যে গোলমাল হয়, সুরাট কংগ্রেস-ছত্রভঙ্গের তাহার পূর্ব্বাভাস মাত্র। লেপ্টানাণ্ট গভর্ণর স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজারের গাড়ী উড়াইবার চেষ্টাও হয় মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ে। এতদ্ব্যতীত ম্যাজিষ্ট্রেট ডোনাল্ড ওয়েষ্টনকে হত্যা করিবার এবং পুলিশ কর্ম্মচারীকে নিগৃহীত করিবার ষড়যন্ত্রও মেদিনীপুরে হয়।

ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী কর্ত্তৃক মজঃফরপুরেরখুনের পরে—২রা মে ১৯০৮ যেমন কলিকাতার বিভিন্নস্থানে খানাতল্লাস হয়, ৩রা মে মেদিনীপুরেরও বিভিন্ন স্থানে খানাতল্লাস হয়। প্রধান প্রধান লোকের বাড়ীও বাদ থাকে না। অপর আর কাহার কথা বলিব—নাড়াজোলের রাজা, রাজা নরেন্দ্রলাল খানের বাড়ী ও খ্যাতনামা উকীল উপেন্দ্রনাথ মাইতির বাড়ীও খানাতল্লাস হয়। তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার ক রা হয়। বহু লোককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং পুলিশ তাহাদের বিরুদ্ধে চালানী পরওয়ানা দাখিল করে। কিন্তু তৎকালীন এড্‌ভোকেট জেনারেল স্তার (পরে লর্ড) সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ মহাশয় কেবল সন্তোষ দাস, সুরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি ও যোগজীবন ঘোষকে বিচারার্থ রাখিয়া আর সকলের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার করেন; মোকদ্দমায় ইহাদের কঠোর দণ্ড হয়, কিন্তু হাইকোর্টে ইহারা নির্দ্দোষী প্রতিপন্ন হন। ইহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল সন্তোষের বাড়ীতে তাজা বোমা পাওয়া গিয়াছে, আর ইহারা সকলেই ষড়যন্ত্রের মধ্যে ছিল। মোকদ্দমা ফাঁসিয়া যাওয়ার কারণ, রাখাল নাহা নামক একটি গোয়েন্দা সাক্ষী দেওয়ার সময় সব কথা অস্বীকার করিয়া পুলিসের শেখানো মত সাক্ষী দিয়াছে বলিয়া স্বীকারোক্তি করে। সাক্ষী সাবুতের মধ্যে আরও অনেক গলদ্ ছিল। সুস্পষ্ট-ভাবে জানা যায় যে ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মৌলবী মজরুল হক্ সাক্ষী তৈয়ার করিয়া অনেক কথা সাজাইয়াছে। কার্য্যকালে পুলিস কর্ত্তৃক বোমাটি সন্তোষের বাড়ীতে লুকাইয়া রাখা হইয়াছে, সন্তোষের পিতা প্যারীমোহন দাসের বাড়ী অন্যায় ভাবে খানাতল্লাস হইয়াছে, তাহার বৃদ্ধা স্ত্রী বসন্তকুমারী অন্যায় মত ভাবে নিগ্রিহীতা হইয়াছেন, প্রভৃতি কথা প্রমাণিত হয়। অতঃপর প্যারী-মোহন বাবু, ওয়েষ্টন, মজরুল হক্ এবং ইন্‌স্পেক্‌টার লালমোহন গুহের নামে একটি ক্ষতিপূরণের দাবীতে হাইকোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। অরিজিনাল কোর্টের জজ ফ্লেচার সাহেব প্যারীমোহন বাবুর পক্ষেই ডিক্রী দেন। কিন্তু আপিলে জাষ্টিস উড্রফ ও সঙ্গী অন্য একজন জজ সহ এই ডিক্রি রদ্ করিয়া দেন। এই বসন্ত কুমারী ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ আইনজীবি স্তার রাসবিহারী ঘোষের মাতৃস্বসা।

মোকদ্দমায় ওয়েষ্টন সাহেবকে হত্যার ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে প্রমাণ থাকে। মেদিনী-পুরের বিখ্যাত মেদিনীবান্ধব পত্রিকায় সম্পাদক দেবদাস করণের সম্পাদকীয় মন্তব্য সরকার আপত্তিজনক বিবেচনা করিতেন। 'বর্ত্তমান রাণনীতি' এবং 'মুক্তি কোন পথে' প্রভৃতি পুস্তকেরও বহুল প্রচার ছিল। এতদ্ব্যতীত জাতীয় পতাকা ও নিশান মেদিনীপুরে স্বদেশীর সময় হইতেই প্রচলিত ছিল। তবে ঐ মোকদ্দমার পরে এবং সত্যেন্দ্র, ক্ষুদিরাম প্রভৃতির ফাঁসির পরে, বিপ্লব আন্দোলন সম্বন্ধে বেশী কিছু শুনা যাইত না। কুড়ি বৎসর পরে আবার ১৯৩০ সালের লবন আন্দোলন দমন করিবার জন্য সরকারী কর্ম্মচারী ও পুলিসের লোক ভীষণ অত্যাচার করিতে থাকে এবং দাসপুরে যখন সেই অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়, বিপ্লব আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠে এবং গুপ্ত সমিতি বেশ সক্রিয় হইয়া দেখা দেয়। পেডি সাহেব বেশ কাজের লোক ছিলেন। রাতারাতি গভর্ণমেণ্ট হইতে টাকা মঞ্জুর করাইয়া লইয়া লোকের অসুবিধা নিবারণ করিতেন। সত্যাগ্রহ দমন কল্পে পুলিস কখনও তাহার নির্দ্দেশে কখনও বিনা নির্দ্দেশে যে অত্যাচার করে লোকে তাহাকেই এইজন্য দায়ী করে। পেডি-নিধন এই ষড়যন্ত্রের ফলেই সাধিত হয়।

১৯৩১ সালের ৭ই এপ্রিল মেদিনীপুর কলেজে যে শিক্ষা প্রদর্শনী হয় তাহাতে পেডি আহত হইয়া পার্শ্বের ঘরে পলাইয়া যায়। তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আততায়ী পলাইয়া গিয়াছিল, পরে সন্দেহ করিয়া বিমল দাশগুপ্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহার বিচার হয় হাইকোর্টে। বিচারপতি পিয়ারসন, এস, কে ঘোষ ও মল্লিক সাহেব তাহাকে খালাস দেন।

ডগলাস নিধন

অতঃপর পালা আসিল ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ডগলাসের। ইহার সম্বন্ধে পূর্ব্বে কিছু বলা হইয়াছে। এবং হিজলী হত্যাকণ্ডের যখন অনুসন্ধান কমিটি হয়, তখন

সেই কমিটির অধিবেশনে ইহার উপস্থিতি স্বদেশীয়গণের পক্ষ হইতে বড়ই আপত্তিকর মনে হইয়াছিল। তারপরে আসে ১৯৩২ সালের আন্দোলন—যখন মহাত্মা প্রমুখ সব দেশ-নেতাগণ জানুয়ারী মাসের গোড়ায় ধৃত হন। সেই সময় মেদিনীপুরেও আন্দোলনের তীব্রতা খুব বাড়ে। ধরপাকড় প্রভৃতির জন্য এই আর, কে ডগলাসকেই দায়ী করা হয়। ডগলাস সাহেব (R. K. Doglus) আবার পেডির মত ছিল না। সে চব্বিশ ঘণ্টা প্রায় মদে বিভোর হইয়া থাকিত। যাহাহউক ৩০শে এপ্রিল ১৯৩২, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সভা হইতেছে মিঃ ডগ্‌লাস চেয়ারম্যান। তিনজন যুবক অতর্কিতে আসিয়া রিভলভারের সহায়তায় ডগলাসকে গুলি করে। ইনি সেখানেই ঢলিয়া পড়েন। কুড়ি বছরের ছেলে প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য্য পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে দৌড়াইয়া যায়। চারিদিকে লোক দেখিতে পাইয়া ঝোপের মধ্যে লুক্কায়িত হয়।

প্রথমে সকলেই যেন বজ্রাহত, তারপরে প্রদ্যোৎকে খুঁজিয়া ধরিয়া ফেলে, কিন্তু অন্য দুইজনের কোন সন্ধান হয় না।

প্রদ্যোৎ থানায় আসিয়া অসহ্য গরম বোধ করায় তাহাকে স্নান করাইয়া নূতন কাপড় পরাইয়া দেওয়া হয়। তারপরে সে অবিশ্রান্ত ঘুমাইয়া পড়ে। তদন্তকারী পুলিসকর্ত্তা তাহার প্রতি আদর আপ্যায়নে কোন ত্রুটি প্রদর্শন করে নাই।

ঘটনা সম্বন্ধে তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে নির্ব্বাকই থাকিত তাহার সঙ্গীদের সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন করিয়াও কেহ কোন উত্তর পায় নাই। জিজ্ঞাসিত হইলেই প্রদ্যোৎ উত্তর করে—

"আপনারা পরে সবই জানিতে পারিবেন, আমার কাছে কোন কথা পাবেন না।"

প্রদ্যোতের দৃঢ়তায়ই ষড়যন্ত্রের বিন্দুমাত্র সন্ধান কেহ পাইতে সক্ষম হইল না। অতঃপর যথেষ্ট অত্যাচারও হইয়াছিল। অনেকে ধরা পড়িল, প্রদ্যোতের অপর জ্যেষ্ঠ সহোদর শর্ব্বরীভূষণও ধরা পড়িয়াছিল। কিন্তু পুলিশ কোন হদিস্ পায় নাই। যে ট্রাইবুন্যালে তার বিচার হয়, উহার প্রেসিডেণ্ট ছিলেন মিঃ কে, সি,

নাগ, মিঃ ভূজগেন্দ্র মুস্তাফি ও জ্ঞানাঙ্কুর দে আই সি এস। শ্রীযুক্ত নিশীথচন্দ্র সেন ও বীরেন্দ্রনাথ শাসমল প্রদ্যোতের পক্ষ সমর্থন করেন। প্রদ্যোতের বিরুদ্ধে অভিযোগ—খুনের ষড়যন্ত্র করা, ও খুনের সহায়তা করা দঃ বিঃ ৩০২। ১২০ বি ও ৩০২।৩৪ ধারার জন্য। ৩০২ দঃ বি ধারায় জন্য নহে।

২৬শে জুন প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য্যের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। মিঃ জ্ঞানাঙ্কুর দে প্রাণদণ্ড না দেওয়ার পক্ষে ছিলেন। বাকী দুইজন একদিকে থাকায় প্রাণদণ্ডের আদেশই বলবৎ থাকে। হাইকোর্টেও কোন প্রতীকার হয় নাই। বিচার করিয়াছিলেন মিঃ জাষ্টিস চারুচন্দ্র ঘোষ ও মিঃ জ্যাক্। হাইকোর্টে প্রদ্যোতের পক্ষে শ্রীযুক্ত নিশীথ সেন ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুপ্ত সওয়াল জবাব করেন। প্রদ্যোতের রিভলভার খারাপ হইয়াছিল, কোন লক্ষ্যভেদই হয় নাই। মৃত্যু যে প্রদ্যোতের গুলিতে হয় নাই— তাহা বেশ প্রমাণিত হইয়াছে।

প্রদ্যোতের চেহারা বড় সুন্দর ছিল। তাহার নির্লিপ্ত ভাব দেখিয়া শত্রুপক্ষও মনে করিত যে ভগবানে যেন সে তন্ময় হইয়া রহিয়াছে। কোনদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ ছিলনা—তবে ভাবনা ছিল মায়ের জন্য। মায়ের কথা মনে করিতে তাহার চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠিত। সে অতিশয় মাতৃভক্ত ছিল। তার মায়ের নাম ছিল পঙ্কজিনী দেবী। প্রদ্যোৎ মেদিনীপুর কলেজে পড়িত। সে অতি সুন্দর ইংরাজী বলিতে পারিত। তার পরোপকার বৃত্তি খুব প্রবল ছিল।

যে দিন ফাঁসির আদেশ হয়, তাহার দুইদিন পরে পরপর ২৮শে ২৯শে জুন অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে খুব বলিষ্ঠ মন্তব্য প্রকাশ কবা হয়। ইহাতে উক্ত পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রকাশকের শাস্তি হয়।

প্রদ্যোতের মাতা পঙ্কজিনী দেবী গভর্ণমেণ্টের কাছে Mercy Petition করেন। কিন্তু কোন ফল হয় না। গভর্ণমেণ্ট ২৮শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ফাঁসি মুলতুবি রাখেন। তারপরও কয়েকদিন চলিল। কিন্তু একে বালক, তারপরে তার গুলিতে মৃত্যু হয় নাই, তাহার দ্বীপান্তর শাস্তি হওয়াই ন্যায়সঙ্গত ছিল।

অতঃপরে ১৯৩৩, ১২ই জানুয়ারী তারিখে প্রদ্যোতের পবিত্রাত্মা দেহ পিঞ্জর

হইতে উড়িয়া যায়। মশানের দৃশ্য বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। প্রদ্যোৎ ভোরে চারিটার সময়ে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে কপালে ফোঁটা পরিয়া পূজা পাঠ সাঙ্গ করিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছে, আর জেলের লোক্ আসিয়া নির্দ্ধারিত স্থানে যাইতে তাহাকে সঙ্কেত করিল। প্রদ্যোৎ যেন প্রস্তুত হইয়াই ছিল। সে ধীর অথচ দৃঢ়ভাবে যথাস্থানে গমন করিল এবং নির্ভয়ে মঞ্চের উপর উঠিল। ম্যাজিষ্ট্রেট বার্জ্জ সাহেব **J. E. J Burge** জিজ্ঞাসা করিল—"**Are you ready, Prodyot ?**" তুমি কি প্রস্তুত, প্রদ্যোৎ ?

প্রদ্যোৎ অঙ্গুলী নির্দ্দেস করিয়া ধীর ভাবে উত্তর করে "**one minute please, Mr. Burge,** আমার কিছু বলিবার আছে।"

বার্জ্জ সাহেব অনুমতি দিলেন। প্রদ্যোৎ ধীর ও অনুত্তেজিত ভাবে বলিল—

"মিঃ বার্জ্জ, মেদিনীপুরে কোন শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিষ্ট্রেট আর থাকিতে পারিবে না। তোমারও আহ্বান আসিয়াছে, প্রস্তুত হও। আর তোমাকে আর এক কথা বলি, মৃত্যুতে আমার কোন ভয় নাই, এক প্রদ্যোৎ যাইতেছে, আবার বাঙ্গলার মাটিতে শত শত প্রদ্যোৎ জন্মগ্রহণ করিবে। আমার প্রতি শোণিত-বিন্দুতে বহু প্রদ্যোতের উদ্ভব হইবে—আপনার কাজ—আদেশ প্রদান করুন—আমি প্রস্তুত—'

' We are determined, Mr. Burge, not to allow any European to remain at Midnapur. Yours is tho next turn, get yourself ready.

—"I am not afraid of death. Each drop of my blood will give birth to hundreds of Prodyots in all houses of Bengal. Do your work, please."

প্রদ্যোৎ দড়ি পরিল, কাষ্ঠ অপসারিত হইল, তাহার দেহ ঝুলিতে লাগিল—কিন্তু মুখের পবিত্র ভাবটি তখনও বিলীন হয় নাই। বার্জ্জ সাহেব বিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। ঘটা করিয়া মেদিনীপুরের লোক তাহার শ্রাদ্ধকার্য্য সমাপন করে।

বার্জ্জ হত্যা

প্রদ্যোতের সতর্কবাণী কার্য্যে পরিণত হয়। মেদিনীপুরের ন্যায়বান ম্যাজিস্ট্রেট বার্জ্জ সাহেবও (Burge) ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নিহত হন। টাউন ক্লাবের সঙ্গে মহমেডান ক্লাবের একটি ম্যাচ খেলা হয়। বার্জ্জ সাহেব টাউন ক্লাবের তরফে খেলেন। সেইখানে বার্জ্জ সাহেবকে কয়েকজন যুবক মিলিয়া রিভলভারের গুলিতে মারিয়া ফেলে। অনেক সরকারী কর্ম্মচারী খেলা দেখিতে উপস্থিত ছিলেন—তাহাদের দেহরক্ষী আসিয়া পড়ে এবং আক্রমণকারীদের দুইজনকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলে—তাহাদের নাম অনাথবন্ধু পাঞ্জা ও মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত। আর যাহারা তাহাদের সঙ্গী ছিল। দৌড়াইয়া পলাইয়া যায়। গুলির শব্দে অনেকেই পালায়, তন্মধ্যে অনেক নির্দ্দোষী লোকও ছিল।

ইহার পর সহরে ধর পাকড়ের হিড়িক পড়িয়া যায়। একে মেদিনীপুরে সামরিক পুলিস বাহিনী ছিল, তার উপরে সেখানকার পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ইভানসও একটু মিলিটারী ধরণের লোক ছিল। মিলিটারী পুলিসের হাতে কাহারও নিস্তার, ছিলনা। কত নির্দ্দোষী লোক প্রহৃত হয়, গুণিয়া শেষ করা যায় নাই। খানা তল্লাস, মারপিট, গ্রেপ্তার ও অত্যাচারে মেদিনীপুরের লোক অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল, অনেকে সহর ছাড়িয়া পলাইল। কিন্তু অন্য কোন আসামী বা ষড়যন্ত্র-কারী কেহই ধৃত হইল না। সহরে অসম্ভব নীরবতা লক্ষিত হইল। ইভান্সের চেষ্টা ব্যর্থ হইল, তাহার মিলিটারী ধরণ ধারণে আরও অশান্তি বৃদ্ধি পাইল। "একা রাম রক্ষা নাই সুগ্রীব দোসর।' মিলিটারী কর্ণেল বলিতে লাগিল "আমাকে ক্ষমতা দাও, আমি মেদিনীপুর সহর উড়াইয়া দিই।" এবার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট আসিল মিঃ গ্রিফিথ্‌স্‌।

সাহেবরা যখন পারিলনা, তাদন্তের ভার পড়িল বাঙ্গালী ডি, এস, পির উপরে। যখন সর্ব্বত্র নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল তদন্তকারী কয়েকজন গোয়েন্দা

লাগাইয়া সংবাদ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গোয়েন্দা-দের উপরে নির্দ্দেশ ছিল, তাহারা পাড়ায় পাড়ায় কথাগুলি কেবল শুনিয়া আসিবে, আসিয়া বিবৃতি দিবে, কিন্তু যে সব স্থানে যাইবে কোন রকম প্রশ্নাদি করিবেনা। তদন্তকারী আসামীর খবর দাতাকে ২৫০০ টাকার পারিতোষিক ঘোষণা করিলেন। পরে সেই টাকা ৫০০০, ও ক্রমে দশ হাজারে উঠিল। কিন্তু কোন সংবাদ আসিল না। নিকটে একটি রেঁস্তোরা ছিল, সেখানকার লোকদেরও সংবাদ সংগ্রহ করিতে নিয়োজিত করা হয়। টাকার লোভে অনেকে সংবাদ আনিল, কেহ কেহ মিথ্যা খবরও দিল। এক বৃদ্ধা তাহার পুত্রবধূ কি দেখিয়া আসিয়াছে বলে, কিন্তু পুত্রবধূকে সে পুলিস আদালতে কিছুতেই বাহির করিবেনা। এই খবর পাইয়া তদন্তকারী পুত্রবধূর সঙ্গে দেখা করিয়া সংবাদ সংগ্রহ করিল যে "একদিন সে পুকুরের ঘাটে জল আনিতে গিয়াছিল, তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে, কয়েকটী ছাত্রবাবু পরামর্শ করিতেছে, যে মাজিষ্টর সাহেবকে সরাইতে হইবে।" নিকটবর্ত্তী একটি গ্রামে একটি গোপন সভা হয়, এই সংবাদও পাওয়া গিয়াছিল। অতঃপর একদিন তুইটী যুবক রেঁস্তোরাতে আলাপ করিতেছে "সব কথা ফাঁক করে কিছু রোজগার ক'রে নেওয়া যাক্না, কেন?"

রেস্তোঁরার ম্যানেজারের নিকট হইতে ছোক্রা তুইজনের নাম ঠিকানা হইতেই তাহাদের সঙ্গে দেখা হইলে বুঝা গেল যে, উকীল যামিনী জীবন ঘোষের পুত্রদের অস্বাভাবিকভাবে উদ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া যাইতে তাহারা দেখিয়াছে। যামিনী-বাবু আমাদের মেদিনীপুরের বোমা ষড়যন্ত্রের (১৯০৮) মোকদ্দমার আসামী যোগ-জীবন ঘোষের জ্যেষ্ঠ সহোদর। তাঁহার পুত্র নির্ম্মল জীবন কোন কথা বলে নাই—অপরটি আগাগোড়া সব কথা প্রকাশ করিয়া দিল। ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছেও সে স্বীকারোক্তি বহাল রাখে এবং মোকদ্দমায় রাজ-সাক্ষী হয়। তাহার সাক্ষ্যে বুড়ীর বধূর ঘাটের বৈঠকের কথা প্রকাশ পায় এবং গ্রামের গুপ্ত সভার কথারও সমর্থন হয়। মোকদ্দমার বিচার যে ট্রাইবুন্যাল করে, উহার প্রেসিডেণ্ট হয়, জজ মিঃ ওয়েইট্। আসামীদের পক্ষ সমর্থন করেন শ্রীযুক্ত নিশীথ সেন, বি, এল

শাসমল, জে, সি গুপ্ত, সাতকড়ি পতি রায় ও সন্তোষকুমার বসু প্রভৃতি। প্রায় ১৫।২০ দিন শুনানীর পরে ট্রাইবুন্যানের বিচারে ব্রজ কিশোর চক্রবর্ত্তী, রামকৃষ্ণ রায়, নির্ম্মল জীবন ঘোষের ফাঁসির হুকুম হয়, সনাতন রায় প্রমুখ পাঁচজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। এই বার্জ্জ হত্যার ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় দেশীয় অনেকেরই বিশেষতঃ আইনজ্ঞদের বিশ্বাস, মোকদ্দমাটি সাজান। এপ্রুভার প্রাণভয়ে সাক্ষ্য দিয়া থাকে বলিয়া সমর্থন প্রমাণ আবশ্যক হয়। কিন্তু রেঁস্তোরার লোক ও বুড়ীর পুত্রবধূ যে সাক্ষ্য দেয় তাহা সমর্থন প্রমাণ নয়, বিশেষত্ত তাহারা টাকার লোভে সাক্ষ্য দিয়াছে। মোকদ্দমার অবস্থা ঘটিত প্রমাণ খুবই সন্দেহজনক। জুরীর বিচার হইলে এই আট ব্যক্তির কিছুতেই শাস্তি হইত না। তাহারা নিশ্চয়ই অব্যাহতি পাইতেন।

বার্জ্জের হত্যার পরে মেদিনীপুরে আর গুপ্ত আন্দোলন হয় না। তবে আগষ্ট আন্দোলনে (১৯৪২) মেদিনীপুরের কাঁথি ও তমলুক মহকুমায় যে গণ-জাগরণে হয়, বাঙ্গলাদেশের জাতীয় ইতিহাসে তাহার স্থান খুবই উর্দ্ধে। তাহা পরে বলিব।

বাঙ্গলার গভর্ণরের প্রতি আক্রমণ

১৯৩২ সিনেট হলে ৬ই ফেব্রুয়ারী কনভোকেসন বসিয়াছে। চ্যানসেলার স্যার ষ্টানলি জ্যাকসনকে শ্রী বীণা দাস বি, এ, গুলি করিবার চেষ্টা করিলে ধৃত হয়। ডক্টর হাসেন সুরাউর্দ্দি ছিলেন তখন ভাইস চ্যানসেলার। অতঃপর বীণাদাসের বাসা তল্লাস হয় এবং সেখানে কয়েকটি গুলি Cartridge পাওয়া যায়।

বিচারপতি চারুচন্দ্র ঘোষ, বিচারপতি মন্মথ মুখার্জ্জি ও মহিমচন্দ্র ঘোষের ট্রাইবুন্যালে বিচার হয়। বীণা অভিযোগ স্বীকার করে। ৩০৭ ধারা দঃ বিঃ ও অস্ত্র আইনের ১৯ এফ্ ধারায় তাহার নয় বৎসরের সশ্রম দণ্ড হয়। বীণার বয়স ছিল তখন ২১ বৎসর।

এই সময়ে কুমিল্লার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ষ্টিভেন্সকেও শান্তি এবং সুনীতি নামে কুমিল্লা কমরুন্নেসা গার্লস স্কুলের দুইটি ছাত্রী রিভলভারের সহায়তায় নিহত করে। বিচারে শান্তি এবং সুনীতি দুইজনেরই খুনের অপরাধে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়।

১৯৩২ তেজগাঁও ডাকাতি

১৯৩২—১৩ মে তারিখে তেজগাঁও ও ঢাকার মধ্যের ষ্টেসনের কাছেই একটি ডাকাতি হয়। তেজগাঁও ষ্টেসনে ক্ষেত্রমোহন সাহা ট্রাঙ্কে ১১০০০ টাকা লইয়া উঠে, সুরেন্দ্র কুলেন্দ্র শা আসে ২৫৫০০৲ টাকা নিয়া, রঘুবীর দয়াল ২১৫০৲ লইয়া। গাড়ি তেজগাঁও ছাড়িলে কয়েকজন ভদ্রলোক উঠিয়া টাকা নিয়া Chain ধরিয়া টানে। নীলক্ষেতের কাছে গাড়ী আসিলে টাকা নিয়া সটান তাহারা পলাইয়া যায়। আততায়ী রঘুবর সিংহকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলে।

বিচারে জ্যোতির্ম্ময় সেন গুপ্তের ৭ বৎসর কারাগার হয়। সে এম্, এ, পড়িত। সুধীর কুমার আচার্য্য হয় এপ্রুভার। বীরেন্দ্রচন্দ্র দে মুক্তি পায়, কিন্তু অর্ডিনান্সে তাহাকে আটক রাখা হয়। বীরেন্দ্রের পক্ষ সমর্থন করেন শ্রীযুক্ত শ্রীশ চট্টোপাধ্যায়। স্পেসাল জজ মিঃ এ, এন সেন বিচার করেন। উকীল প্রফুল্ল গুপ্তের ছেলে খালাস পায়।

ঢাকা চন্দ্রকুঠীতে ডাকাতি

১৯৩২ এর ৭ই সেপ্টেম্বর ঢাকা ষ্টেসন রোডে, ষ্টেসনের দক্ষিণ দিকে বরদা কান্ত চৌধুরীর চন্দ্রকুঠীতে ডাকাতি হয়। টাকা বেশী যায় নাই। বরদাবাবু পূর্ব্বে কণ্ট্রাকটারের কাজ করিতেন, তাহার নিবাস বিক্রমপুর চুড়াইন। ভূপেশ, প্রশান্ত এবং অধীরের বিরুদ্ধে চার্জ্জ হয়, ভূপেশের জেল হয় ১০ বৎসর প্রশান্ত ও অধীরের ৭ বৎসর।

ময়মনসিংহ ডাকাতি

২৯মে ১৯৩২ ময়মন সিংহ কমলপুর কিশোরমোহন বণিকের বাড়ী ডাকাতি হয়। যুগান্তর দল ৪০০০৲ নিয়া যায়—নিম্নলিখিত আসামীগণের শাস্তি হয়—

১০ বৎসর—

১। মণীন্দ্র সেন ২। বীরেন্দ্র লাহিড়ী ৩। সুধাংশুকিরণ লাহিড়ী

৭ বৎসর—

৪। ভুবনমোহন চন্দ্র, ৫। জানকীমোহন দাস, ৬। হরিপদ চক্রবর্ত্তী, ৭। প্রকাশচন্দ্র শীল, ৮। ইন্দভূষণ দাস, ৯। শ্রীধর গোস্বামী, ১০। হেমচন্দ্র দত্ত, ২১। ধরণীমোহন বণিক, ১২। দীনেশ বণিক, ১২। দীনেশ সাহা, ১৪। যোগেন্দ্র চন্দ্র।

ঢাকায় মাজিষ্ট্রেট কামেখ্যা সেনের হত্যা

১৯৩২ সালের ২৭ জুন তারিখে সবডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট কামেখ্যা প্রসাদ সেনের খুন ঢাকা জিলার অন্যতম প্রধান ঘটনা। ১৯৩২ সালের সত্যাগ্রহ আন্দোলনে ঢাকার বিক্রম পুরস্থ স্ত্রীপুরুষ মনপ্রাণে যোগদান করেন। আশী বৎসর বৃদ্ধা মহিলা পুত্র পুত্রবধূ, নাতি নাত্নি লইয়াও বিশেষ উৎসাহের সহিত এই আন্দোলনে যোগদান করিয়াছেন। সভায় স্ত্রীলোকদের উৎসাহ এবার বরং অনেক বেশী ছিল। যুবক প্রৌঢ়দের মধ্যেও অনেকে ছিল। বিক্রমপুরের এই আন্দোলন দমন করিবার জন্য কামেখ্যা সেন সব ডেপুটি স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত হন। তখন মুন্সীগঞ্জের মহকুমা হাকিম ছিলেন শ্রীকালীপদ মৈত্র। কামেখ্যাবাবু তাহার আসিষ্টাণ্ট হইয়া তাহার কার্য্যে সহায়তা করেন।

কামেখ্যাবাবুর বাড়ী ছিল বেলতলী গ্রামে—তালতলার দিকে। আন্দোলনের তীব্রতা ছিল খুব বেশী তালতলা, আউট্‌ সাহি, মালখানগর, মধ্যপাড়া প্রভৃতি গ্রামে। সভা, শোভাযাত্রা, বিলাতি বর্জ্জন প্রভৃতির খুব প্রাবল্য ছিল। ইনি আন্দোলন দমন করিতে লোকদিগকে কেবল গ্রেপ্তার করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, গাত্রে হস্ত প্রয়োগ এবং লাঠি চালাইবার ব্যবস্থাও করিতেন। স্ত্রীলোকদের প্রতি অপমান ও অসৌজন্য জনক ব্যবহারে লোকের মন তিক্ত হইয়া উঠিল।

ক্রমে কামেখ্যাবাবুর ব্যবহার এতই অপ্রীতিকর হইয়া উঠিল যে উপরওয়ালা-দের তাহার জীবন সম্বন্ধে আশঙ্কা হইল। তাহাকে সকলে ছুটি লইয়া স্থানত্যাগ করিতে উপদেশ দেন। ছুটির দরখাস্ত করিতেই তাহা মঞ্জুর হইল। কিন্তু বেতন লইবার জন্য তাহাকে একবার ঢাকা সদরে আসিতে হয়। এবং ইহাই তাহার শেষ আসা হইল।

কামেখ্যাবাবু ২৩শে জুন ঢাকায় আসিয়া ঢাকার সদর মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীশচীন্দ্রনাথ চাটার্জ্জির বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। শচীনবাবু ওয়ারী র‍্যাঙ্কিন ষ্ট্রীটে থাকিতেন।

পরদিন শচীনবাবু, কামেখ্যাসেন, এস, এম বসু মিলিয়া মুকুল থিয়েটারে বায়স্কোপ দেখিতে যান। শচীনবাবু আগেই চলিয়া আসেন। অপর দুইজন থাকিয়া যান। অতঃপর তাহার বাসায় রওনা হইলে, কাহারা পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহাদের অনুসরণ করিয়াছিল কামেখ্যাবাবু দেখিতে পান নাই।

ওয়ারীর বাসায় নীচতলায় যে ঘরটিতে কামখ্যাবাবুর শয়নের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল উহার পূর্ব্বদিকে জানালার শিকগুলি না থাকায় জানালা দিয়া লোকের ঘরের মধ্যে আসা অসম্ভব ছিল না। শচীন্দ্রবাবু তাহাকে জানালা বন্ধ রাখিতেই বলিতেন, কিন্তু কামেখ্যাবাবু না মানিয়া গরমের জন্য খুলিয়াই রাখিতেন।

২৫শে মে ও ২৬শে তারিখে কামেখ্যাবাবু বাইসেকেলে করিয়া বাহিরে যাইতেন। সঙ্গে গার্ড লইয়া যাইতেন না।

২৬শে রবিবার বলিয়া কামেখ্যাবাবু অনেক জায়গায় দেখা করিতে যান। তারপর খাওয়া দাওয়ায় পরে ঐ ঘরেই শুইয়া থাকেন।

রাত্রি চারিটার সময় শচীনবাবুর সন্দেহ হওয়ায় চাকর মহেন্দ্রকে ডাকেন। তারপরে স্ত্রী ও ছেলে নিয়া কামেখ্যাবাবুর ঘরে গিয়া দেখিতে পান দক্ষিণ দিকের মশারী উঠানো রহিয়াছে, আর ঘরে বারুদের গন্ধ বাহির হইয়াছে। শচীনবাবু দেখিতে পান কামেখ্যাবাবুর শরীরে দক্ষিণ ভাগে কতকগুলি গুলির দাগ রহিয়াছে, আর অজস্র রক্ত পড়িতেছে। ডাকাডাকিতে লোকজন আসিয়া পড়িল এবং কাছেই ধলার (ময়মনসিংহ) জনৈক জমিদার যোগেশ চক্রবর্ত্তী সূত্রাপুর থানায় ফোন করিয়া দেন। পুলিশ আততায়ীর কোন সন্ধান পায়না, তবে সেই যুবক নিজেই তাহার সন্ধান করিয়া দেয়।

২৭শে জুন বেলা দুইটার সময় মনোরঞ্জন নামক একব্যক্তি একখানি টেলি-গ্রাফের ফর্ম্ম লইয়া আফিসে যায়। টেলিগ্রাম খানি ইছাপুর "সারদা মেডিকেল হলে"র সুরেশ গাঙ্গুলীর নামে লেখাছিল। সংবাদ ছিল এই—

Kameksha's operation Successful. No anxiety টেলিগ্রাম খানি পর্ত্তুগীজ রোজারিও কেরাণীর কাছে দেওয়া হইলে সে রায় সাহেব জ্ঞানচন্দ্র সিংহকে দেয়। জ্ঞানবাবুর ফোন পাইয়া ইনস্পেক্টর তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসে। মনোরঞ্জনকে নিয়া নানাস্থানে গিয়া কালীপদ চক্রবর্ত্তী নামক ১৯ বৎসরের যুবককে ধরিয়া ফেলে। এই সময়ে মধ্যপাড়া গ্রামস্থ হেডমাষ্টার সুরেন্দ্র সেন মিটফোর্ড হাসপাতালে ছিলেন। তাহাকে হার্ণিয়ার জন্য অস্ত্রোপচার করা হয়। উত্তরে বলা হয় ইহার সম্বন্ধেই বলা হইয়াছিল। কিন্তু সুরেনবাবুর ইহার সঙ্গে পরিচয় ছিল না।

কালীপদকে যখন যে ঘরে খুন হয়, সেখানে লইয়া যাওয়া হয়, সে কাঁপিতে কাঁপিতে অতঃপরে কাঁদিয়া ফেলে। কালীপদ একটী স্বীকারোক্তি করে। তাহাতে বলে "আমার দেশের স্বার্থেই আমি কামেখ্যাকে গুলি করিয়াছি। সে স্ত্রীলোক-দের প্রতি অত্যাচার করিত, ইহাতে আমি বড়ই ব্যথা পাই। এই খুনের জন্য আমি একাই দায়ী, অন্য কেহ নহে। কোন সন্দেহের উপরে নির্দ্দোষী ব্যক্তিগণকে

অকারণে ধরিয়া অত্যাচার করা হইতেছে বলিয়া আমি স্বীকারোক্তি করিলাম। আমাকে কেহ শিখাইয়া দেয় নাই।"

Automatic Pistol দিয়া খুন করিয়াছে বলে কিন্তু উহা যে কাহার এবং কোথায় পাইল তাহা বলেনা। ৮ই নভেম্বর তারিখে কালীপদর উপরে প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। সে নির্ভীকভাবে দণ্ড গ্রহণ করে।

২২শে জানুয়ারী (১৯৩৩) কালীপদর মা শৈলবালাকে জানাইয়া দেওয়া হয় যে কোনরূপ অনুকম্পা প্রদর্শন করা হইবে না। যথা সময়ে তাহার ফাঁসি হইয়া যায়।

ষ্টেটস্‌ম্যান সম্পাদকের প্রতি

ষ্টেটসম্যান সংবাদ পত্রের সম্পাদক ওয়াটসনের উপর প্রথম আক্রমণ হয় ১৯৩২ সালের ৫ই আগষ্ট। [illegible] যখন চৌরঙ্গী রোড্ দিয়া যাইতেছিলেন একটি যুবক ফুটবোর্ডে উঠিয়া জানালা দিয়া গুলি করে, কিন্তু গুলিটি কাণের পাশ দিয়া যায়। আফিসের দরওয়ান তৎক্ষণাৎ লোকটিকে ধরিয়া ফেলে এবং একজন কনেষ্টবল আসিয়া পড়ে। ধস্তাধস্তিতে লোকটি পোটাসিয়াম সায়ানাইড খাইয়া আত্মহত্যা করে।

দ্বিতীয়বার ওয়াট্‌সনকে হত্যার চেষ্টা

কিছুদিন পরে পুনরায় ২৮শে সেপ্টেম্বর ওয়াটসন সাহেব যখন মোটরে করিয়া অপরাহ্ণ ৬টার সময় আপিস হইতে বাহির হইয়া অকটারলনী মনুমেণ্ট, ইডেন গার্ডেন ও ষ্ট্রাণ্ডরোড হইয়া ষ্ট্রাণ্ডরোড ও নাপিয়ার রোডের মোড়ে আসেন, গাড়ীটা একটু আস্তে আস্তে চলিতে থাকে। গাড়ীর হুড খোলা ছিল। ঠিক সেই সময় পেছন দ্বইতে একখানি মোটর সম্মুখে আসিয়া পড়ে ও একটী যুবক গাড়ীর জানালা

দিয়া গুলি ছুড়ে। ওয়াটসনের ষ্টেনোগ্রাফার মিস্ গ্রস্ সঙ্গে ছিল, সে বিশেষ ক্ষিপ্রকারিতার সহিত তাহাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করে, ওয়াটসনকে নীচে (পাদানীতে) ঠেলিয়া দিয়া নিজে তাহার উপরে বসে। সার্জ্জেণ্ট কার্স আসিয়া বন্দুক ছুড়ে ও আততায়ীরা পলাইয়া যায়। ওয়াটসনের তিনটি বুলেটের (গুলির) আঘাত মিস গ্রসের বাম হাতে একটি আঘাত লাগে আর মোটর চালক দেওয়ান সিংয়ের গায়েও একটি গুলির আঘাত লাগে।

আক্রমণকারীদের মোটর ৭টার সময় মাজারহাটে বুড়োশিবতলায় আসে। সেখান হইতে চারিজন পলাইয়া যায়। দুইজন গুলির আঘাতে মৃতাবস্থায় পড়িয়া থাকে। আর একটি যুবকও আহত হয়, কিন্তুপ্রমোদ নামক অপর যুবকের সহায়তায় রক্ষা পায় ও তাহার কাপড়-চোপড় বদলাইয়া দেওয়া হয়। যে দুইজন মারা যায় তাহাদের নাম ননী লাহিড়ী ও কালীঘাট হালদার পাড়া রোডের গোপাল চৌধুরী।

ওয়াটসন সাহেবকে প্রেসিডেন্সী জেনারেল হ[illegible]তালে স্থানান্তরিত করা হয়, ক্রমে সেখানে আরোগ্যলাভ করিয়া উঠেন।

আলীপুর স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে ৩।৪ জনের কঠোর শাস্তি হয়। অতঃপরে আপিল হয় চীফ জাষ্টিস ও বিচারপতি আমিরালির আদালতে। সুনীল চ্যাটার্জ্জির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর এবং প্রমোদরঞ্জন বসুর দশ বৎসরের জেল তাঁহারা বহাল রাখেন।

গ্রাসবিকে আক্রমণ

১৯৩২ সালের ২৮শে আগষ্ট ৫॥টার সময় ঢাকার অতিরিক্ত পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গ্রাসবি **C. M. Grassby** নবাবপুর রোড্ দিয়া নিজের বাঙলোতে যাইতেছিলেন, এমন সময় তাহাকে একজন গুলি করে। **Grassby** আহত হয়। আসামী দৌড়াইয়া যাইতেছিল কিন্তু তাহাকে ধরিয়া ফেলা হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং

কলেজের মিঃ বি, সি, গুপ্ত আসিতেছিলেন তিনি তাহাকে পটি বাঁধিয়া যথাস্থানে রাখিয়া চলিয়া যান। অতঃপর বিনয়ভূষণ রায় ধরা রড়ে। জজ্ মিঃ এ, এন সেন এর সভাপতিত্বে ট্রাইবুন্যালের বিচারে বিনয়ের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়।

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল আসামীদের জন্য সওয়াল জবাব করেন।

গ্রাসবীর উপরে বিপ্লবীরা বিশেষ অসন্তুষ্ট ছিল।

১১ই জানুয়ারী (১৯৩২) ভূপতি দাসের গদি হইতে কিছু টাকা লুট হয়। ডিষ্ট্রীক্ট ইন্‌স্পেকটার অব স্কুলস্ ক্ষীরোদ রায়ের মুন্সীগঞ্জস্থ বাসা হইতে বিনয়ভূষণ দত্তকে ধরিয়া আনা হয়। আরও দুইটি ছেলেকে ধরে, একজনের নাম হরেন্দ্র দাস (সোনারঙ্গ স্কুলের ছাত্র) আর একজন স্বদেশভূষণ দাস। ইহারা নাকি তেলিরবাগ সশস্ত্র ডাকাতিতে ছিল।

কুমিল্লা জিলার কালীগঞ্জ গ্রামে গুপ্তচর হত্যার ষড়যন্ত্র ও ইটাখোলা ট্রেণ লুঠ মামলায় বিরাজ দের মোট ৪৫ বৎসর দণ্ড হয়।

ভিলিয়ার্সের উপরে আক্রমণ

১৯৩২ সালের ২৯শে অক্টোবর ইউরোপীয় এসোসিয়েসনের প্রেসিডেণ্ট মিঃ ই ভিলিয়াস্‌কে বেলা ১১॥ টার সময়ে একজন যুবক গিলেণ্ডার হাউসের উপরতলায় গুলি করে। ভিলিয়ার্স ৮০ নম্বর ক্লাইভ ষ্ট্রীটে মেসার্স লকহার্ট, মেলেঞ্চানও মুলকের সঙ্গে কথা বলিতেছিল। আসামীর একটি Fez Gap ছিল, কোট ও ট্রাউজার পরণে ছিল, আক্রমণকারীকে কয়জন সাহেব মিলিয়া ধরিয়া ফেলে।

আসামীর নাম বিমল দাশগুপ্ত। বরিশাল জিলার বাসন্তা ঝালকাটির অক্ষয় দাশগুপ্তের পুত্র। অক্ষয় বাবু মেদিনীপুরে শিক্ষকতা করিতেন।

মেসার্স বার্টলি, এন কে বসু এবং প্রফুল্ল ঘোষের ট্রাইবুন্যালে বিচার হয়।

৩১শে অক্টোবর হইতেই বিচার আরম্ভ হয় এবং ১২ই নভেম্বর বিমল

দাশগুপ্তের ১০ বৎসর জেল হয়। এই বিমল দাশগুপ্তই পেডির খুনের জন্য ধৃত হইয়া খালাস পায়।

আসামী জবাবে বলে যে "হিজলী এবং চাটগাঁয়ে এত অত্যাচার ও পীড়ন হইয়াছে তাহা কেবল ইউরোপীয়দের আন্দোলনের ফলেই হইয়াছে। আমি উক্ত অনাচারের প্রতিশোধ লইতে এই কাজ করিয়াছি।"

এই মোকদ্দমায় চট্টগ্রামের সন্তোষ গুহ ও মনোরঞ্জন চৌধুরী, শ্রীহট্টের সত্যব্রত সেন ও ময়মনসিংহের আনন্দ মজুমদারের নামে ওয়ারেণ্ট ছিল।

রাজসাহিতে জেল সুপারিণ্টেণ্ডের উপর আক্রমণ

১৯৩২, ২৮ নভেম্বর রাজসাহী সেণ্ট্রাল জেলের সুপারিণ্টেণ্ড **Charles Luke**কে রাস্তার পার্শ্বে গুলি করা হয়। সে তখন জেলের কমপাউণ্ড হইতে বাহির হইতেছিল। জেনারেল পোষ্ট আফিসের নিকটেই গুলি করা হয়। তাহাকে কলিকাতার হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

Act XII of 1932 Bengal Suppression of Terrorist Outrages Act. পাশ হইবার পরে, ১৯৩২ সালের ঘটনা—

৩০ এপ্রিল মেদিনীপুরের ডগলাস নিহত হয়। প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য্য ধৃত।

১৩ মে—ঢাকা ও তেজগাঁর মধ্যে রেলওয়ে ডাকাতি। ২৫৫০০ টাকা লুট।

২৯ মে—ময়মনসিংহ কমলপুরে ডাকাতি ৪০০ টাকা লুট।

জুন ১৩—ধলঘাটে কাপ্টেন ক্যামারণের সঙ্গে চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের যুদ্ধ।

২৭ জুন—কামেখ্যাপ্রসাদ সেন ঢাকায় নিহত।

৫ই আগষ্ট—ষ্টেট্‌স্‌ম্যান সম্পাদক ওয়াট্‌সনকে অতুল সেন কর্তৃক হত্যার চেষ্টা।

২৮ সেপ্টেম্বর—উক্ত সম্পাদকের প্রতি দ্বিতীয়বার আক্রমণ।

২৮ আগষ্ট—ঢাকায় পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গ্রাসবীর উপর আক্রমণ।

৭ সেপ্টেম্বর—ঢাকার ষ্টেসন রোডে ডাকাতি।

১৯৩৩ ফেব্রুয়ারী মাসে দিল্লী ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা ২১ মাস বসিবার পরে গভর্ণমেণ্ট আসামীদিগকে ছাড়িয়া দেয়। ইহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল ইহারা বিস্ফোরক পদার্থ তৈয়ার করে।

বেঙ্গল আর্ডিনান্সের ফলাফল

স্যার হেনরী হেইগ ১৯৩৩ এর ২রা ফেব্রুয়ারী বলেন—

Bangsl Criminal Law Amendment Act অনুসারে ১৯৩২ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় ১৩৪৮ জন ধৃত হয়। এতদ্ব্যতীত দেউলীতে ৯৮ জন এবং পাঞ্জাবেও একজন বন্দীভাবে ছিল। উক্ত তারিখ পর্য্যন্ত ৩৫ জন **State Prisoners** ছিল, তন্মধ্যে বোম্বাই প্রদেশের ২২ জন, পাঞ্জাবের ৭ জন, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ৪জন ও দিল্লীর একজন ছিল।

ঝাঁসির গজানন্দ ও সদাশিব পোদ্দার, দিল্লীর মাষ্টার হাবম্বারা, মাষ্টার হরকেশ ও ভগীরথকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কাশীর এম, এ উপাধিধারী বিদ্যাভূষণ ও খেয়াল রাম গুপ্তকে রাজবন্দী করা হয়। আর আট জনের বিরুদ্ধে দণ্ড বিধি আইনের ভিন্ন ভিন্ন ধারানুসারে বিচারের আদেশ হয়।

আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা

অতঃপর আমরা আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার কথা ও আসামীদের সম্বন্ধে কিছু বলিব। অনেক দিন হইতেই বাঙ্গলার নানাস্থান হইতে ধর পাকড় হয় এবং অতঃপরে ১৯৩৩ সালের ৭ই আগষ্ট তারিখে জিতেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং ৩৭ জন (মোট ৩৮ জন) আসামীর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি আইনের ১২১ ক(ষড়যন্ত্র) খুন ও ডাকাতির ষড়যন্ত্র ৩০২, ৩৯৫।১২০ বি, অস্ত্র আইন **Arms Act 19 and 20**), বিস্ফোরক আইনের (**Explosive Substances Act**) নানা

ধারায় অভিযোগ আনা হয়। আলিপুরে বিচার হয়, কমিশনার হন মিঃ টি, বি জেমসন, আই সি এস, মিঃ আর সি, সেন, আই, সি, এস, ও মৌলভী এম, ওয়াই, সিরাজী। পাব্‌লিক প্রসিকিউটার ছিলেন রায় বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আসামীর পক্ষে ছিলেন ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বি, কে, চৌধুরী; জে, সি, গুপ্ত এবং সঙ্গে কয়েকজন আলিপুরের উকীল। ৮ই আগষ্ট হইতে মোকদ্দমা আরম্ভ হয়।

১৪ আগষ্ট পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত এবং ভোলানাথ দাস নামক আরও দুইজন আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। পূর্ণানন্দের আত্মীয়বর্গের সঙ্গে লেখক পরিচিত ছিল। যে কারণেই হৌক পূর্ণানন্দ তাহাকে ডাকিয়া পাঠায়। কিন্তু অন্যকাজ থাকায় লেখক দীর্ঘকাল ব্যাপী তাহার পক্ষ সমর্থন করিতে না পারিলেও, মোকদ্দমা সম্বন্ধে সংবাদ রাখিত।

এই মোকদ্দমা বহুদিন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। রায় হয় প্রায় দুইবৎসর পরে—১লা মে ১৯৩৫। কিন্তু মোকদ্দমার উভয় পক্ষের সওয়াল জবাব শেষ হইবার পরেই কমিশনার রাখালচন্দ্র সেন ভয়ানক পীড়াগ্রস্ত হন ও ১৯৩৪ সালের ১২ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। অতঃপর ১৯৩৪ এর ১৪ ডিসেম্বর তাঁহার স্থানে মিঃ আর এচ্‌ পার্কার আই, সি, এস, কমিশনার নিয়োজিত হন। অতঃপর পুনরায় তিনি কয়েকজন সাক্ষী ডাকাইয়া তাহাদের বিবৃতি শুনিয়া লয়।

সরকার পক্ষের মোকদ্দমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই; আসামীরা রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিগ্রহের ষড়যন্ত্র করিয়াছে ও সেই অভিপ্রায়ে নানারূপ অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহে রত হইয়াছে। সাধারণতঃ হিজলী, বক্সা ও দেউলি বন্দীনিবাস (**Detention Camp**) হইতে কয়েকজন আসামী পলাইয়া বাঙ্গলা ও বর্ম্মাদেশে নানাস্থানে ষড়যন্ত্র করিয়া বেড়াইতেন। জিতেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৯৩২ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী বক্‌সা বন্দী নিবাস হইতে পলাইয়া এই সব কার্য্য করে, পরে গোয়েন্দা দারোগা উপেন্দ্র ঘোষ তাহাকে ষ্ট্রাণ্ডরোডে, ঐ সালের ২৮শে ডিসেম্বর ধরিয়া ফেলে। তাহার কাছে অনেকগুলি চাবি ও আপত্তিকর জিনিষ পাওয়া যায়। চাটগাঁর হেম ভট্টাচার্য্যকে ধরিবার অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও সে পর্য্যন্ত সফলকাম হওয়া যায় নাই।

৩৫নং শিবঠাকুর লেনে একটি আড্ডা ছিল। এখানে ১৯৩২ সালের ডিসেম্বর মাসের ৩০শে তাহাকে ধরা হয়। কিশোরীমোহন দাশগুপ্ত ও বিমল ঠাকুরকেও এখানেই ধরা হয়। বাড়ী তল্লাস করিয়া ২২টি কর্ত্তুজ পাওয়া যায় এবং সুরেন্দ্র ধর চৌধুরী, জ্যোতিষ মজুমদারও এখানেই ধৃত হয়। কিশোরী দাশগুপ্তের বিবৃতির ফলেই সেই দিনই ৪৮ গ্রে ষ্ট্রিটে ধরা হয়। কিশোরীর স্বীকারোক্তির ফলে ৯নং দর্মাহাটা ষ্ট্রীট হইতে অনেক আপত্তিকর পুস্তক, নক্‌সা প্রভৃতি পাওয়া যায়। উক্ত স্থান কয়টি এবং ১৬ নম্বর সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোড, ২০১ হ্যারিসন রোডে, ৪ নম্বর আহিরীটোলা ফার্ষ্ট লেন, ৯৪।১ বারানসী ঘোষের ষ্ট্রিটে সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিত।

প্রভাত চক্রবর্ত্তীই ছিল দলপতি। তাহাকে বাক্‌সা বন্দী নিবাস হইতে আসানসোলের অন্তর্গত ফরিদপুর গ্রামে স্থানান্তরিত হইবার পরে সে ১৯৩২ সালের ১০ই জানুয়ারী পলাইয়া যায় এবং ৪ নম্বর আহিরীটোলা ও ১১নং শীতলা লেনে অবনী ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে থাকিত। কাগজ পত্র হইতে বুঝা যায় যে আসামীদের পাঞ্জাব, গুজরাট, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, দিল্লী, মান্দ্রাজ, বেহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানের সহিত বিশেষ যোগাযোগ ছিল।

একটি সাঙ্কেতিক চিহ্ন সংযুক্ত কাগজ হইতে প্রবোধ ঘোষ, অবনী ভট্টাচার্য্য, ইন্দু মজুমদার, সুধীর ভট্টাচার্য্য, সঞ্জীব মুখার্জ্জী, কালীমোহন দে প্রভৃতি ধৃত হয়। 'স্বাধীন ভারত' নামক পুস্তিকায় কি ভাবে বিদ্রোহ পরিচালিত হইবে তাহা বিশেষ ভাবে লিপিবদ্ধ ছিল। কাগজপত্র হইতে পাঞ্জাবের অমৃতসরস্থ রোসনলালকে মাদ্রাজে পাওয়া যায়। পুলিস ঘেরাও করিলে রোসনলালের দল একটি বোমা নিক্ষেপ করে; তাহাতে একটি কনেষ্টবল আহত হয় এবং উভয়পক্ষের গোলাগুলি নিক্ষেপে গোবিন্দরাম নামে বিপ্লবী নিহত হয়। অতঃপর সকলেই ধরা পড়ে এবং বাড়ীটি তল্লাস করিয়া অনেক রাসায়ানিক ও বিস্ফোরক পদার্থ, বিপ্লবাত্মক পুস্তক এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। এই রোসনলাল ব্রহ্মচারী, শর্ম্মাজী, শম্ভূনাথ, জগৎরাম জোসি, জগবন্ধু চক্রবর্ত্তী, মিলখিরাম, পণ্ডিত দয়াচাঁদ, নিত্যানন্দ,

হীরালাল এবং অন্যান্য সকলের সঙ্গে উত্‌কামণ্ডে ষড়যন্ত্র করে। ইহারা 'হিন্দুস্থান সোসিয়েলিষ্ট রিভলিউসনারি পার্টি' গঠন করিয়া নানারূপ নিয়ম কানুন করে।

প্রায় দুই বৎসর পরে যে রায় হয় তাহাতে এইরূপ দণ্ড হয়—

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর—

১। প্রভাত চক্রবর্ত্তী

২। জিতেন্দ্রনাথ গুপ্ত

৩। পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত

৪। ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

৫। সীতানাথ দে

৬। নরেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত ও সীতানাথ দে রায়ের সময়ে উপস্থিত ছিল না। তাহারা ১৯৩৪, ১লা আগষ্ট আলিপুর জেল হইতে পলায়ন করে। ইহার পর হইতেই অবশিষ্ট আসামীদিগকে বেড়ী পায়ে আনা হইত। কেননা—জেল কর্ত্তৃপক্ষ আশঙ্কা করিত যে অন্যান্য সকলেও এইরূপ পলায়ন করিতে পারে।

দশবৎসরের কঠোর সাজা হয়—

কিশোরীমোহন দাশগুপ্ত, মণীন্দ্রলাল চৌধুরী, পরেশ গুহ

সাতবৎসর হয়—

যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, দ্বিজেন্দ্রনাথ তলাপাত্র, অবনীমোহন ভট্টাচার্য্য, প্রভাতকুমার মিত্র, সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, হরিপদ দে, নিরঞ্জন ঘোষাল, অমলচন্দ্র সেনগুপ্ত, অমিয়কুমার পাল—

ছয়বৎসর হয়—

হেম ভট্টাচার্য্য, বিমল ভট্টাচার্য্য, সুরেন্দ্রধর চৌধুরী, জ্যোতিচন্দ্র মজুমদার—

পাঁচ বৎসর—

সুধীর ভট্টাচার্য্য—

তিন বৎসর—

সন্তোষ চাটার্জ্জি, শ্যামবিহারী লাল শুক্লা, ইন্দুভূষণ মজুমদার, প্রবোধকুমার ঘোষ, অজিতকুমার বসু, অবনীরঞ্জন সরকার, সুশীলকুমার রায়চৌধুরী—

একবৎসর—

অবনীরঞ্জন সরকার, জ্যোতিমুকুল ঘোষ—

লক্ষ্মীনারায়ণ, সঞ্জীব মুখার্জ্জি, কালীমোহন দে ও ভোলানাথ দাস মুক্তিলাভ করে।

এই মোকদ্দমায় দুইজন রাজসাক্ষী ছিল (Approver). তাহাদের নাম জিতেন্দ্র চন্দ্র লাহা ও হৃষিকেশ দাশগুপ্ত ॥

চট্টগ্রামে আবার ইংরাজ নিহত

১৯৩৪, ৭ জানুয়ারী

চট্টগ্রামে একটী ক্রিকেট খেলার মাঠে চারিজন যুবক কয়েকজন ইংরাজকে আক্রমণ করে। দুইজন ইংরাজ নিহত হয়। বিচারে কৃষ্ণ চৌধুরী এবং হরেন চক্রবর্ত্তীর ফাঁসি হয়।

লেবঙ্গ আক্রমণ প্রচেষ্টা

ভবানী ভট্টাচার্য্য, উজ্জ্বলা মজুমদার, মনোরঞ্জন বানার্জ্জি, রবীন বানার্জ্জি, মধু বানার্জ্জি ও সুকুমার ঘোষ বাঙ্গলার গভর্ণর স্যার জন এণ্ডারসনকে আক্রমণ করিবার জন্য দার্জ্জিলিং যায়। উজ্জ্বলা সেখানে লুইস সেনিটারিয়ামে থাকে। বিচারে উজ্জ্বলার ১৪ বৎসর জেল হয়। আরও কয়েকজনের গুরুতর দণ্ড হয়।

ডায়ার হত্যা

লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসের দ্বারপথে জেনারেল ডায়ারকে খুন করা হয়। এই ডায়ারই জালিয়ানওয়ালাবাগে কামানের সাহায্যে বহুসংখ্যক নির্দ্দোষী নরনারীকে মৃত্যু সদনে প্রেরণ করিয়াছিল।

ওয়াডার হত্যা

ওধম সিং নামক জনৈক ব্যক্তি স্যার মাইকেল ওডায়ারকে ক্যাক্সটন হলে নিহত করিয়া ফেলে।

১৯৩৭ ফেব্রুয়ারী মাসে চট্টগ্রাম গুপ্তচর হত্যা প্রচেষ্টায় অমূল্য আচায্যের দশবৎসর জেল হয়।

হিলি ডাক লুঠ ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় হৃষিকেশ ভট্টাচার্য্য ও প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। সত্য চক্রবর্ত্তী, প্রফুল্ল সান্যাল ও সরোজ বসুর প্রত্যেকের দশবৎসর করিয়া সাজা হয়।

রঙ্গপুর ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার হেম বক্সীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়।

ফরিদপুরের গোয়েন্দা পুলিস নিহত।

কালিপদ ভট্টাচার্য্যের বাড়ী কোটালী পাড়া মদনপুরে। সে পুলিসের গোয়েন্দা ছিল। জুন মাসে একদিন কয়েকটি ছেলে ছোরার সাহায্যে তাহাকে আক্রমণ করে। বিচারে আশু ভরদ্বাজ ও অমূল্য চৌধুরীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়।

মীরাট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা

কামউনিষ্টদের কার্য্যকলাপ এ পুস্তকের বিষয়ান্তর্গত নহে। কারণ কমিউনিষ্টরা প্রচলিত শাসন ও নিয়মবিরোধী। তাহাদের উদ্দেশ্য এবং কার্য্য পদ্ধতি কংগ্রেস

বিরোধী,—কেননা উহা জাতির অহিতকর। বিপ্লবীদের কার্য্য পদ্ধতি কংগ্রেস কার্য্যপদ্ধতির বিরোধী হইলেও তাঁহাদের উদ্দেশ্য এবং কংগ্রেসের উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। তাই বিপ্লব ইতিহাস জাতীয়তা ইতিহাসের অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু যে সম্প্রদায় বা দল সুসময়ে বা অসময়ে জাতির স্বার্থের বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়াছে, তাহাদিগকে জনসাধারণ কিছুতেই মার্জ্জনা করিতে পারে না। গত ইউরোপীয় সংগ্রামের সময় মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যখন 'ভারত ছাড়' ধ্বনিতে কারারুদ্ধ হন, আগষ্ট আন্দোলনে (১৯৪২) জাতির উপর ইংরাজ সরকারের যখন ভীষণ অত্যাচার ও পীড়নের প্রবাহ বহিতে থাকে, কত স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ নির্ম্মমভাবে প্রহৃত হইয়াছে, 'মেসিন গান' স্থানকে স্থান উৎসন্ন করিয়া দিয়াছে, বহুলোক শমন সদনে প্রেরিত হইয়াছে, স্ত্রীলোক লাঞ্ছিত হইয়াছে, বালক বৃদ্ধের নিস্তার ছিল না—অত্যাচারে, ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত, জাতির সেই সঙ্কট সময়ে জন যুদ্ধ (People's War) রব তুলিয়া কমিউনিষ্টরা দেশ শত্রুদের যে সহায়তা প্রদান করিয়াছে, ভারতবর্ষের কোন নরনারীর তাহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। এই জন্যই কমিউনিষ্টদের বা র‍্যাডিক্যাল পার্টির সহিত আমাদের কোনরূপ সহযোগিতা বা সহায়তা নাই। সোসিয়ালিষ্ট হিংসবাদী বিপ্লবী, ফরওয়ার্ড ব্লক, জাতীয়বাদী মুসলিম, হিন্দুমহাসভা প্রভৃতি কোন সম্প্রদায়ই সে সময়ে কংগ্রেস বিরোধী হয় নাই। তাই এই সব সম্প্রদায়ের সঙ্গে কমিউনিষ্টদের তুলনা চলিতে পারে না। সুতরাং এই পুস্তকে কমিউনিষ্টদের কথাতো নাই-ই, বরং একসময়ে যাহারা প্রাণতুচ্ছ করিয়া দেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছিল তাহাদিগের কাহাকেও জাতীয়তাবাদী না হইয়া যদি আমরা কমিউনিজম মতাবলম্বী দেখিতে পাই, তবে আমাদের ক্ষোভের সীমা থাকে না।

তবে মীরাট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা যে সমস্ত ঘটনাবলম্বনে গঠিত হয়, তাহা এই জনযুদ্ধ ধ্বনির অনেক পূর্ব্বের ব্যাপার। ইহাদের তখন উদ্দেশ্য ছিল ইংরাজ শাসন বিলোপ। কিন্তু তথাপি বলিব ইংরাজ-শাসন বিলোপ হইলেও রুশিয়ার

প্রভুত্ব বাড়াইবার পক্ষপাতী ছিল ইহারা। আমাদের কোন দিনই উদ্দেশ্য ছিল না যে ইংরাজের পরিবর্ত্তে অন্যশক্তি ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা লাভ করুক। আমরা বরাবর চাহিতাম আমাদের স্বাধীনতা বা আত্মপ্রতিষ্ঠা, আর তাহার অনিবার্য্য ফল ইংরাজ শাসনেরও বিলোপ সাধন বলিয়াই আমরা আত্মরক্ষায়—পরকে বিনাশ করিব কল্পনা লইয়া নহে—আমরা ইংরাজ-শাসন ও ইংরাজ বাণিজ্য প্রসারের বিরোধী ছিলাম। ইহাদের মাধ্যমিক কার্য্য ইংরাজ শাসনের বিলোপ সাধন হইলেও অন্তিম উদ্দেশ্য ছিল বোলসেভিজমের প্রভুত্ব স্থাপন করা। তথাপি উপরোক্ত মোকদ্দমায় অনেক কংগ্রেস কর্ম্মীও ছিল বলিয়া, আর ঐ মোকদ্দমায় তখন বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়াই উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা দিলাম। তথাপি তাহাদের উদ্দেশ্য যে জাতীয়তা বিরোধী সেই সম্বন্ধে ১৯২৯, ১২ জুন তারিখে মীরাটে এডিসন্যাল ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হোয়াইট সাহেবের আদালতে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ এড্‌ভোকেট মিঃ ল্যাঙ্গফোর্ড জেম্‌স নিম্নলিখিত ভাবে বিবৃত করেন—

"The revolution that these accused have visualised is not a National Revolution. It is an anti-national revolution—its aim is to deprive Government of His Magesty in India and in its place to put the Government of the Third International—to substitute Government of Stalin in place of the established Government.

"To be Bolshevic you donot love your country, you are anti-country, anti-God, anti-family, you are ruthlessly to hate those who differ from you and when the time comes, you behave ruthlessly to kill them."

ইহার বঙ্গানুবাদ নিষ্প্রয়োজনীয়। ঘৃণায়ই বোলসেভিক্ বাদের সৃষ্টি এবং ইহার উদ্দেশ্য প্রচলিত গভর্ণমেণ্টের স্থানে ষ্টালিনের গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা। যাহাহউক মোকদ্দমাটি ১২ জুন ১৯২৯ আরম্ভ হইয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত চলে, তারপরে

আসে মীরাটের সেসন জজ আর, এম, ইয়র্কের ঘরে সেখানে ১৯৩০এর জানুয়ারী মাসে আরম্ভ হয়। কিরূপে সোভিয়েট সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবে সেই সম্বন্ধেও মিঃ ল্যাঙ্গিফোর্ড জেমস্ আসামীদের উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়াছেন—

There has been in existence in Russia an organisation called the "Communist International" which aimed at to bring about a revolution or revolutions for the overthrow of the existing Government and to establish in their place a Soviet Republic similar to that in Russia. This is intended to bring about armed risings. This aim was based originally on Marxion economic theory stated in writings of prominent Cmmunists and pronouncement made from time to time by Communists International and those subjects have been fully discussed in necesary writings of the accused persons.

The Communist International works to that end through its branches and committees e.g E.C.C.I, and branches of the Communist party of Great Britain R.I.L.K. and other bodies.

Communist International decided at an early date that India should be offered a suitable field for operations as having one of the most likely places for the next step to forward a world-revolution, one of the most likely weak links in the Capitalist Chain.

ভারতবর্ষের মধ্য দিয়া সমস্ত জগতে বলসেভিজসের প্রভূত্ব স্থাপন করিবার জন্যই গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিষ্ট দল **Glading, Alison, Spratt, Bradley** কে বিলাত হইতে ভারতবর্ষে পাঠায়। তাহারা নানাস্থানে ট্রেড্ ইউনিয়নের শাখা সংস্থাপিত করিয়া, ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে গোলযোগ ও বিবাদ সৃষ্টি করিয়া যুবকদিগকে উত্তেজিত করিয়া সেই উদ্দেশ্য সাধনে রত হয়।

মোকদ্দমার সাক্ষী দেয় ৩০০এরও অধিক, প্রায় ৭০০০ সাতহাজার কাগজ পত্র (**documents**) থাকে। ১৯৩০, ৩১ জানুয়ারী সেসন কোর্টে মোকদ্দমা

আরম্ভ হয়, সাক্ষ্যপ্রমাণ দেওয়া শেষ হয় ১৯৩১ সালের ১৭ই মার্চ্চ। এসেসাররা মতামত দেন ১৬ই আগষ্ট ১৯৩২। মোকদ্দমার রায় হয় ১৯৩৩ এর ১৬ জানুয়ারী। মোকদ্দমা করিতে করিতে মিঃ ল্যাঙ্গফোর্ড জেমস্ অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং সেই অসুখেই তাঁহার মৃত্যু হয়। কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় কয়েকজন আসামীর পক্ষ সমর্থন করেন।

আসামীদের নিম্নলিখিত ভাবে দণ্ড হয়—

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর—মুজাফর আহমেদ—

দ্বাদশ বৎসরের জন্য দ্বীপান্তর—

1. Dange 2, Spratt 3. Ghate 4. Joglekar 5. Nimbakar

দশ বৎসরের জন্য দ্বীপান্তর—

1, Bradley 2. Mirjakar 3. Osmani

সাত বৎসরের জন্য দ্বীপান্তর—

1. Shamsing 2. Joshi 3. Majid 4. Goswami

পাঁচ বৎসরের জন্য দ্বীপান্তর—

1. Ajodhya Prasad 2. P. C. Joshi 3. Adhikari 4. Desai

চার বৎসরের কঠোর দণ্ড—

1. Chakrabarty 2. Basak 3. Huchinnson 4. Mitra 5. Jobcoala 6. Saigal

তিন বৎসরের জন্য কঠোর দণ্ড—

1. Samsul Huda 2. Alva 3. Kasle 4. Gouri Sankar 5. Kadam

পরে ইহারা সকলেই ১৯৩৫ সালে—কেহ বা পূর্ব্বে মুক্তিলাভ করে।

এই মোকদ্দমায় আমাদের পরিচিত আর তিনজন বাঙ্গালীও ছিলেন। তাহাদের নাম কিশোরীলাল ঘোষ, শিবনাথ বানার্জ্জি, বি, এন, মুখার্জ্জি।

কিশোরীবাবু খুব পীড়িত হইয়া পড়েন। আর দুইজনও মোকদ্দমায় নির্দ্দোষী প্রমাণিত হন।

নরেন ভট্টাচার্য্যও (মানবেন্দ্র রায়) এই মোমদ্দমায় আসামী ছিলেন। ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি যে ভারত হইতে জাহাজে করিয়া চলিয়া যান, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাহার পরে ইনি কমিউনিষ্ট হইয়া পড়েন এবং থার্ড কমিউনিষ্ট ইণ্টারনেসনেলে কার্য্যকারী সমিতির সভ্য হন। সেই অবস্থায় পূর্ব্ব বিভাগের ইনিই ছিলেন প্রধান। ভারতে পৌছিলে ইনি ১৯৩১ সালের ২১ জুলাই বাইকালা ওয়াইনি হাউসে আকস্মিক ভাবে ধৃত হন। জজ হ্যামিলটনের বিচারে তাঁহার ১২ বৎসরের জন্য সশ্রম দণ্ড হয়।

In Dec. 1929 Roy was expelled from Communist International as a renegade. He was charged with collaborating with the Brandler group of German Communist. Vide Amrita Bazar Patrika Jan. 9. 1932.

অতঃপর ১৯৩৭ সালে যে গভর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট পাশ হয়, তারপরে আর বিপ্লব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু শুনা যায় না। তবে ১৯৪২ সালে আগষ্ট আন্দোলনই এযুগের সর্ব্বপ্রধান বিপ্লব আন্দোলন।

তৃতীয় খণ্ড

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

প্রথম পর্ব্ব

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের স্থান খুবই উচ্চে। অন্যান্য বিপ্লবী-দের মধ্যে বিপ্লবের ইতিহাসেও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অদম্য সাহস, জ্বলন্ত দেশ-ভক্তি, মাতৃভূমির জন্য প্রাণবিসর্জ্জনে অকুতোভয়—তথা সংগঠন শক্তি ভারত-বর্ষের ইতিহাসে অদ্বিতীয়। এখনও ভারতবাসী সুভাষচন্দ্রকে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারে নাই বলিয়াই এপর্য্যন্ত তাঁহার কোন জীবনীই প্রকৃত চরিত্রলেখ্য নয়। দেশ যেদিন তাঁহাকে ঠিক্ ঠিক্ বুঝিবে, সেইদিনই প্রকৃত জীবন-চরিত্র দেশবাসীর নিকট স্পষ্টভাবে উদ্ঘাটিত হইবে। সেই অবস্থা হয়তো দেখিবার আমার সময় হইবেনা, তাই একদিন যাঁহার সাহচর্য্য লাভ করিয়া জীবনে ধন্য হইয়াছিলাম, তাঁহার সম্বন্ধে সামান্য কয়েকটি ছত্রেও যদি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতে সমর্থ হই, লেখনী ধন্য হইবে বলিয়া মনে করি।

মুসলমান আমলের ইতিহাসে যাঁহারা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে রাণা প্রতাপসিংহ ও ছত্রপতি শিবাজী ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা বরেণ্য,—উভয়েই প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা অর্জ্জন করেন। যশোহরের প্রতাপাদিত্য, বিক্রমপুরের কেদার রায় এবং ভূষণার সীতারাম রায়ও প্রাণ তুচ্ছ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁহাদের অভি-যান সাফল্য অর্জ্জন না করিলেও, তাঁহাদের কথা বীরত্ব কাহিনীর ন্যায় আমাদের

আদর্শ স্থল। কিন্তু উপরোক্ত সকলেরই স্বদেশে নিজ নিজ প্রবল দল ছিল, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম নিরত অসংখ্য যোদ্ধা সেই দল পুষ্ট করিত, আর অস্ত্রসম্ভার তৈয়ারী ও সরবরাহ করিবার তাঁহাদের সুযোগ বা অর্থের অভাব হয় নাই। সুভাষচন্দ্রও যুদ্ধ করিয়াছিলেন দেশের স্বাধীনতার জন্য, কিন্তু অন্যান্য সুবিধা তাঁহার না থাকায় তাঁহাকে ক্রমে সবই নিজের হাতে গড়িয়া লইতে হয়। সেই হেতু সুভাষচন্দ্রের অধ্যবসায় ও স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাসের চক্ষে কাহারও অপেক্ষা কম গরীয়সী বলিয়া গণ্য হইতে পারেনা।

অতঃপর ইংরাজ রাজত্বে ইংরাজের বিরুদ্ধে তিনরকম অভিযান হয়। এক সশস্ত্র প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ১৮৫৭ সালের, দ্বিতীয় সন্ত্রাসমূলক প্রচেষ্টা বা গুপ্ত আন্দোলন, তৃতীয়তঃ অহিংসা সংগ্রাম বা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলন। ইংরাজের চক্ষে এই তিনটির উদ্দেশ্য একই, যদিচ কর্মপন্থা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় স্বতন্ত্র হইতে বাধ্য হইয়াছিল। ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও একতার অভাব বহুস্থানে দৃষ্ট হইত। ভারতীয় সংগ্রাম চালাইতে সমর্থ সকলের উপরে বিশিষ্ট গুণ সম্পন্ন এমন একজন নেতাও ছিল না, যিনি প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতে সমর্থ ছিলেন। এদিকে সংগ্রামটি ঠিক সময়োপযোগী বলিয়াও অনেকের মনে হয়, তথাপি সেই কারণ, সংঘর্ষে যে সমস্ত বীরগণ দেশের স্বাধীনতালাভের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, তাঁহাদের নামও বিঘোষিত, উচ্চারিত হওয়া উচিত।

ইহার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে স্বাধীনতার জন্য গুপ্ত আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। প্রথমে আন্দোলন প্রকাশ্য লাঠিখেলায় নিবদ্ধ থাকে আর উহার প্রথম প্রবর্ত্তক হন স্বর্গীয় প্রমথনাথ মিত্র। (P. Mitter) ক্রমে উহা গুপ্ত আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। সেই আন্দোলন শ্রীবারীন্দ্র ঘোষ ও শ্রীপুলীন দাস কর্ত্তৃক প্রথমে পরিচালিত হয়। ক্রমে বিভিন্ন সময়ে ও অবস্থায় বিভিন্ন নেতার উদ্ভব হয়। গুপ্ত আন্দোলনে বহু যুবক উচ্চ প্রেরণায় আত্ম বলিদান দিয়াছেন—এই পুস্তকে তাঁহাদের সম্বন্ধে যথাসম্ভব উল্লেখও করা হইয়াছে। প্রফুল্ল চাকী, ক্ষুদিরাম

বসু, কানাই দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মদনলাল ধিঙ্গড়া, বীরেন দত্ত গুপ্ত, যতীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, রাজেন্দ্র লাহিড়ী, ভগত সিং, যতীন্দ্র দাস, সূর্য্যসেন, দীনেশ গুপ্ত, বিনয় বসু, পিংলে, কর্ত্তারসিং গোপীনাথ সাহা, প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য প্রভৃতি অগণিত শহীদ উচ্চপ্রেরণায় অবলীলাক্রমে রক্তদান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কত লোকের দ্বীপান্তর হইয়াছে, কতলোক জেলে বা অন্তরীণে পচিয়াছে, কতলোক দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নেই। স্বাধীনতার জন্য ইহাদের জ্বলন্ত আকাঙ্খা এবং আত্ম বলিদান উচ্চ প্রবৃত্তি হিসাবে ইতিহাসে ঘোষিত হইলেও, সন্ত্রাসবাদ বা গুপ্ত আন্দোলনে দেশের মুক্তি যে আসে না তাহা বারংবার প্রমাণিত হইয়াছে। সুভাষচন্দ্র যখন পাঠাভ্যাসের জন্য ১৯১৩ সালে প্রথমে কলিকাতায় আসেন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের উপরে তখন বাঙ্গালা দেশের ছাত্রদের অদ্ভুত আকর্ষণ লক্ষিত হইত, কিন্তু সুভাষচন্দ্র যে দলভুক্ত ছিলেন সেই দলের গুপ্ত আন্দোলন বা সন্ত্রাসবাদের সহিত বিন্দুমাত্র সংস্রব ছিল না। সন্ত্রাসবাদীদের হেলায় প্রাণ বিসর্জ্জনের সাহসের তিনি সাধুবাদ করিতেন বটে, কিন্তু ঐরূপ পন্থায় আমাদের স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হইবেনা বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন।

অতঃপর আসিল স্বদেশী ও স্বরাজ লাভের প্রকাশ্য আন্দোলন। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের অহিংস পন্থা বিশ্বাস করিতেন বলিয়াই উহা আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমে সেই পন্থায় যখন জড়তা উপস্থিত হইল, অহিংসা কর্ম্মহীনতার নামান্তরে পরিণত হইল, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কাউন্সিলরূপী সংগ্রামমূলক পন্থার নির্দ্দেশ দেন। কার্য্যসাধনের প্রকৃষ্ট উপায় মনে করিয়া সুভাষচন্দ্র ইহাতেই প্রাণ মন ঢালিয়া ইহার প্রতি আকৃষ্ট হন। সৌভাগ্যক্রমে এই নীতি কংগ্রেসের অহিংসা-নীতির পরিপন্থী ছিলনা। আর আজ ক্ষমতা হস্তান্তরে যাহা কিছু আমাদের লাভ হইয়াছে, দেশবন্ধুর পন্থায়ই যে তাহা অর্জ্জিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে স্বাধীনতার জন্য দেশবন্ধুও যে পথ অবলম্বনে সঙ্কুচিত হইতেন, কেবল মাত্র স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায়ই সুভাষচন্দ্র সে পথই অবলম্বন করিয়াছিলেন—আর সে

দিক দিয়াও,—দেশবন্ধু যেরূপ প্রাণ তুচ্ছ করিয়া সমস্ত সুখ শান্তি, ধনজন, ঐশ্বর্য্য, রাজ-সম্মান তুচ্ছ করিয়া আপনার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, সুভাষও দেশবন্ধুর সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী হিসাবে নিজের পথে জীবনের সবই বিসর্জ্জন দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নাই। একবার মাত্র কংগ্রেস-নীতির বিরোধী হইলেও সমগ্র দেশবাসীকে অমূল্য রত্ন প্রদান করিতে, সমগ্র দেশবাসীকে অমৃতধারা পান করাইতে, মাতৃভূমির বন্ধন দশা মুক্ত করিতে, সুভাষচন্দ্র কোন দেশের কোন বীর অপেক্ষাও যে তুলনায় ন্যূন নহেন, আজ না হইলেও একদিন জাতির প্রকৃত খাঁটি ইতিহাস তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিবে।

সুভাষচন্দ্র যে 'আজাদ হিন্দ্ গভর্ণমেণ্ট' (স্বাধীন ভারতের শাসন-তন্ত্র) গঠন করেন, উহা কেবল সুনিয়ন্ত্রিত ভাবেই গঠিত হয় নাই, অক্ষশক্তি কর্ত্তৃক উহা স্বীকৃতও হয়। সমগ্র ভারতের স্বাধীনতাই ছিল এই সরকারের কাম্য। স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য মানুষ যে ভাবে লড়িয়াই উহা লাভ করুক না কেন, সেই স্বাধীনতার স্বাদ অহিংসা নীতিতে হয় নাই বলিয়া উহা কেহই দূরে নিক্ষেপ করিত না বলিয়াই মনে হয়। কারণ স্বাধীনতা স্বাধীনতাই, উহার নামান্তর নাই, রূপান্তর নাই ভাবান্তর নাই। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে আমেরিকাবাসিগণ ব্রিটেনের কবলমুক্ত হইবার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া নিজদেশ স্বাধীন করিতে সমর্থ হয়। পূর্ব্বে তাহারা ইংরাজের শাসনই মানিয়া চলিত। আর ইংরাজ শাসনকবল হইতে তাহারা মুক্তিলাভ করিতেই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। দুর্ভাগ্যক্রমে জর্জ্জ ওয়াসিংটন যদি হারিয়া যাইতেন, তবে কি তাঁহার কার্য্য শ্লাঘনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত না? সুভাষচন্দ্রকেও এই অবস্থায় জর্জ্জ ওয়াসিংটনের সঙ্গেই তুলনা করা যাইতে পারে।

প্রথম মহাসমরের শেষ দিকে, লেনিন রাশিয়া হইতে নির্ব্বাসিত ছিলেন। যখন তিনি বুঝিলেন যে বিপ্লব পরিচালনার জন্য তাঁহার স্বদেশ রাশিয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন আবশ্যক, তিনি তাঁহার নিজদেশ রাশিয়ার সহিত যুদ্ধরত জার্ম্মানীর সহায়তায় সেই দেশের মধ্য দিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। জার্ম্মানীর কাইজার এই ভাবিয়াই অনুমতি দিয়াছিলেন যে, লেনিন-সংঘটিত বিপ্লবে মিত্রশক্তি রাশিয়ার সামরিক শক্তি

খর্ব্ব হইবে। কার্য্যকালে লেনিনের বিপ্লব সাফল্য মণ্ডিতই হয়—রাশিয়ার জারের শাসন বিলুপ্ত হইয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। লেনিন সংঘটিত রুশ-বিপ্লব সাফল্যলাভ না করিলে হয়তো লেনিন আত্মহত্যা করিতেন, বা ভিন্ন দেশে পলাতক অবস্থায় থাকিতেন, আর বিচার হইলে নিশ্চয়ই তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতেন। শিবাজী যে পার্ব্বত্য মূষিকের ন্যায় পলাইয়া নিজ দেশে আসিয়া স্বাধীনতার যুদ্ধ লড়িয়া মহারাষ্ট্রভূমিকে মোগল কবল মুক্ত করিতে সমর্থ হন, ইহাতে কি তিনি কোনরূপ অন্যায় করিয়াছিলেন? সুভাষচন্দ্রও স্বাধীনতার জন্য লেনিন, ওয়াসিংটন ও শিবাজীর ন্যায়ই যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সত্য বটে তাঁহার অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই, কিন্তু বীরের প্রচেষ্টাই মহৎ, অসাফল্যে তাঁহার যশ খর্ব্ব বা মলিনত্ব প্রাপ্ত হয় না। তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন, ফলের জন্য তিনি দায়ী ছিলেন না, কেননা ফলাফল কেবল ফলদাতা ভগবানের দয়ার উপরই নির্ভর করে—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন
মা কর্ম্মফল হেতুর্ভূ মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি"

যতদিন ভারতে ছিলেন, সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের অহিংসনীতি কখনও বিসর্জ্জন দেন নাই। তিনি ভারতীয় কংগ্রেসের দুইবার সভাপতি হন,—কংগ্রেসের সহিত তাঁহার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। যতদিন ভারতে ছিলেন কংগ্রেসনীতি তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেন। যখন বিদেশে চলিয়া যান, অবস্থা ভিন্নরূপ দাঁড়াইল এবং অনুষ্ঠেয় কাজও তাঁহাকে সেই ভাবেই করিতে হয়—'যস্মিন দেশে যদাচার'ঃ। যদি তিনি অহিংসা অবলম্বন করিয়া থাকিতেন, তিনি সেখানে কিছুই করিতে সমর্থ হইতেন না, তাঁহার কথা কেহ শুনিতও না—সেই সময়ে বিঘোরে তাঁহার প্রাণ যাইত। এই যে একটা প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মত বিদেশেও বাঙ্গালীর অভাবনীয় বীরত্ব তিনি দেখাইয়া আসিলেন—বাঙ্গালী আর কখনও মনে করিবে না—সে ভীরু বা অকর্ম্মণ্য; মনে বিশ্বাস থাকিবে তাহার দ্বারাও অসাধ্য সাধন হইতে পারিবে। উপরন্তু সেই বিপদ-সঙ্কুল সঙ্কটময় স্থানে কংগ্রেসের কথাতো তিনি এক দিনের জন্যও বিস্মৃত হন নাই। মহাত্মা

গান্ধীকে তিনি দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন, তিনি বরাবর মনে করিতেন উদ্দেশ্য সাধিত হইলে,—স্বরাজ স্বাধীনতা, ধনরত্ন, যাহা কিছু অর্জ্জিত হইবে, সবই মহাত্মাজীর পদতলে সমর্পণ করিবেন। কিন্তু তথাপি জিজ্ঞাস্য তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও কি অসঙ্গত কার্য্য করিয়াছিলেন? যদি সন্তানদিগের দলপতি সত্যানন্দ অন্যায় না করিয়া থাকেন, যদি চন্দ্রশেখরের প্রতাপ যুদ্ধ করিয়া অন্যায় না করিয়া থাকেন, যদি জীবানন্দ ও শান্তি ন্যায়যুদ্ধ করিয়া থাকে, যদি নন্দ-বংশ ধ্বংস সাধনে সিংহাসনারোহণ করিয়া চন্দ্রগুপ্ত অন্যায় পথাবলম্বন না করিয়া থাকেন, যদি বিমলা কতলুখাঁর বধ সাধনে কর্ত্তব্য সাধনই করিয়া গিয়া থাকেন, সুভাষচন্দ্রও, যাহাদের দ্বারা আমাদের জন্মভূমি অন্যায় ভাবে অধিকৃত ও শাসিত, মাতৃভূমির বন্ধনদশা মোচন করিবার জন্য তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া অন্যায়তো করেনই নাই, বরং প্রকৃত দেশ প্রেমিকও, বীরের কার্য্যই করিয়া গিয়াছেন। মনে পড়ে মহাত্মা গান্ধী নাগপুর কংগ্রেসে (১৯২০) যখন কংগ্রেসের 'অহিংসা' নীতি প্রবর্ত্তন করেন, তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলে, "আজ ভারতবাসীর অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণে কোন অধিকার নাই। যদি স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র ধারণ করা সম্ভব হইত, সেই উপায়ই অবলম্বিত হইত। কিন্তু তাহা সম্ভব হইবেনা বলিয়াই স্বরাজলাভের জন্য 'অহিংসাই' প্রধান অস্ত্ররূপে নির্দ্ধারিত হইল। সুভাষচন্দ্রও স্বরাজ বা স্বাধীনতা লাভে ভারতে যাহা সম্ভব নয়, ভারতের বাহিরে গিয়া সেই পথই অবলম্বন করিয়াছিলেন।

ভগবান সুভাষচন্দ্রকে আজন্মসিদ্ধ যোগী পুরুষ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। দীর্ঘাকার গৌরকান্তি, সহাস্যবদন, পরিপুষ্ট দেহ-সৌষ্ঠব লইয়া সুভাষচন্দ্রকে যেমন যোগ-সিদ্ধ বুদ্ধ, শঙ্কর বা বিবেকানন্দের ন্যায় দেখাইত, আবার ঐ আকৃতিতে যোদ্ধবেশেও রামভক্ত লক্ষ্মণ বা কুন্তীপুত্র অর্জ্জুনের মতই মনে হইত। শুনিয়াছি স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তোলা মাখন—কিছুতেই জলে মিশে না।" সুভাষচন্দ্রকেও আমরা দেখিয়াছি বরাবর কামিনী কাঞ্চনত্যাগী যোগী পুরুষ। খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া তাঁহাকে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জিতেন্দ্রিয় পুরুষ

বলিয়াই জ্ঞান হইত। বিলাতে গিয়াও তিনি স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিশেন নাই, কর্ম্ম-ক্ষেত্রে বহু স্ত্রীলোকের সংস্রবে আসিতে হইলেও, কামিনী সম্বন্ধে অতিবড় শত্রুকেও তাঁহার সম্বন্ধে বিরুদ্ধভাব পোষণ করিতে দেখি নাই, বা কোনরূপ কথাও কর্ণগোচর হয় নাই। অর্থের তাহার অনেক প্রয়োজন হইত, কিন্তু কিছুই নিজের জন্য নহে। তাঁহার বেশ ভূষা ছিল অতিশয় সাদাসিধা, কোনরূপ বিলাস ব্যসন তাঁহার ছিল না। প্রলোভন তাঁহাকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করে নাই। ত্যাগই ছিল তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত। অতঃপর মান। পরমহংসদেব বলিতেন "মান হজম করা বড় কঠিন"। সুভাষচন্দ্র প্রচুর মান সম্মান পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহাকে স্ফীত-মস্তিষ্ক করিতে পারে নাই। মাঝে মাঝে যে উষ্ণ হইতেন তাহা অহঙ্কারের দরুণ নহে, আত্ম সম্মান বোধে। মহাকবি গিরিশচন্দ্র "সৎনাম" নাটকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ব্যক্তির কতকগুলি লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন। নির্ব্বিকার সাধু পুরুষ ফকিররাম নায়ক রণেন্দ্রকে বলিতেছে—

"তুমি কি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ? দৃঢ় প্রতিজ্ঞের অর্থ তুমি অবগত আছ? এক মন এক ধ্যান হ'য়ে কার্য্যে ব্রতী হওয়া, পাপ পুণ্য উভয়কে তুচ্ছ করা. শত শত প্রলোভন উপেক্ষা করা, কামিনী কটাক্ষ না হৃদয়ে বিদ্ধ হয়, কাঞ্চন না আকর্ষণ করে, সম্মান না নরত্ব দূর করে। তুমি যদি এরূপ কুলতিলক পাশমুক্ত পুরুষরূপে জন্মগ্রহণ করে থাক, সত্যই তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।"

আমরা দেখিয়াছি সুভাষচন্দ্র এরূপ কুলতিলক, পাশমুক্ত পুরুষ হইয়াই বাঙ্গলা মায়ের কোলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

সুভাষচন্দ্র যে সময় ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজ শত্রু অক্ষ শক্তির সাহায্যপ্রার্থী হন, সে সময় তিনি খুব শুভ মুহূর্ত্ত বলিয়া মনে করেন। কেহ যেন মনে না করেন, এদেশে হাইকম্যাণ্ডের সঙ্গে না পারিয়া অন্যত্র নেতা হইবার জন্য তিনি দেশত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি গভীর দেশাত্মবোধেই এইরূপ অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল আন্তর্জাতিক সমরে লিপ্ত হইয়া ইংরাজ এসময়ে সব দিক রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে না। তাই এই সময়ে

ভারতবর্ষের দিকে হানা দিলেই, ফললাভ অবশ্যম্ভাবী হইবে, স্বাধীনতা আমাদের করতলগত হইবে।

গিরিশচন্দ্রের "ছত্রপতি শিবাজী" নাটকে শিবাজীর ও দাদোজীর কথোপকথনে পাঠক সুভাষচন্দ্রের কতক আভাষ পাইবেন। দাদোজী শিবাজীকে বলিতেছেন—

"বৎস, তুমি বালক, তুমি যে ভাবের বশবর্ত্তী, তাতে সম্পূর্ণ বিপদ আহ্বান কচ্ছো। শত্রুরা তোমায় বিরোধী ভাবাপন্ন ব'লে রাজসভার প্রতিপন্ন ক'রবে। রাজকোপে ভীষণ অমঙ্গলের আশঙ্কা।"

শিবাজী—গুরুদেব, অধিক অমঙ্গলের আশঙ্কা কি? ধর্ম্ম কর্ম্ম নষ্ট, আচার নষ্ট, অমঙ্গলের আর বাকী কি? এই তুচ্ছ প্রাণ! দাস আপনার চরণ কৃপায়, আপনার তেজপূর্ণ উপদেশে, মাতার মুখে পুরাণ শ্রবণে, তুচ্ছ প্রাণকে তৃণের ন্যায় জ্ঞান করে। এই শিক্ষা পেয়ে আমি কি জড়ের ন্যায় অবস্থান করবো? মাতৃভূমি পতন, ধর্ম্ম-পীড়ন, বিত্তাপহরণ—কাপুরুষের ন্যায় সহ্য করবো? যদি শত্রু মহারাষ্ট্রে প্রবেশ করে, তবে এ অবস্থায় কিরূপে আত্মরক্ষা করবো, পরিবার জনকে রক্ষা করবো, আশ্রিত দীন কুটীরবাসিগণকে রক্ষা করবো?

দাদোজী—তোমার কি রাজবিরুদ্ধাচরণ করা কল্পনা? যে আশঙ্কা কচ্ছো, যদি সত্যই বিরোধী সৈন্য মহারাষ্ট্রে প্রবেশ করে, তুমি একা কিরূপে সুসজ্জিত সৈন্য প্রতিরোধ ক'রবে?

শিবাজী—আমি একা এরূপ আজ্ঞা কি নিমিত্ত কচ্ছেন? ঐ যে দীন হীন নগ্ন দেহ মাওলীগণ—দাস আপনার শিক্ষিত বিদ্যায় তা'দের অস্ত্রশিক্ষাদানে সম্পূর্ণ সক্ষম হয়েছে। তারা সম্পূর্ণ যুদ্ধ নিয়মাধীন, ভবানীর কৃপায় সকলে জননী জন্ম-ভূমি-বৎসল, অস্ত্রধারী সৈন্যের সম্মুখীন হ'তে সম্পূর্ণ পারদর্শী। পার্ব্বত্য-প্রদেশে মোগল বা পাঠানদের বিরুদ্ধে দুর্গরক্ষা ক'রতে পশ্চাদপদ হবে না। তারা জন্মভূমির দুঃখে কাতর, তারা ধর্ম্মরক্ষার জন্য কাতর, বিধর্ম্মীর অধীনতায় অসহিষ্ণু,—তারা প্রাণের মমতা শূন্য। যদি মাতৃভূমি রক্ষার উদ্যম মনুষ্য জীবনে কর্ত্তব্য হয়, সেই কর্ত্তব্যসাধনে সুযোগ উপস্থিত। মুসলমানেরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি ঈর্ষান্বিত,

বাদশা দক্ষিণাত্য জয়ের জন্য কৃতসঙ্কল্প, এ সময়ে বিজাপুর আত্মরক্ষায় ব্যাপৃত থাকবে, এই পার্ব্বত্য প্রদেশের অবস্থা লক্ষ্য ক'রবে না। এ অবস্থায় যদি আত্মোন্নতি সাধন ক'রতে না পারি, তা হ'লে আর সহস্র বৎসরে উন্নতির আশা থাকবে না। স্বাধীনতা অর্জ্জন কিম্বা জীবন বিসর্জ্জন—এই আমার সঙ্কল্প, অনেক দূর অগ্রসর হয়েছি; পশ্চাদ্‌পদ হ'তে আজ্ঞা ক'রবেন না প্রভু।"

শিবাজীর জীবনের কথাগুলি গিরিশচন্দ্রের নাটকে যাহা উক্ত হইয়াছে, অক্ষরে অক্ষরে সুভাষচন্দ্রের জীবনে প্রযোজ্য। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের বীরগণের মধ্যে একমাত্র ছত্রপতি শিবাজীর সঙ্গেই বাঙ্গলার নেতাজী সুভাষচন্দ্রের তুলনা হইতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুভাষচন্দ্রের জীবন কতকগুলি দ্বন্দ সংঘর্ষের সমাবেশেই পরিপুষ্ট। সুভাষচন্দ্র যখন কটক কলেজিয়েট স্কুলে পড়াশুনা করিতেন, তাঁহার জীবন কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের মধ্য দিয়াই পরিচালিত হয়। তাঁহার পিতা সঙ্গতি-পন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক হইলেও কটকে একজন শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবী ছিলেন। তৎকালে বাঙ্গলার বাহিরে 'বারের' প্রধান অনেক বাঙ্গালীর নাম করা যাইতে পারে। চালচলনে, দানধ্যানে, পশার প্রতিপত্তিতে তদবস্থার স্থানীয় উকীলদের চেয়ে তাহাদের নামই দেশে বিদেশে লোকে বেশী করিত। উড়িষ্যায় জানকী বাবু ব্যবহার-জীবীও ছিলেন প্রসিদ্ধ, আবার দানধ্যানও ছিল তাঁহার বেশ। তদুপরি তিনি অত্যন্ত রাশ ভারি লোক ছিলেন। আর সম্বন্ধাদিও ছিল অভিজাত পরিবারের সঙ্গে। তাঁহার অন্যান্য পুত্রেরাও ছিলেন মেধাবী ছাত্র। বালক সুভাষ নিজেও ছিলেন খুব রাশভারী। এই অবস্থার তাঁহার কাছে সাধারণতঃ অন্য লোক বা ছাত্র ঘেষিতে সাহস পাইত কিনা সন্দেহ, কিন্তু তাঁহার কাজ করিবার প্রবৃত্তি এবং

পরিবারের বাহিরেরও অন্যপ্রভাবই তাঁহাকে মিশুক ও সামাজিক করিতে সমর্থ হয়।

জানকী বাবুর পূর্ব্বে হরি বল্লভ বসু নামে আর একজন উকীলও উড়িষ্যায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হন। ইনি জানকী বাবুর আত্মীয়। এই হরি বাবুর বাড়ীতে রামকৃষ্ণ মিসনের সন্ন্যাসীরা কলিকাতা হইতে প্রায়ই আসিয়া থাকিতেন। তাঁহাদের সাহচর্য্যে ও বিবেকা-নন্দের 'স্বামী শিষ্য সংবাদ এবং পত্রাবলী ও বক্তৃতা ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়া সুভাষ চন্দ্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের (১৮৬০-১৯০২) প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। যুগাবতার রামকৃষ্ণদেব মনে করিতেন 'জীব শিব', আর তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের সার বিষয়ই ছিল "যত মত তত পথ"—যিনি যে ধর্ম্মাবলম্বীই হৌন না কেন, সকলেই আমরা ঈশ্বরের সন্তান, পরস্পরের ভ্রাতা। সুভাষচন্দ্রও জীবনে এই দুইটি সত্যই সার করিয়া ধরিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ বিবেকানন্দ নিজে যে নিতান্ত নিম্ন জাতীয় ব্যক্তিগণকেও নারায়ণ জ্ঞানে ভোজন করাইয়া তৃপ্ত হইতেন, আর মলমূত্র আচ্ছাদিত অপরিষ্কার রোগীকেও নিজ হাতে যত্নের সহিত শুশ্রূষা করিতে কাতর হইতেন না, এই সব কাহিনী সুভাষচন্দ্রের মর্ম্মস্পর্শ করে। এই জন্য অল্পবয়স হইতেই সুভাষচন্দ্র গরীবের সাহায্য করিতে, রোগীর শুশ্রূষা করিতে, দুর্ভিক্ষ বা বন্যা প্রপীড়িত স্থানে গিয়া জন-সেবা কল্পে প্রাণমন ঢালিয়া কাজ করিতে ছুটিয়া যাইতেন। সেই সম্পর্কে সাধারণ লোক এবং কর্ম্মীবৃন্দের সহিত তাঁহার মিশিতে হইত বলিয়া বড়লোকের ছেলে হওয়া সত্ত্বেও এবং অভিজাত আবহাওয়ায় লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত হইলেও রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রভাবই তাঁহাকে সামাজিক করিয়া তুলিয়াছিল। সেই সময়ে রাজনীতির সংস্পর্শে আসিবেন এইরূপ কল্পনা প্রথমে না করিলেও সেবাধর্ম্মকে তিনি প্রকৃত মনুষত্ব জ্ঞানে জীবনের সারধর্ম্মরূপে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। বিবেকানন্দের কথা তাঁহারও প্রাণের কথা ছিল—

"হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী

আমার ভাই ; বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।”

বিবেকানন্দ মুখনিঃসৃত—এই বাণী হইতেই সুভাষচন্দ্রের সেবাব্রত গ্রহণ, জাতিনির্ব্বিশেষে হিন্দু মুসলমান সকলের সহিত মৈত্রী স্থাপন। অতঃপর সুভাষচন্দ্র যে দেশ মাতৃকার সেবায় পরিপূর্ণ ভাবে আত্মনিয়োগ করেন, তাহাও বিবেকানন্দের প্রভাবেই। বিবেকানন্দ বারবার বলিতেন :—

“বঙ্গযুবক, বিশ্বাস করো তোমরা মনুষ্য, বিশ্বাস করো তোমরা অপরিসীম কার্য্যক্ষম, বিশ্বাস করো ভগবান তোমাদের সহায়, বিশ্বাস করো ভারত তোমাদের মুখাপেক্ষী, বিশ্বাস করো জনে জনে তোমরা ভারত উদ্ধারে সক্ষম। অগ্রসর হও, পশ্চাদ্‌পদ হইও না, তোমরাই আত্মবলিদানে ভারত মাতার প্রীতি সাধন করিবে। বিশ্বাস করো তোমাদের সার্থক জন্ম, বিশ্বাস করো তোমরা কখনই নিস্ফল হইবে না, তোমাদের বিশ্বাসে মেরু টলিবে, সাগর শুষিবে, ভারতের পুনরুদ্ধারে তোমরাই এক মাত্র কৃতী।”

সুভাষও মনে করিতেন “ভারত আমার মুখাপেক্ষী, ভারত উদ্ধারে আমি সক্ষম। আমার জন্ম সার্থক হোক। আমার বিশ্বাসে মেরু টলিবে, সাগর শুষিবে, স্বাধীনতা অর্জ্জিত হইবে।”

এই ভাবধারায়ই সুভাষচন্দ্রকে বুঝিতে পারা যাইবে। ছাত্রাবস্থায় সুভাষচন্দ্রকে কয়েকবার অধ্যাপকের সহিত সংঘর্ষে আসিতে হয়। একবার একজন ইংরাজ অধ্যাপক প্রহৃতও হয়। কিন্তু সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ইহাতে তাঁহার তীব্র জাতীয়তাবোধেরই সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। আর এই ঘটনায়ই তাহার স্বাধীন জীবনের আরম্ভ। অধ্যাপকের প্রতি ছাত্রদের কর্ত্তব্য, বশ্যতা এবং সম্পর্ক খুবই মধুর, সন্দেহ নাই। সুভাষচন্দ্রও কটকের প্রধান শিক্ষক ৺বেণীমাধব দাস, রেভেন্‌স কলেজের অধ্যাপক হেমচন্দ্র সরকার প্রভৃতিকে খুবই শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ের একটা সীমা আছে। এই ব্যাপারে কর্ত্তব্য-বোধেই সেই সীমার লঙ্ঘন হইয়াছিল।

সুভাষচন্দ্র যখন প্রেসিডেন্সি কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়েন (১৯১৬) ওটেন সাহেব নামে একজন ইংরাজ অধ্যাপক বাঙ্গালী ছাত্রদিগকে অনেকবার বলিয়াছেন :—

"আমরা সভ্য জাতি, গ্রীকরা যেমন অসভ্য জাতির মধ্যে সভ্যতা আনিয়াছিল, আমরাও তোমাদিগকে সভ্যতার আলোক প্রদান করিতেই দয়া করিয়া ভারতে আসিয়াছি।"

এইরূপ ছোট খাটো বিষয়ে বাঙ্গালী ছেলেদের, বিশেষতঃ স্বাধীন চিত্ত যুবকগণের মনোভাব অধ্যাপকের প্রতি তিক্ত হইয়া আসিয়াছিল। একদিন সেই বৎসরের ১০ই জানুয়ারী হেয়ার স্কুলের পুরস্কার সভা হইতে অধ্যাপক মিঃ রবীন্দ্র ঘোষ একটু দেরীতে আসিয়াছিলেন। পার্শ্বের ঘরে ছেলেরা কথাবার্ত্তা বলায়, কিছু গোলমাল হইতেছিল। ওটেন সাহেব উঠিয়া দুই একবার তাহাদিগকে ধমকাইয়া আসেন। অতঃপর অধ্যাপক ঘোষ আসিয়া ক্লাস ছাড়িয়া দিলে ওটেন সাহেব বাহিরে আসিয়া ছাত্রদিগকে ঠেলিয়া দেন, দুই এক জনের গায়ে বেশ ধাক্কা লাগে। কাহারও কাহারও পুস্তকও মাটিতে পড়িয়া যায়। প্রিন্সিপাল মিঃ জেমসের নিকট এই বিষয়ে নালিস করিয়া বিশেষ ফল হইল না দেখিয়া ছাত্রগণ দুই দিন কলেজ বন্ধ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে বোধ হয় এই প্রথম ছাত্র-ধর্ম্মঘট। অধ্যক্ষ ছাত্রগণকে ৫৲ করিয়া জরিমানা করেন। ছাত্রগণ অপমানিত হইল, তাহাদের জরিমানা (ক্ষমা না চাহিলে) রহিয়া গেল, স্বভাবতঃই ইহাতে ছাত্রগণ খুবই উত্যক্ত হইয়া উঠিল। তবে অধ্যাপক দুই এক দিন পরে ব্যাপারটা বেশ বন্ধু ভাবে আলাপ করিয়া মিটাইয়া ফেলেন। কিন্তু আবার সেই অধ্যাপকই প্রথম দিনে (১০ জানুয়ারী) তাহার ক্লাসে যাহারা উপস্থিত হয় নাই, ১৩ই তারিখে মিটমাটের পরেও যাহারা আসে, তাহাদিগকে বাহির করিয়া দেয়। ইহাতে তিক্ততা আরও বৃদ্ধি পায়। তবে কলেজের কার্য্য চলিতে থাকে।

ইহার মাসাধিক পরে উক্ত অধ্যাপকের পার্শ্বস্থ ক্লাসের একটি প্রথম বার্ষিক

শ্রেণীর ছাত্রকে অধ্যাপক ওটেন 'রাসকেল' বলিয়া গলাধাক্কা দিয়া টানিয়া লইয়া যায়। সমগ্র কলেজের ছাত্রগণ ইহাতে খুব উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং প্রিন্সিপাল হইতে কোন ফলোদয় হইবে না বলিয়া, নিজেরাই ওটেন সাহেবকে বেশ উত্তম মধ্যম দিতে উদ্যত হয়। সুভাষচন্দ্র নিজ হাতে প্রহার না করিলেও, সেই দলে ছিলেন, কিন্তু ইহার জন্য তাঁহার এবং আরেকটি ছাত্রকে কলেজ হইতে বিতাড়িত হইতে হয়। সুভাষচন্দ্র হাসিমুখে কলেজ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। এই দণ্ড হইতেই সুভাষচন্দ্রের জীবনে স্বাধীনতা প্রীতির উন্মেষ হয়। তিনি মনে করেন আত্মসম্মান রক্ষা করিতে গিয়া এই যে দণ্ড সহিবার মত সাহসের পরীক্ষা হইল, ভবিষ্যতের দুঃখ ভোগ ও ত্যাগ স্বীকারের ইহাই প্রারম্ভ ও প্রথম পরীক্ষা।

অতঃপর সুভাষ দুই বৎসর মধ্যেই (১৯১৯) আবার পরীক্ষা দিয়া পাশ করেন ও সিভিল সার্ভিস পাশ করিবার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। এখানে প্রথম সংঘর্ষ হইল ইংরাজের ব্যবহারে। কয়েকজনের অনুদার আচরণে সুভাষ তাহাদের প্রতি যে জাত-বিদ্বেষ পোষণ করেন, জীবনে তাঁহার চিত্ত হইতে তাহা কখনও অন্তর্হিত হয় নাই।

তৃতীয় সংঘর্ষ হইল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত চতুর্থ স্থান অধিকার করা সত্ত্বেও ভারতে আসিবার পূর্ব্বেই সেই ইন্দ্রপদে ইস্তফা দেওয়া। তাঁহার পিতা অনেক আশা করিয়া তাঁহাকে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে পাঠাইয়াছেন, একেবারে ইস্তফা দিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করা কম ত্যাগ স্বীকার নয়। ইতিপূর্ব্বে সুভাষচন্দ্র ভিন্ন ভারতবাসী অপর কেহই স্বেচ্ছায় এত বড় লোভনীয় পদ পরিত্যাগ করে নাই। দেশে বিদেশে সকলেই তাঁহাকে নিরস্ত করিতে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না। সকলেই একদিকে—আর সুভাষচন্দ্র একা একদিকে। পিতা ক্ষুন্ন হইবেন, মাতা বিমর্ষ হইয়া পড়িবেন, সহোদরগণ দুঃখিত হইবেন,—এই সব ভাবনা সুভাষকে কম পীড়া দেয় নাই—আবার অন্য দিকে দেশের প্রতি কঠোর কর্ত্তব্য, স্বাধীনতার প্রতি প্রবল আকাঙ্ক্ষা, সময় বুঝিয়া প্রস্তুত হইবার ইচ্ছাও তাঁহাকে অধীর করিয়া ফেলিল। ইতিপূর্ব্বে জালিয়ানওয়ালা

বাগ ও অমৃতসর কংগ্রেসের সব সংবাদই তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগের কথাও তিনি পাইয়াছেন, দেশবন্ধুর বিরাট ত্যাগের কথাও কর্ণগোচর হইয়াছে। একদিকে বিভাগীয় কমিসনার পর্য্যন্ত হওয়ার উচ্চাশা, অন্য দিকে এই শুভমুহূর্ত্ত ছাড়িলে আর আসিবেনা—এই চিন্তা। সকলে কত বুঝাইল, বিলাতের বহু সাহেবও তাঁহাকে অনেকভাবে প্রতিরোধ করিতে চাহিল, কিন্তু প্রতিধ্বনিত হইল বিবেকানন্দের বাণী—'ভারত তোমার মুখাপেক্ষী, ভারত উদ্ধাবে তুমি সক্ষম,' চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হইল শ্রীঅরবিন্দের ত্যাগব্রত ও অনাড়ম্বর জীবন, আর বিঘোষিত হইল চতুর্দ্দিক হইতে স্বরাজ সাধনায় চিত্তরঞ্জনের অপরিমেয় সর্ব্বস্বত্যাগ ও ঐকান্তিক দেশপ্রীতি! সুভাষ ভাবিলেন 'এইতো উপযুক্ত সময়—এইতো শুভ মুহূর্ত্ত, এইতো অসম্ভাবিত সুযোগ—যদি উপযুক্ত মূল্য দিতে পারি তবেই না স্বরাজলাভ দশবৎসরেই হইবে। আর যদি একবার গোলামীর খাতায নাম লিখাইয়া বসি, তবে স্বরাজের কল্পনাও সুদূর পরাহত—এ জীবনে আর তাহা সম্ভব হইবেনা।'

বিবেকানন্দের সাধনার সাফল্য সাধন করিয়া শ্রীঅরবিন্দের পথানুসরণ করিয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া এই যে স্বাধীনতার আলোক সুভাষচন্দ্র দেখিলেন উহাই তাঁহাকে গন্তব্যপথে লইয়া গিয়াছে। যে কণ্টকময় পথে অন্যের পদক্ষেপ সম্ভব নয় বলিয়াই, দেশবন্ধু, শিবাজী বা সুভাষের স্বাধীনতার তীব্রজ্বালার কেহ নাগালই পায়না। নাগাল পায়না বলিয়াই তাঁদের সাহস বা স্বার্থত্যাগ পরিমাপ করাও সাধারণের পক্ষে সাধ্যাতীত।

অতঃপর দেশবন্ধুর দক্ষিণ হস্ত হইয়া সুভাষ যে সমস্ত কার্য্য করেন, সবই সাফল্যমণ্ডিত হয়। পিকেটিংএ কৃতিত্ব, সেবাব্রত লইয়া যুবরাজের আগমনের দিবসের কার্য্যাবলী, ভলান্টিয়ার পরিচালনায় সৈন্যধ্যক্ষের শৃঙ্খলা, জেলে সেবাব্রত-গ্রহণ, এবং উত্তরবঙ্গের বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলে জনসেবা, যুদ্ধপন্থাহিসাবে কাউন্সিলে প্রবেশ পন্থাগ্রহণ, সবই তাঁহার শৃঙ্খলাপ্রিয়তা, সাহস এবং নেতৃত্ব শক্তির পরিচায়ক। ইহার পরে সুভাষ যখন বার্ম্মায় অন্তরীণ অবস্থায় জেলে ছিলেন

সেখানে তিনি ভয়ানক পীড়িত হইয়া পড়েন। তাঁহার দেহ এত দুর্ব্বল ও রক্তহীন হইয়া পড়ে যে ইংরাজ ডাক্তারও শঙ্কিত হন। গভর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করেন তিনি সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানে যাইয়া স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তন করিয়া আসিতে পারেন। বাড়ীর সকলেই—পিতা মাতা সহোদরগণের ইচ্ছা যে তিনি বিদেশে গিয়া পুনরায় হৃতস্বাস্থ্য উদ্ধার করিয়া আসেন। কিন্তু ইনি একা নাছোড়বান্দা—প্রাণ বিনিময়েও স্বেচ্ছায় জন্মভূমি ছাড়িয়া যাইতে রাজী হন নাই, বরং জেলে পচিয়া মরিতেই কৃতসঙ্কল্প হন। এই অদ্ভুত মনোবৃত্তি ও দৃঢ়ব্রত আত্মসম্মান-বিশিষ্ট একান্ত স্বাধীনতাকামীরই উপযোগী—সাধারণের নয়।

অতঃপর নিরুপায় হইয়াই গভর্ণমেণ্ট নাছোড়বান্দা সুভাষকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয় (১৯২৭) এবং অল্পদিন মধ্যেই তিনি হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিয়া প্রাদেশিক কংগ্রেসের নেতা হইয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। এবার আসিল কলিকাতায় ১৯২৮ কংগ্রেস অধিবেশন। সুভাষই হইলেন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক (G. O. C.) জাতীয় মহাসমিতির ইতিহাসে এই প্রথম স্বেচ্ছাসেবকের দল সামরিক কায়দায় সজ্জিত ও শিক্ষিত হয়। আর উহার শিক্ষাদাতা ও একমাত্র নেতা হন সুভাষচন্দ্র।

প্রেসিডেণ্ট পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর অভিনন্দনের দিনে ভলাণ্টিয়ারবর্গের সামরিক কায়দায় পদক্ষেপ (march) ও অভিবাদন (salute) সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। ইহাকে কেহ, কেহ এমন কি মহাত্মাজীও সার্কাসের তামাসা বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এখানেই আজাদ হিন্দ বাহিনীর (ফৌজের) অঙ্কুর উদ্গত হয়,—তেমনি শৃঙ্খলাপূর্ণ ভাব, তেমনি পদক্ষেপ, তেমনি সামরিক কায়দায় অভিভাষণ, তেমনি অধিনায়কের সঙ্কেত-নির্দ্দেশ। অতঃপর আসিল স্বাধীনতা-প্রস্তাব। এইবারে মহাত্মাজী ও পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর প্রস্তাব লইয়া সুভাষ প্রভৃতির সহিত মত পার্থক্য হয়। স্বাধীনতা প্রস্তাবের জন্য মহাত্মাজী সময় চাহিয়াছিলেন দুই বৎসর—সুভাষচন্দ্র বলেন এখনই করিতে হইবে। অবশেষে একবৎসরে নামিয়া আসে। তাহার বলেই—

সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় লাহোর কংগ্রেসের ১৯২৯—স্বাধীনতা প্রস্তাব। আর ইহারই পরে আসে ২৬ জানুয়ারীর স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন ও স্বাধীনতার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ (১৯৩০)।

১৯২৯ সালের কথা—চারিদিকে সংঘর্ষ, গৃহে বিবাদ, বাহিরে মতানৈক্য, কিন্তু সুভাষচন্দ্রকে কেহ কখনও বিচলিত দেখে নাই। বীরের ন্যায় তিনি কার্য্য করিয়া গিয়াছেন ও সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়াছেন। এই সময়ে বাঙ্গালার গভর্ণর স্যার ষ্টানলি জ্যাকসন ঘোষণা করিলেন "আবার আইন পরিষদের সভ্যগণ নির্ব্বাচিত হইবেন।" কেননা মন্ত্রীমণ্ডলী আর স্থায়ী হইতে পারিতেছে না। সুভাষও সংগ্রামের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিলেন না। এই কাউন্সিল এর ব্যাপারে সমগ্র বাঙ্গলা দেশের প্রতি সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিল। তিনি বহু জায়গায় নিজে যাইতে লাগিলেন। অন্যান্য জায়গায ব্যবস্থাও নিজে করিতেন। দেশবন্ধুর শিষ্যের যাহা করা কর্ত্তব্য কোন বিষয়েই চেষ্টার ক্রটি রহিল না, পরিশেষে সমরে তাঁহারই জয় বিঘোষিত হইল।

অতঃপরই আসিল অন্তর্কলহ। দুই দলে বিষম দ্বন্দ্বকোলাহল উপস্থিত হইল। একদলের নেতা হইলেন দেশপ্রিয যতীন্দ্রমোহন, অপর দলের নেতা সুভাষচন্দ্র স্বযং। সম্মুখে বাঙ্গলাদেশের প্রাদেশিক রাষ্ট্র সমিতির নির্ব্বাচন। কে সভাপতি হইবেন ইহাই হইল সমস্যা। সুভাষচন্দ্র, কি দেশপ্রিয়। কোন দলের অধিক সভ্য হইবে,—সুভাষচন্দ্রের কি সেনগুপ্তের? এই অন্তর্কলহেও সুভাষেরই জয় হইল।

আবার আসিল নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে আপিল। সুভাষের মনে হই।। সর্ব্ব ভারতীয় নেতারা, বিশেষতঃ পণ্ডিত মতিলালও এবং তাঁহার স্থিরীকৃত প্রতিনিধি পট্টভি সীতারামীয়া তাঁহার (সুভাষের) প্রতি সুবিচার করিতেছেন না, এই কথা—তিনি নিখিল ভারতে কংগ্রেস কমিটির ব্যাপার সকলের দিকট সংবাদপত্রে বা লিখিতে দ্বিধা করেন নাই। সত্য বটে পিতৃতুল্য বৃদ্ধ পণ্ডিতজীর কাছে প্রকাশ্য কমিটিতে তিনি ক্রটি স্বীকার করেন, কিন্তু তাহা বয়সের ও অভিজ্ঞতার

প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য, কিন্তু তিনি নিজের মত ছাড়িলেন না।—বাঙ্গালার কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্টের পদ তাঁহারই রহিল।

এই বৎসরেই শহীদ যতীনদাসের অনসন ও তজ্জনিত ইংরাজ সরকারের আচরণের প্রতিবাদ। শোভাযাত্রার জন্য সুভাষও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ধৃত হইলেন। কিছুদিন বিচারের পরে জেল হইল বটে, কিন্তু হাসিমুখে তিনি কারাবরণ করিলেন। আবার যতীনদাসের মৃতদেহ আনাইয়া হাওড়া টাউন হল হইতে কেওড়াতলা ঘাট পর্য্যন্ত বিপুল শোভাযাত্রাও পরিচালনা করেন সুভাষচন্দ্রই। সেই বৎসরেই লাহোর নওজোয়ান সমিতির সভাপতিত্ব করিবার সময়ে তাঁহারই নির্দ্দেশে সভাগৃহে গোয়েন্দা বা সাধারণ পুলিশের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়।

সেই বৎসরেই কংগ্রেসের অধিবেশন হয় লাহোরে। লাহোরের অধিবেসনে প্রধান প্রস্তাবই ছিল "স্বাধীনতা প্রস্তাব।" আর মহাত্মা গান্ধী সেই প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। কিন্তু সুভাষ চাহিলেন আরও অগ্রসর হইতে। তাঁহার উদ্দেশ্য হইল "কেবল প্রস্তাবেই সাফল্য আসিবে না, যেমন স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছ, কাজ আরম্ভ করিয়া দাও। আইরিস সিনফিন্‌রা যেমন সমানে সিয়ানে নিজেদের একটি স্বরাজ-সরকার গঠন করিয়াছিল, আপনাদেরও সেইরূপ করিতে হইবে। একটা বৎসর আপনারা হেলায় অতিবাহিত করিয়্যছেন, এই প্রস্তাবতো গত বৎসর পাশ করাইয়া কাজ আরম্ভ করা যাইত। আপনারা 'সমান্তরাল সরকার' (Parallel Government) আরম্ভ করিয়া দিউন।"

মহাত্মাজী উত্তর করেন—"কাগজে কলমে তাহা সম্ভব হইতে পারে বটে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহা সম্ভব হইবে না—যে শৃঙ্খলা, সংগঠন রীতি ও শক্তি সমান্তরাল স্বরাজ-সরকার গঠনে আবশ্যক, তাহা আমাদের কোথায়?" অবশ্য সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাবই ভোটে পরাজিত হইল। ফলে সেইবার ওয়ার্কিং কমিটিতে সুভাষচন্দ্র, শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ও টি-প্রকাশনেরও স্থান হইল না। মহাত্মাজী বলেন ওয়ার্কিং কমিটিকে একমনোভাব সম্পন্ন ব্যক্তিগণ দ্বারা গঠিত না করিলে কার্য্যে বিশৃঙ্খলা

আসিবে। কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন সেবার পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। তিনি নির্দ্দেশ দিলেন চিরাচরিত নিয়মানুসারে—প্রেসিডেণ্ট এবং ওয়ার্কিং কমিটি পরবর্ত্তী ওয়ার্কিং কমিটীর জন্য যে তালিকা দাখিল করিবেন, তাহা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী পাশ করিয়া দিয়া থাকেন, এবারেও তাহার ব্যত্যয় হইবেনা। অলইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটীতে ভোট হইল না, ওয়ার্কিং কমিটীতেও সুভাষের স্থান মিলিলনা। সুভাষ ছাড়িয়া দিলেন। তিনি মনে করিলেন এ সংখ্যাগরিষ্ঠের অত্যধিক বাড়াবাড়ি অত্যাচার কিন্তু একদিন এই সব প্রভুত্ব ভাবাপন্ন এবং ধনিকের প্রভাবযুক্ত ব্যক্তিগণের ক্ষমতা খর্ব্ব হইবেই। সুভাষ 'কংগ্রেস ডিমক্রেটিক পার্টি' গঠন করিয়া দেশবন্ধুর সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী বাসন্তী দেবীর আশীর্ব্বাদ চাহিয়া পাঠাইলেন—তিনি মাকে তার করিয়া জানাইলেন—

"সংখ্যা গরিষ্ঠের দৌরাত্মে নূতন এক স্বতন্ত্র দল গঠন করিলাম—দেশবন্ধুর পবিত্রাত্মা ও আপনার আশীর্ব্বাদই আমাদের প্রাণে উদ্দীপনা জাগাইবে, আমরা গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে পারিব।"

কিন্তু সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস ছাড়িলেন না অথবা কংগ্রেসের নির্দ্দেশও—"পরিষদের সদস্যগণ পরিষদ ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসুন" অমান্য করিলেন না, গ্রামে গ্রামে যাইয়া নিজ পদ্ধতিতে সমগ্র দেশকে দীক্ষিত করিতে অগ্রসর হইলেন। তবে কিছু করিবার পূর্ব্বেই পূর্ব্বকথিত মোকদ্দমার রায় বাহির হইল, সুভাষ একবৎসরের জন্য তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত সেণ্ট্রাল জেলে রাজ অতিথিরূপে গৃহীত হইলেন। শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায়, ডাক্তার যতীন্দ্র মোহন দাশগুপ্তও ছিলেন তাঁহার সঙ্গী।

সুভাষচন্দ্র জেলে রহিলেন ব্রহ্মচারীর মত, পাঠ, অধ্যয়ন, প্রাণায়াম, ন্যাসেই সময় কাটিত। ব্যসনের মধ্যে রহিল অতিরিক্ত চা-পান। এখানে আবার জেল সুপারিণ্টেণ্ডের অত্যাচার অসহ্য হইল। সেই সময় ১৯৩০ এর সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইয়াছে, বন্দীতে জেল তখন পরিপূর্ণ। আবার—মেছুয়াবাজার বোমা মোকদ্দমার আসামীরাও এখানে বিচারের প্রতীক্ষায় হাজত-বাসী। আবার

শ্রীসত্যরঞ্জন বক্সী, অধ্যাপক নৃপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজ্ঞানাঞ্জন নীয়োগী ও শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস প্রভৃতিও ছিলেন। দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত রাজদ্রোহ-মূলক পুস্তক পাঠ করিয়া জেল ভোগ করিতেছেন। মেছুয়াবাজারের বন্দী আসামী-গণের সহিত জেলওয়ার্ডার গণের কি একটা বচসা হওয়ায়, ফিরিঙ্গী বন্দীগণকে জেল হইতে বাহির করিয়া তাহাদিগের বিরুদ্ধে লেলাইয়া দেওয়া হয়, এদিকে পুলিসও প্রহারে উদ্যত হইল। প্রহারে মেছুয়াবাজার বন্দীদের দেহ যখন রক্তাক্ত, বাহিরে আসিলেন সুভাষ ও সেনগুপ্ত। প্রহরীগণ ছুটিল তাঁহাদের দিকে। জোর করিয়া উভয়কে নিজ নিজ 'সেলে' (গৃহে) আটকাইয়া রাখিবার জন্য ধাক্কা মারা হইল। সুভাষ রুখিয়া দাঁড়াইলেন, প্রহরিদের কিল ঘুষি লাঠি চলিল তাঁহার উপর, —সুভাষ ভীষণ ভাবে প্রহৃত হইয়া পড়িয়া গেলেন। কোন ডাক্তার দেখানো হইল না। বিন্দুমাত্র শুশ্রষা করা জেল-কর্ত্তৃপক্ষ উচিত বিবেচনা করিল না, কিন্তু ডাক্তার যতীন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত জেল কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ আদেশ লইয়া ছুটিয়া আসিলেন—সুভাষকে শুশ্রূষা করিলেন। অতঃপর অনেক লেখালেখি চলিল—ফলে রাজ নৈতিক বন্দীদের কিছু সুবিধা হইল আর সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সোমদত্ত স্থানান্তরিত হইল। এইভাবে প্রতিবাদ জানাইয়া, প্রহৃত হইয়া, অনসন করিয়া সুভাষ কয়মাস জেলখানায় থাকিয়া ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জেলের বাহিরে আসিলেন।

বাহিরে আসিয়াই কর্পোরেশনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল মেয়র নির্ব্বাচনে। কর্পোরেশনের তিনিই মেয়র হইলেন। যে কারণেই হোক, দেশপ্রিয়ের নির্ব্বাচন বাতিল হইয়া যায়, সুভাষই তাঁহার স্থানে গুরু দেশবন্ধুর আসনে অভিষিক্ত হইলেন। কেন সুভাষ সেনগুপ্তকে স্থানটি ছাড়িয়া দিলেন না— অনেকের কণ্ঠেই এই ধ্বনি শ্রুত হইত। কিন্তু রাজনীতি খাতিরের জিনিষ নয়। সেনগুপ্ত লোক সুজন এবং তাঁর প্রতি সুভাষের শ্রদ্ধাও ছিল খুব। কিন্তু দলাদলিতে সেখানকার অনেক কাজ পণ্ড হইতেছে। কর্পোরেশনে সুভাষই কিছুদিন পূর্ব্বে প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। কর্পোরেশন তিনি জানেন আর

কর্পোরেশনের কর্ত্তৃত্ব তাঁহাকেই পাইতে হইবে। পাইতে হইবে লোকের সুবিধার জন্য, উহার কার্য্যের পরিচালনার জন্য, কর্ম্মীদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য, নিজের মতানুযায়ী নাগরিকদের সঙ্গে কাজ করিবার জন্য। কিন্তু অধিক দিন বাহিরে থাকিতে হইলনা, আবার সরকারের আহ্বান আসিল।

১৯৩১ সালের জানুয়ারী মাসে বহরমপুরে রাজনৈতিক বন্দীদের একটি সম্মেলন হয়। সুভাষচন্দ্র ভবিষ্যৎ কর্ম্মের একটি প্রকৃষ্ট তালিকা দিয়া এই কর্ম্মীদিগকে কাজে লাগাইবার জন্য একটি অতি মনোজ্ঞ অভিভাষণ দেন, এবং তৎপরেই জিয়াগঞ্জে আহূত হইয়া সেখানে এক বিরাট জনসঙ্ঘের নিকট বক্তৃতা করেন। তৎপরে তাঁহাকে মালদহে যাইতে হয়। তখন দলাদলির জন্য স্থানীয় কংগ্রেস কর্ম্মীরাও তাঁহাকে যাইতে নিষেধ করে, কিন্তু কয়েকজন কর্ম্মী তাঁহাকে লইয়া যাইতে জেদ করেন। কিন্তু ঘটনাস্রোত অন্য দিকে প্রবাহিত হইল। আমনুরা ষ্টেসনে পৌছিবা মাত্রই তাঁহাকে একজন পুলিসের দারোগা আসিয়া ১৪৪ ধারার একখানা নোটিস দিয়া তাঁহাকে মালদহ জিলায় প্রবেশ করিতে নিষেধ করে, কিন্তু সুভাষচন্দ্র একই উত্তর দেন—

"আপনার উপর ওয়ালাদের বল্‌বেন, যে এ আদেশ আমি অমান্য করিলাম"।

মালদহ পৌছিতে পৌছিতেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বিচারের প্রহসনও সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইয়া যায়। সাতদিনের বিনাপরিশ্রমে কারাভোগের আদেশে সুভাষচন্দ্র আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে প্রেরিত হন।

এত অল্পদিন ভাল লাগিলনা বলিয়াই বোধ হয় শীঘ্র শীঘ্র আবার তৈয়ারী হইলেন। ২৬শে জানুযারী আসিতে বিলম্ব হইল না। স্থির হইল কর্পোরেশন হইতে একটি শোভাযাত্রা বাহির হইবে, আর মেয়র সুভাষচন্দ্র নিজে নেতৃত্ব করিবেন। এইকথা শুনিয়া প্রাতে আসিয়া পুলিসের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী শ্রী পুলীন চাটার্জ্জী (পরে ডেপুটি কমিশনার) সুভাষচন্দ্রকে নিরস্ত করিয়া বলেন :—

"এখনও শোভাযাত্রা বন্ধ আছে। আপনি বাহিরে যাইবেন না"।

সুভাষ—কেন, অপনার বড় সাহেবের হুকুম নাকি ?

পুলিশ—আজ্ঞা হাঁ, সেইরূপই বটে।

সুভাষ—আপনার বড়সাহেবকে বলিবেন, আমি সেই আদেশ ভঙ্গ করিতে চাই।

পাঁচটা বাজিল, এডুকেসন অফিসার শ্রীক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশৈলেন্দ্র ঘোষাল, ক্যাপ্টেন নরেন দত্ত প্রভৃতি অনেকে আসিলেন। সুভাষচন্দ্র মেয়রের ঘরে নিজ আসনেই উপবিষ্ট ছিলেন। সকলে জাতীয় পতাকা হাতে লইয়া অগ্রসর হইলেন। পূরোভাগে পতাকা হস্তে সুভাষচন্দ্র—রহিলেন। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে শোভাযাত্রায় অনেক মহিলারাও ছিলেন। কর্পোরেশন ষ্ট্রীট্ অতিক্রম করিয়া চৌরঙ্গী রোড্ পার হইয়া শোভাযাত্রা যাই অকটারলনি মনুমেণ্টের কাছে উপস্থিত হইল, পুলিস বাহিনীই আসিয়া উহা যাইতে বাধা দেয়। পুলিসের সম্মুখভাগে ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রবার্টসন। সুভাষচন্দ্র বাধা মানিলেন না, পুনরায় অগ্রসর হইলেন, আর অমনি গায়ে মাথায় কপালে পুলিসের অবিশ্রান্ত লাঠি, ঘুষি, কিল চড় চলিল। অনেকেই আহত হইলেন—সুভাষচন্দ্রের আঘাতটা হইল কিছু সাংঘাতিক রকমের। আরও অত্যাচার,—সেই রাত্রি ও পরদিন কোর্টে আসিবার সময় পর্য্যন্ত তাঁহাকে লালবাজারের পুলিস আফিসে থাকিতে হয়—তাতে না ছিল স্নানের বন্দোবস্ত, না রক্তাক্ত পোষাক পরিবর্ত্তনের বন্দোবস্ত, না কোনরূপ ভোজনের আয়োজন। সমস্ত রাত্রি অস্নাত, অভুক্ত, অচিকিৎসিত অবস্থাই থাকিতে হইল। পরদিন সকালে যখন তিনি বিচার প্রতীক্ষায় আদালতে দণ্ডায়মান, চীফ্ প্রেসিডেণ্ট, মিঃ রক্সবার্গ দোষী কি নির্দ্দোষী জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলেন—

"বিচারের কথা সম্বন্ধে আমি বলিতে চাই যে আমি অসহযোগী—কোন কথা বলিব না। বিচার বা উহার ফল সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, কিন্তু লালবাজার পুলিসের ব্যবহার কি লজ্জাকর তাই আপনার গোচরে আনিতে চাই। কোনরূপ ঔষধ পত্র বা চিকিৎসরেরও ব্যবস্থা নাই। একবার আপনি দেখিয়া আসুন যে কিরূপ নরককুণ্ড সেই স্থানটি।"

ম্যাজিষ্ট্রেট—আচ্ছা, আপনার যা বলিবার আছে, একখানা দরখাস্ত দিয়া জানান।

সুভাষচন্দ্র—আমি লিখিতে অক্ষম, আমার হাত পুলিসের আঘাতে বিকল—

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন 'আমি লিখিয়া লইব'।

কি লিখিলেন তিনিই জানেন, তবে অবিলম্বে আদেশ হইল "ছয় মাসের দণ্ডভোগ"। সুভাষচন্দ্র বিনা বাক্য ব্যয়ে জেলে রওনা হইলেন, আর কোন আপত্তি করিলেন না।

গান্ধী আরুইন চুক্তিতে সুভাষচন্দ্র সত্বরই মুক্তিলাভ করিলেন বটে, কিন্তু ঐ চুক্তি তাঁহার আদৌ মনঃপূত হয় নাই। ১৯৩১ সালে যে করাচীতে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তাহাতে কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের কাজে কোন বাধা না দিলেও, তাঁহাদের আপোষ প্রভৃতি ব্যাপারে তাঁহার মোটেই সমর্থন ছিল না। তিনি সমাজ-তন্ত্রীবাদীদের মত কৃষক মজুবদের তৈয়ার করিতে নির্দ্দেশ দেন।

তার পরে ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট ডুর্নোর প্রতি আক্রমণ ও ঢাকার পুলিসের অমানুষিক অত্যাচারের জন্য যে ঢাকায যান, সেখানে এলিসন পুলিস সুপারিণ্টেণ্ড তাঁহাকে যে কিরূপ জ্বালাতন করিয়াছিল—কখনও বা জলে ফেলিয়া দেয়, কখনও বা নিলখির চরে নামাইযা দেয় কখনও বা জেলে পুরিয়া দেয় কিন্তু সুভাষচন্দ্র কিরূপে যে নিজের স্বাধীন ভাব সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়াছিলেন—তাহাতো স্বচক্ষেই দেখিয়া আসিয়াছি। কলিকাতা হইতে নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত এক সঙ্গেই গিয়াছিলাম।

তারপরে আসিল আবার ১৯৩১ অক্টোবরের অর্ডিনান্স, মহাত্মাজীর প্রতিবাদ ও সত্যাগ্রহে সঙ্কল্প ভাব।

মহাত্মাজী লণ্ডন হইতে ডিসেম্বর মাসের শেষ আসিয়া পৌছেন, অতঃপর ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেসনে উপস্থিত হইতে সকলে বোম্বাই যান। মহাত্মাজী ও সর্দ্দার প্যাটেলকে ইয়ারবেদা জেলে রাখা হয়, আর সুভাষচন্দ্রও বোম্বাই হইতে যখন কলিকাতা রওনা হয়েন, ত্রিশ মাইল দূরে কল্যাণ ষ্টেশন আসিতেই পুলিস তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া গাড়ীতে করিয়া কোন্ এক অজ্ঞাত স্থানে পাঠাইয়া দেয়, তাহা কেহ জানিতে পারিল না।

এক বৎসরে সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য যখন শঙ্কটাপন্ন হয়, তাঁহাকে ভিয়েনা সহরে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। গ্রেপ্তারের পরে পাঁচবৎসর পর্য্যন্ত তাঁহাকে নানা স্থানে থাকিতে হয়, অতঃপর ১৯৩৭ সালের ১৭ মার্চ্চ তারিখে বিনাসর্ত্তে তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করা হয়। ইউরোপে থাকিতে সর্দ্দার বিথল ভাই প্যাটেলের সহিত সম্প্রীতি এবং রোমারোঁলার সঙ্গে সংলাপনে তাঁহার মানষিক গতির ধারা কতকটা বুঝা যায়। সর্দ্দার প্যাটেল ও সুভাষচন্দ্র কতকটা এক মতাবলম্বী ছিলেন এবং তিনি উইলে সুভাষচন্দ্রকে অন্যতম অছি করিয়া ইউরোপে প্রপাগাণ্ডা চালাইবার জন্য অর্থের বন্দোবস্ত করিয়া যান ও সে ভার সুভাষচন্দ্রের উপরেই দিয়া যান।—সুভাষ চন্দ্র রোমা রোঁলার সঙ্গে যে কথাবার্ত্তা বলেন এবং 'ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগল' নামক যে পুস্তক লেখেন তাহাতে তিনি গান্ধীজীর নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃত্বের পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। রোমা রোঁলার সঙ্গে নিম্নলিখিত কথাবার্ত্তা (১৯৩৫, ৩রা এপ্রিল) বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

সুভাষচন্দ্র—একতার অভাবে যদি গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন বিফল হয়, তবে উহার সহিত এক ভাবের না হলেও, অন্য ভাবের অন্য কোন আন্দোলন চালানোর ঔচিত্য সম্বন্ধে আপনার মত কি ?

রোমা—যদি গান্ধীজীর আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা লাভ সম্পর্কে বিফল হয়, তবে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইব ও আমার আশা ভাঙ্গিয়া যাইবে। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সাফল্যের দিকে সমগ্র জগৎ মুগ্ধ ভাবে তাকাইয়া রহিয়াছে।

সুভাষ—মহাত্মাজীর আদর্শ বাস্তব জগতে খাটে না বলিয়াই আমাদের প্রত্যয় জন্মিয়াছে। ভারত ব্রিটেনকে চায় না একথাও সত্য। যদি সত্যাগ্রহ ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনে ব্যর্থ হয় তবে আপনি কি মনে করেন, সত্যাগ্রহ ভিন্ন অন্য কোন আন্দোলনই সম্ভব নয়? না মনে করেন যে সত্যাগ্রহ ছাড়াও মুক্তির জন্য অন্যরূপ সংগ্রামের পথে যাওয়া যুক্তি সঙ্গত ?

রোমা—না, সত্যাগ্রহ বন্ধ হইলেও, চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না। সংগ্রাম চালাইতেই হইবে।

ইহাতে মনে হয় সংগ্রামের জন্য আবশ্যক হইলে সত্যাগ্রহ ভিন্ন অন্যরূপ পন্থা অবলম্বনেও সুভাষচন্দ্রের অনিচ্ছা ছিল না। এবং তিনি যদি মনে করিতেন সত্যাগ্রহের দ্বারা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জিত না হইলে ভারতের আন্তর্জ্জাতিক অবস্থায় অন্য আন্দোলন, অর্থাৎ বাহিরে গিয়া তথা হইতে ইংরাজ তাড়াইবার জন্য ভারত আক্রমণ অন্যায় নয়, তাহা হইলে ইহাতে অন্ততঃ রোমা রোঁলার সমর্থন ছিল না, বলা যায় না।

অতঃপর দেশে আসিলে ১৯৩৮ সালে হরিপুরে যে কংগ্রেস অধিবেশন হয় তাহাতে সুভাষচন্দ্রই রাষ্ট্রপতির আসন গ্রহণ করেন। এই প্রথম সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস অধিপতিগণ এবং মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে একমতে কাজ করিতে দেখা যায়। কিন্তু তাহাতে যদি কেহ মনে করেন প্রেসিডেন্ট হইবার জন্য সুভাষচন্দ্র মত পরিবর্ত্তন করিয়া ছিলেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই ভুল করিবেন। আমাদের শাসনতন্ত্র পূর্ণ স্বাধীনতার ভিত্তির উপর এক মাত্র গণপরিষদই করিতে পারে আর দেশীয় রাজ্য ও আমাদের প্রদেশগুলির সমতা ভাব থাকিলেই ফেডারেশন (যুক্ত রাজ্য পরিকল্পনা) সম্ভব, নতুবা অসম সম্বন্ধ থাকিলে উহাতে কেবল ভিতরের গোল যোগ এবং পরস্পরে বিবাদই বৃদ্ধি পাইবে—ইহাই ছিল তাঁহার অভিভাষণের তাৎপর্য্য ও মূলকথা।

সমগ্র ১৯৩৮ সাল নিয়ম তান্ত্রিকের ন্যায় রাষ্ট্রপতির কার্য্য সম্পন্ন করিলেও শেষ দিকে নেতৃবৃন্দ ফেডারেশনের ভিত্তি করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারেও ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতে চান আশঙ্কা করিয়া সুভাষচন্দ্র প্রকাশ্যে নিজের স্বতন্ত্র ও অন্যান্য সহকর্ম্মীদের বিরোধীয় মত প্রকাশ করেন। এই সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ হওয়ার কতকগুলি কারণ উপস্থিত হয়—

(১) মাননীয় ভুলাভাই দেশাইর বিলাতে নাকি স্যার ফ্রেভারিক হোয়াইটের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা হয় বলিয়া সংবাদপত্রে বাহির হয়।

তবে এ সম্বন্ধে কংগ্রেস এইরূপ আলোচনা প্রসঙ্গ অস্বীকার করেন।

(২) ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে স্যার রাসব্রুক উইলিয়ামস্ মানচেষ্টার

গার্ডিয়ান" কাগজে লেখেন যে দক্ষিণ পন্থীগণ যেন ক্রমেই ফেডারেশনের দিকে ঢলিয়া পড়িতেছে।

(৩) সহকারী ভারত সচিব লর্ড মুইরহেড আসিয়া মহাত্মার সঙ্গে রুদ্ধ কক্ষে আলাপ করেন। কি আলাপ করেন কেহ জানিতে পারে না। লর্ড লোথিয়ানের সঙ্গেও এ বিষয়ে মহাত্মাজীর পত্রাদি চলে। লর্ড লোথিয়ান পুণায় এক সভায় বক্তৃতার সময় বলেন ফেডারেশন সম্বন্ধে ভারতের সব নেতারাই পণ্ডিত জওহরলালের সমর্থন করেন না। বলা বাহুল্য পণ্ডিত জহরলাল ফেডারেশনের বিরোধী ছিলেন।

অতঃপরই হরিজন পত্রে (১৯৩৯, ১১ ফেব্রুয়ারী) মহাত্মাজী লেখেন "দেশীয় রাজ্যগুলির শাসন ব্যাপার এমন কদর্য্য যে আমি বুঝিতে পারি না যে তাহাদের সঙ্গে কিরূপে কংগ্রেসের মতৈক্য হইতে পারে।" এই সমস্ত ব্যাপারেই সুভাষচন্দ্রের সন্দেহ হয়। কিন্তু ভারতীয় নেতারা ফেডারেসন প্রশ্নটাই উড়াইয়া দেন। তাঁহারা বলেন সুভাষচন্দ্রের অনুমানের যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।

এই সব ব্যাপারে মত পার্থক্য এত সুস্পষ্ট হইয়া পড়ে যে সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয় বারেও কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের পদপ্রার্থী হন। এবং ডাক্তার পট্যভী সীতারামীয়াকে পরাভূত করিয়া নির্ব্বাচিতও যে হন তাহা সকলেই জানে। অনেকে মনে করেন দুইবার সভাপতি হইবার লোভেই সুভাষ আবার নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়াছেন। বিশেষতঃ পণ্ডিত জওহর লাল নেহরুর সঙ্গে তাঁহার প্রতিযোগিতায়, তিনি কয়বার সভাপতি হইয়াছেন এখন সুভাষেরও হওয়া চাই, তাই তিনি দাঁড়াইলেন এবং নূতনের উদ্যম দেখিয়াই নবভাবাকাঙ্খী প্রতিনিধিগণ অতি মাত্রায় তাঁহাকে ভোট দিয়াছে। এই সমস্ত সিদ্ধান্ত তাঁহারাই করেন যাঁহারা সুভাষচন্দ্রের মনোভাব বুঝিবার মত ক্ষমতা রাখেন নাই।

দেশবন্ধু যে বৎসর দৈনিক ফরওয়ার্ড কাগজ বাহির করেন (১৯২৩) সুভাষ চন্দ্রের সঙ্গে সম্পাদকীয় বিভাগের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের সঙ্গে সংলাপনে তাঁহার মনোভাব প্রকটিত হয়। তিনি মনে করেন বাহিরের কোন শক্তিশালী অথচ

ভারতের প্রতি সহানুভূতি মননশীল জাতির সহায়তা ব্যতীত সহজে ইংরাজকে বিতাড়ন করা সহজ হইবে না। আর ভারতভূমি হইতে ইংরাজ জাতির উচ্ছেদ না হইলে ভারতের কোন মঙ্গলই সম্ভব নয়। এই অভিলাষ কেবল তাঁহার মনের কোণেই নিহিত ছিল না, তিনি লোক মারফতও ভূতপূর্ব্ব গুপ্ত আন্দোলনের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী রাসবিহারী বসু (পরে জাপানে নাগরিক অধিকার সম্পন্ন ভারতীয় বীর) মহাশয়ের সহিত ও কথাবার্ত্তা চালান।

রাসবিহারী যে জাপানে ১৯১৫ সালে পি. এন. ঠাকুর নাম দিয়া পলাইয়া যান এবং সেখানে জাপানের অন্যতম সচিবের কন্যা বিবাহ করিয়া নাগরিক অধিকার লাভ করেন, তাহা পূর্ব্বে খণ্ডে বিবৃত করিয়াছি। সেখানে গিয়া তিনি জাপানী পোযাক এবং স্থানীয় আচার ব্যবহারে অভ্যস্ত হইলেও ভারতবর্ষকে একদিনের জন্যও ভুলিয়া যান নাই, তাহা অন্ততঃ চন্দননগরে শ্রীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে লিখিত পত্রাদিতে বুঝিতে পারা যায়। জাপানে কেবল যে রাসবিহারী বাসই করিয়াছেন তাহা নয়, সেখানে তাঁহার নূতন জীবন সঞ্চার হইয়াছে। তিনি লিখিতেছেন "গুপ্ত আন্দোলনে মুক্তি আসিবে না। আমরা যাহা বলিব বা করিব প্রকাশ্যে করা দরকার"—।

প্রকৃতপক্ষে ভারতে ইংরাজ রাজের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন না। ১৯১৫ সালে জাপানের সাহায্যেই এবং কাইজারের অর্থে ও স্বার্থে দুইটি অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত জাহাজ ভারতের দিকে রওনা হইয়াছিল।

অহিংস আন্দোলনে যোগদান করিয়া এইরূপ মনোভাব পোষণ করার অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি উত্তর দিতেন—

"ভারতের স্বাধীনতাই আমাদের একমাত্র কাম্য, পদ্ধতি যেরূপই হৌক। তবে এখন আমরা মহাত্মাজীর নির্দ্দেশেই চলিব, কারণ তাঁহার বিপুল প্রতিপত্তি। ইহার বিরোধী হওয়া কেবল শক্তি ও সময়ের অপব্যবহার মাত্র, কিন্তু এই অহিংস আন্দোলনে বিফলতা আসিলে আমরা চুপ করিয়া না বসিয়া থাকিয়া অন্যভাবেই সংগ্রাম চালাইব।"

"জাপান যদি এই সুযোগে নিজেই প্রভুত্ব চাহিয়া বসে ?"

এইরূপ প্রশ্ন হইলে সুভাষচন্দ্র উত্তর করেন—

"তাহা সম্ভব হইবে না। কোন জাতি যদি বাহিরের কোন জাতিকে না চায়, তবে উক্ত বাহিরের জাতির প্রতিষ্ঠা লাভ করা সম্ভব নয়। ইংরাজ এখন আসন গাড়িয়া রাখিয়াছে তথাপি তাহার এখন অসোয়াস্তি ভাব, প্রাণে শান্তি নাই। ইহার উপরে আমাদের এই জাগরণের মুখে আবার একটা নূতন জাতির পক্ষে নূতন করিয়া ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা আদৌ সহজ হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ—ভারতবর্ষ হইতে ইংরাজ চলিয়া গেলে অর্থনৈতিক বিষয়ে জাপানের স্বার্থ প্রাচ্যে সংরক্ষিত হইবে। এসিয়াবাসীদেরই ক্ষমতা বৃদ্ধিতে জাপান নিজের লাভ মনে করিবে।

অনেকে বোধ হয় অবগত নহেন যে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চেতনা জাগাইবার জন্যই ১৯০৩, ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে জাপানের ওকাকুরা * বাঙ্গলা দেশে আসিয়া ছিলেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে সুভাষচন্দ্র এই নূতন জাপানের সহায়তা চাহেন নাই, পোনর বিশবৎসর হইতে জাপানের দিকে সুভাষচন্দ্র চাহিয়া রহিয়াছিলেন। আরও বুঝিয়াছিলেন শীঘ্রই যুদ্ধ বাধিবে এবং এবার জাপান প্রথম মহাযুদ্ধের মত আর ইংরাজের দিকে যাইবে না, ইংরেজের বিপক্ষেই যাইবে। তাই সুভাষচন্দ্র মনে করিতেন এই সুযোগে জাতীয় মহাসম্মিলনীর গতি প্রকৃতি ও কার্য্যকলাপ ভারতের হিতার্থে তাঁহার ন্যায় একজন বামপন্থী এবং সম্পূর্ণ ইংরাজ বিদ্বেষী ব্যক্তির হাতে থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। যদি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ আন্তরিকতা লইয়া অন্য কেহ সেই ভার গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইতেন, সুভাষচন্দ্রের আপত্তি ছিল না। কিন্তু কাহাকেও তিনি সেরূপ ভাবের দেখেন নাই বলিয়া তিনি নিজেই

ওয়াকুরার Ideals of two East পুস্তকে ভগিনী নিবেদিতা লিখিয়াছিলেন 'Asia is one Himalays divided but bring nearer the two mighty civilizations of the East.

সেই ভার গ্রহণে অগ্রণী হইয়াছিলেন। প্রেসিডেণ্ট প্রার্থী হওয়ার মনোভাব এই জন্যই ছিল।

সুভাষচন্দ্রের জয়ে যে গান্ধীবাদের পরাজয় তাহা বুঝিয়াই সত্যসন্ধ মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন—

"সুভাষের জয়ে আমার পরাজয়। স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে প্রতিনিধিগণ (Delegates) আমার নীতি এবং কর্ম্মপন্থার পক্ষপাতী নয়।"

ইহার পরে আসিল ওয়ার্কিং কমিটী গঠনের পালা যদি। প্রতিনিধিগণ শেষ পর্য্যন্ত সুভাষচন্দ্রের দিকেই থাকিতেন এবং সুভাষচন্দ্র মনের মত ওয়ার্কিং কমিটী গঠন করিতে পারিতেন, তবে কংগ্রেসের কাজ সুভাষের ভাবেই চলিত। কিন্তু শ্রীগোবিন্দ বল্লভ পন্থের উত্থাপিত গণতন্ত্র বিরোধী প্রস্তাবে দেখা গেল মহাত্মাজীর প্রভাব তখনও খুব বেশী। সুভাষও কতকটা সেরূপই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই ঘটনাস্রোত অন্যরূপ দাঁড়াইল। যদি সুভাষ নিজেই ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিয়া নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভায় উপস্থিত করিতেন, জিতিলে অবশ্য কংগ্রেসের কার্য্য তাঁহার নির্দ্দেশিত পন্থায়ই চলিত। হারিলেও গণমতের ভাব বুঝা যাইত। কিন্তু একদলের সভ্য না লইয়া সকলদলের সভ্য নিয়া ওয়ার্কিং কমিটীর গঠন, ব্যাপারে তিনি সাময়িক দুর্ব্বলতা দেখাইয়াছিল বটে, তবে কলিকাতার এ, আই, সি, সির সভায় প্রেসিডেণ্টের পদ ত্যাগ করিয়া যে ধীরতা, সংযম ও ও ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন তাহাও তাঁহার চরিত্রেরই অনুরূপ।

ইহার পর বামপন্থী হইয়া দেশের সর্ব্বত্র নিজের মতবাদ প্রচার, ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন ও লালদিঘীর ইংরাজ রাজত্বের স্তম্ভস্বরূপ হল ওয়েল স্তম্ভ ভাঙ্গিবার ব্যাপারে সত্যাগ্রহে যে কর্ম্মপ্রেরণা প্রদর্শন করেন, তাহা পরবর্ত্তী ঘটনার তুলনায় নিতান্ত তুচ্ছ হইলেও, কোন সময়েই ইনি যে অলস ভাবে নিষ্ফল অসুস্থতায় সময় ও শক্তির অপব্যহার না করিয়া আরও কর্ম্মনিরত জীবন যাপনই করিয়া গিয়াছেন তাহাই প্রমাণিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে মহাজাতি সদনের ব্যাপারও গঠন মূলক কার্য্যের অকিঞ্চিৎকর নিদর্শন নয়। কবিগুরু ঐ সদনের ভিত্তি স্থাপন করেন ১৯৩৯

খৃষ্টাব্দের ১৯শে আগষ্ট। কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড কর্ত্তৃক বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী হইতে বিতাড়ন ওয়্যাড্ হক্ কমিটী গঠনের পরিণতি হয় রামগড়ে কংগ্রেস অধিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে। তাঁহার আপোষ অবিরাম সংগ্রামের পরিকল্পনা অন্তর্জাতিক অবস্থা বুঝিয়া নানাভাবে সত্যাগ্রহ করিবার কল্পনা কার্য্যে পরিণত করা, কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে করা সহজসাধ্য নয় বলিয়া তিনি বড়ই ম্রিয়মান ছিলেন। কিন্তু ভগবান তাঁহার বিরাট হৃদয়ের অনুরূপ জন্মভূমির মুক্তির জন্য একান্ত অশান্ত-চিত্তের উপযোগী, অমানুষিক স্বদেশ প্রেমের জ্বলন্ত নিদর্শন স্বরূপ এমন এক সুযোগ তাঁহাকে প্রদান করিলেন যে যত দিন যাইবে সুভাষচন্দ্রের নাম জগতের ইতিহাসে গ্যাম্বো, ওয়াসিংটন, লেনিন, শিবাজি, ফ্রাঙ্কোর মতই উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। ক্রমে আমরা, সে কাহিনী বলিতেছি।

হলওয়েল মনুমেণ্ট ভাঙ্গিবার জন্য যখন সত্যাগ্রহ চলিতে থাকে সুভাষচন্দ্র ১৯৪০ সালের ২রা জুলাই ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়ার নিয়মাবলীর ধারানুসারে ধৃত হইয়া প্রেসিডেন্সি জেলে নীত হয়েন। ইহাতে তাঁহার বাক্যের ও কার্য্যের গতিরোধ হইল বটে, কিন্তু মনের কার্য্য আরও প্রবল হইয়া উঠিল। পাঁচমাস পর্য্যন্ত বাহ্যতঃ কর্ম্মহীন অবস্থায় তাঁহাকে জেলে অতিবাহিত করিতে হয়। ইতিমধ্যে কয়েকটি রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতার জন্যও তাঁহার বিচার চলিতেছিল। এখানে তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা এবং জগতের আন্তর্জাতিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করেন। পরে নিজেই কর্ত্তব্য ঠিক করিয়া জেলখানায়ই অনসন ব্রত গ্রহণে কৃত সঙ্কল্প হয়েন। কিন্তু অনসন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে বাঙ্গলাদেশের গভর্ণর স্যার জন হার্ব্বার্টকে একখানি পত্রে লিখিলেন—

"আমি যে সঙ্কল্প করিতেছি তাহাতে হয়তো আমাকে মৃত্যু বরণ করিতে হইতে পারে কিন্তু আমার এই সান্ত্বনা যে আমার এই দেশ ভারতবর্ষ আমার জাতি আমার স্বগণ ও সহকর্ম্মীগণ আমার মৃত্যুতে স্বাধীনতা লাভে দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়া উঠিবে।"

কোন উত্তর আসিল না। সুভাষও তাহার পণ রক্ষা করিলেন, অনশন ব্রত আরম্ভ করিলেন। ক্রমে দেখা গেল সাতদিনের অনশনে তাঁহার দেহ ক্ষীণ

হইয়াছে, স্বাস্থ্য ক্রমেই খারাপ হইয়া যাইতেছে, জীবনী শক্তি হ্রাস পাইতেছে। নিরুপায় হইয়া গভর্ণমেণ্ট ৫ই ডিসেম্বর (১৯৪০) তাঁহাকে বিনাসর্ত্তে মুক্তি প্রদান করিয়া দিলেন।

ইহার পরে আসিল সুভাষচন্দ্রের স্বাধীনতার জন্য ভারত ছাড়িয়া অন্যত্র গমনে সঙ্কল্প। কিন্তু চারিদিকে শত্রুর চর, দিবারাত্রি তাঁহার বাড়ী কড়া পাহারা দিতেছে, এ অবস্থায় পলায়ন কি সম্ভব? কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞের পক্ষে সবই সম্ভব, তাহার কোন বন্ধন নাই, ভয়ও নাই। শিবাজী আওরঙ্গজেবের প্রাসাদ হইতে প্রহরীদের চক্ষে ধূলা দিয়া খাবারের চাঙারীর ভিতরে করিয়া পুত্রসহ পলায়ন করিয়া স্বগৃহে আসিয়াছিলেন, স্বরাজাকাঙ্খী বীরের পক্ষে তাহাকি সম্ভব হয় নাই? যে জ্বালায় দেশবন্ধু জ্বলিয়া স্বরাজের জন্য দেহখানি জীর্ণ যষ্ঠির ন্যায় ছাড়িয়া দিয়া গেলেন, সুভাষচন্দ্রও ভারতের জন্য অমৃত বহন করিয়া আনিবার জন্যই ঘর ছাড়িয়া বিদেশে পলায়ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। জানিতেন সে পথ বড় ভয়াবহ, বড় বিপদ সঙ্কুল, বড় প্রাণঘাতী, কিন্তু গরুড়ের ন্যায় অমৃত সংগ্রহ করিতেই হইবে, মহাবীরের ন্যায় মাত্র বিশল্য করণীর জন্য সমগ্র গন্ধমাদন পর্ব্বত বহন করিতেই হইবে, কলম্বাসের ন্যায় নূতন প্রদেশ আবিষ্কার করিতেই হইবে, নেপোলিয়েনের ন্যায় আল্পস পর্ব্বত অতিক্রম করিতেই হইবে। দেশবন্ধুর ন্যায় দেশবন্ধু শিষ্যেরও অসাধ্যসাধন করিতেই হইবে। বাস্তবিক যে জ্বালায় দেশবন্ধু জ্বলিয়াছিলেন, সুভাষ তাহাতেই জ্বলিতে লাগিল, ভারতীয় অন্য কোন নেতার সেই জ্বালাবোধ হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। সেই জ্বালাবোধ থাকিলে এইরূপ লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণ বিনিময়ে সদাবিবাদমান স্বরাজলাভে তাঁহারা অগ্রসর হইতেন না। যাক্ সুভাষচন্দ্র মনে করিলেন জার্ম্মাণী ইংরাজকে বড় ঘায়েল করিতেছে, রুষিয়ার সঙ্গে জার্ম্মাণীরও সংগ্রামহীন ব্যবসার চুক্তি সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, জাপানও বোধহয় ইংরাজের বিরুদ্ধে যাইবে, এই সুযোগ ছাড়িলে আর আসিবে না—ইহাতে প্রাণ বিনাশ হইলেও ক্ষতি নাই। ভগবানের নাম লইয়া তরঙ্গবিক্ষুব্ধ কাল সমুদ্রে তিনি ঝাঁপ দিলেন—

ভাবিলেন স্বর্ণ প্রতিমা মাথায় তুলিয়া আনিতেই হইবে, না হয় ডুবিবেন। মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি? সুভাষচন্দ্রও একাই ভেলায় চড়িয়া ভাসিলেন। ১৯৪১—১৭ জানুয়ারী নিশীথে মৌলভীর পোষাক পরিয়া গুম্ফশ্মশ্রু শোভিত হইয়া আসিয়া নিকটবর্ত্তী একখানি মোটরে বসিলেন—

কে যায় ঐ—কেহ সন্দেহ করিল না। ৮।১০ দিন পর্য্যন্ত কেহ জানিতেও পারিল না, কারণ সুভাষ যে রুদ্ধ কক্ষে বসিয়া ধ্যান ধারণা জপ পূজায় নিমগ্ন ছিলেন, বাহিরের লোকের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই ছিল না। ১৮ই রাত্রিতে রওনা হইয়া গমোয়া ষ্টেসন যাইয়া সেইদিন মধ্যে একেবারে পশ্চিমের পেশোয়া সহরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তারপরে বোবা সাজিয়া কিরূপে যে কাবুলে গিয়া উপস্থিত হন এবং কিরূপে রুশিয়ার দূতাবাসে ছাড়পত্র না পাইয়া ইটালীর দূতাবাস হইতে রোম ও বার্লিনে যাইবার ছাড়পত্র সংগ্রহ করেন এবং কখনও পর্ব্বত সঙ্কুল প্রদেশে পদব্রজে, কখনও নদী অতিক্রম করিয়া কখনও রেল পথে উড়ো জাহাজে—কিরূপে রুশিয়ার রাজধানী মস্কোতে গিয়া পৌছেন এবং তৎপরে অনতিবিলম্বে কিরূপে বার্লিন গিয়া অধিষ্ঠান করেন, সে কাহিনী যখন লিখিত হইবে সকলে বুঝিবে কি অদম্য সাহস, কি অভাবনীয় বিশ্বাস, কি দেবদুর্লভ দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের শক্তিতে এই ভারতীয় বীর গরীয়ান ছিলেন। যাহা হউক ১৯৪১ সালের ২৮ মার্চ্চের বার্লিনের সংবাদপত্রে বৃহদক্ষর সংযুক্ত সংবাদ বিঘোষিত হইল—

"ভারতীয় বীরনেতা এখন বার্লিনে আসিয়াছেন।"

ইহারই দুই মাস পরে জার্ম্মাণী রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া বারোশত মাইলব্যাপী অভিযান জুড়িয়া বসিল। ক্রমে জনপদ ও সহর হিটলারের কবলিত হইতে লাগিল।

এই ভারতীয় বীরকে পাইয়া হিট্‌লার যে খুবই উৎফুল্ল হইলেন তাহা সহজে অনুমেয়। সুভাষচন্দ্র দুইবার কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন, অসংখ্যবার কারাবরণ করিয়াছেন। কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ও মেয়র উভয় পদই

অলঙ্কৃত করিয়াছেন, যুবশক্তির উপর তাঁহার অখণ্ড প্রভাব। আর সর্ব্বোপরি ইংরাজবিদ্বেষ তাঁহার অস্থিমজ্জাগত। কাইজার যেমন লেলিনকে দ্বিতীয় সমরাঙ্গন খুলিতে সুবিধা দিয়াছিলেন, হিটলারও মনে করেন সুভাষচন্দ্রের সহায়তায় অন্যদিকে ইংরাজকে পর্য্যুদস্ত করা যাইবে। সুভাষও স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে বার্লিনে একটী আজাদ হিন্দবাহিনী গঠন করেন। যে সমস্ত ভারতীয় সৈন্য ফরাসীদেশে বা দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধ করিয়া বন্দী হয়, তাহাদিগকে বার্লিনে আনাইয়া সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে স্বাধীন ভারতীয় সেনাবাহিনী গঠিত হয়। জার্ম্মাণীতে সে সময় ভারতীয় ছাত্রবর্গ যুদ্ধ ঘোষণার পরে অন্তরীণাবদ্ধ অথবা বন্দী অবস্থায় ছিল তাহারাও আবেদন করিয়া এই স্বাধীন ভারতীয় বাহিনীতে যোগদান করিল। জেনারেল রিবেনড্রফ প্রমুখ বার্লিনের সেনানায়কগণ কর্ত্তৃক সুভাষচন্দ্র সম্মানিত হন এবং স্বয়ং হিটলার তাঁহাকে 'ভারতীয় ফুয়েরার' বলিয়া সম্বোধন ও সম্বর্দ্ধনা করেন। সমরাঙ্গনগুলি পরিদর্শন করিতেও তিনি সুবিধা দেন। ইটালির মুসোলেনীর প্রতি সুভাষচন্দ্রের শ্রদ্ধাও বেশ গভীর ছিল।

ইহার পরেই ১৯৪২ সালের ৮ই আগষ্ট তারিখে মহাত্মা গান্ধীর "ভারত ছাড়" প্রস্তাবে তাঁহাকে (মহাত্মাজীকে) সর্ব্বত্র ভারতীয়গণের নিকটে অবিসম্বাদী শ্রদ্ধার উচ্চশিখরে আরূঢ় করিয়া ফেলিল। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ তৎক্ষণাৎ ধৃত হইলেন। আর সর্ব্বত্র জাগিয়া উঠিল মহাকবি গিরিশচন্দ্রের স্বপ্ন বাণী—প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল আকাশে বাতাসে সেই ধ্বনি।

"ফিরিঙ্গেরে নাহি দিও সূচ্যগ্র স্থান
বঙ্গের সন্তান হিন্দু মুসলমান
বাঙ্গলার সাধহ কল্যাণ
শত্রুজ্ঞানে ফিরিঙ্গেরে কর পরিহার
বিদেশী ফিরিঙ্গি কভু নহে আপনার,
স্বার্থপর চাহে মাত্র রাজ্য অধিকার
হও সবে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত—"

প্রবাসে বাঙ্গালী বীর সুভাষচন্দ্রের প্রাণও আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। তিনিও সুসার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। মহাকবির স্বপ্ন সফল হইতে চলিল।

ইতিমধ্যে জাপানও মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণ করিয়াছে। দশবৎসর হইতে সুভাষচন্দ্র যাহা ভাবিয়া আসিয়াছেন এবার জাপানের নিজের স্বার্থের খাতিরে তাহার সহায়তা পাইবেন বলিয়া সুভাষচন্দ্র উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। জাপানে যাইবার জন্য প্রাণে আকাঙ্খা হইল। কিন্তু তাহা যে একেবারে অসম্ভব,—স্বপ্নাতীত! তবে অসম্ভব হইলেও সে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন অন্যতম ভারতীয় বীর রাসবিহারী বসু।

প্রফুল্ল সেনগুপ্ত নামে ঢাকা অনুশীলন সমিতির একজন সভ্য ছিলেন। তাঁহার বাড়ী ফরিদপুর জেলার। ১৯৩৬ সালে তিনি পূর্ব্ব এসিয়ার ব্যাঙ্ককে রাসবিহারীর সহায়তায় জাতীয় মহাসমিতির একটী শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রফুল্ল বাবুর শ্যামরাজ্যে বেশ প্রভাব ছিল এবং সেখানে তিনি স্বামী সত্যানন্দনামে পরিচিত ছিলেন। ইহার এক বৎসর পরে টোকিওতে রাসবিহারীর নেতৃত্বে একটী সম্মিলনী হয়। তাহাতে স্বামীজী ও জ্ঞানী প্রীতম সি ও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সেই সময় হইতে ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য বদ্ধ পরিকর হন।

যাহাহোক ডিসেম্বর (১৯৪১) সিঙ্গাপুরে ইংরাজের দুইখানি বৃহদাকার যুদ্ধ জাহাজ 'প্রিন্স অব ওয়েলস্' ও 'রিপাল্‌স্' জাপানীদের বোমাবর্ষণে নিমজ্জিত হয়, আর ১৯৪২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুর বন্দরটি জাপানের করতলগত হয়। অত্যল্পকাল মধ্যেই আবার জাপান—মালয়, শ্যাম, ইন্দোচীন ও বর্ম্মা প্রভৃতি রাজ্য অধিকার করিতে সমর্থ হয়। ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে জাপান বার্ম্মাদেশে বা ম কে অধিপতি করিয়া একটী জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু ইহা প্রকৃতভাবে জাপানীঅধিকৃত,—জাতীয় নহে।

টোকিওতে রাসবিহারী একটি এমন মনোজ্ঞ হোটেল প্রতিষ্ঠা করেন যে এখানে বসিয়াই নানা সম্প্রদায় ও জাতির বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত তাঁহার

আলাপ ও ভাব বিনিময়ের সুবিধা হইত। এতদ্ব্যতীত আমাদের স্বরাজ বৎসরে ১৯২১ সালের রাসবিহারী জাপানে বসিয়াই ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ Indian Indepedenee League) প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার কর্ম্মীগণকে সর্ব্বপ্রকার সুখ সুবিধা পরিবর্জ্জন করিয়া ভারতের স্বাধীনতার জন্য আত্মনিয়োগ করিতে হইবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে হইত।

১৯২৩ সাল হইতেই রাসবিহারীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের লোক মারফত পরিচয় সম্প্রীতি স্থাপিত হয়।

সুভাষচন্দ্র পূর্ব্বেই জানিতেন ও আর এখন স্পষ্টই বুঝিলেন প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জাপান মিত্র শক্তির (ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকা) পক্ষভুক্ত হইলেও, উপরোক্ত স্থান সমূহ যখন জাপানীঅধিকৃত হয়, তথাকার ভারতীয় সৈন্যগণের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে। ইংরাজ সেনাপতিগণ তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে জাপানের সেনানায়গকণের অনুবর্ত্তী হইতে উপদেশ দিযা চলিয়া যায়। ১৭ই ফেব্রুয়ারী, সিঙ্গাপুরের ফেবার পার্কে যে সভা হয় (১৯৪২)তাহাতে ভারতীয়-গণকে যেন মেষ শাবকের ন্যায় হস্তান্তর করিয়া দেওযা হয়। ইহাতে ভারতীয়গণের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। এদিকে রাসবিহারী বসুও ভারতীয় সৈন্যাধ্যক্ষগণকে ডাকিয়া পাঠান। একটী সংঘ গঠিত হইল। কাপ্টেন মোহন সিং কর্ণেল এন, এস, গিল, কর্ণেল রাঘবম, এস, সি, গুহ (সিঙ্গাপুরের এড্ভোকেট, কাপ্টেন মহম্মদ আক্রাম, কাপ্টেন কে, পি, কে মেননও আমাদের উক্ত স্বামীজীকে (প্রফুল্ল সেনকে লইয়া।

বেগস্কক হইতে মেনন ও স্বামীজী রওনা হন কিন্তু পথিমধ্যে উড়োজাহাজটি ফাটিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে, আর উক্ত দুইজনই মৃত্যুমুখে পতিত হন। অতঃপরে মার্চ্চ মাসের ২৮, ২৯, ৩০শে একটী সম্মিলনী ব্যাঙ্ককে আহ্বান করিবার সিদ্ধান্ত হয়।

---

* "Our activities must be open and above board. Secret Conspiracy can not bring in salvation. Whatever we have to say or do we have to say or do it openly."

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৪২ সালের জুনমাসে ব্যাঙ্ককে একটী সম্মিলনী হয়। আটদিন পর্য্যন্ত আলোচনা চলে (১৫ জুন হইতে ২৩ পর্য্যন্ত) এবং শ্যাম, বর্ম্মা, চীন, মালয়, সিঙ্গাপুর, ইন্দোচীন, জাভা, সুমাত্রা এবং ফিলিপাইন হইতে বহুসংখ্যক ভারতীয় প্রতিনিধি আসিয়া যোগদান করে। রাসবিহারী বসুই সম্মিলনীতে পৌরহিত্য করেন এবং তাঁহার বক্তৃতায় মহাত্মাগান্ধীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হয়, আর তিনি জন্মভূমিকে দারিদ্র্য, অধীনতা ও দুর্দ্দশার হাত হইতে রক্ষা করিতে সকলকে অনুরোধ করেন। সভায় দুইটি প্রস্তাব গৃহীত হয় ঃ—

(১) ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য একটি বাহিনী গঠন করা একান্ত আবশ্যকীয়।

(২) যুদ্ধ বিজয়ের পরে যে শাসনতন্ত্র চালাইতে হইবে, তাহার একটী খসড়া করা একান্ত আবশ্যকীয় হয়।

এই দুইটী উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে যে স্বাধীনতাসঙ্ঘ গঠিত হয়, রাসবিহারী বসুই উহার সভাপতি (President) হন। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য একটী কর্ম্মপরিষদ গঠিত হয়। উহাতে রাঘবন্, মেনন, গিলানী, জে আর ভোঁসলা প্রভৃতি সভ্য হন ; আর উহারও সভাপতি (Chairman) হন বসু মহাশয়, আর সৈন্যাধিনায়ক (G. O. C.) হন কাপ্তেন মোহন সিং।

এদিকে 'ভারতীয় স্বাধীনতাসঙ্ঘ' গঠনে জাপান খুব তৃপ্ত হইলনা। জাপান স্পষ্টাক্ষরে ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা করিলেও এই সঙ্ঘের গতি বক্র নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। তাহারা যুবসঙ্ঘ (Youth League) নামে একটী প্রতিদ্বন্দ্বী সমিতি গঠন করিল এবং মুখে অন্যরূপ ভাব দেখাইলেও, রাসবিহারীর স্বাধীনতা সঙ্ঘের কার্য্যে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতে লাগিল।

রাসবিহারী এই সময়ে একটী সঙ্কটাবস্থায় পতিত হইলেন। কর্ম্মপরিষদ (Council of Action) স্বাধীনতা সঙ্ঘ (Independence League) কর্ত্তৃক গঠিত হইলেও, মোহন সিং উক্ত সঙ্ঘ বা উহার সভাপতিকে মানিতে

প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহার মনে হইল যে তিনি সেনাবাহিনীর অধিনায়ক, সুতরাং সঙ্ঘের কোনকথা তাঁহার উপরে খাটিতে পারে না। রাসবিহারী এবং রাঘবন্ স্বাধীনতাসঙ্ঘের ক্ষমতার প্রতিই পক্ষপাতী ছিলেন এবং মনে করিতেন কর্ম্মী-পরিষদের (Council of Action) উপরওয়ালা হিসাবে ইহাকে স্বাধীনতাসঙ্ঘের নির্দ্দেশ মানিতেই হইবে। এইভাবে বহুদিন মতান্তর চলিল এবং ক্রমে উহা মনান্তরে পরিণত হইল।

এদিকে মোহন সিং ভারতীয় সৈন্যগণের প্রতি অযথা কড়া শাসন চালাইতে প্রবৃত্ত হওয়ায়, রাসবিহারী বসুর তাহা মনঃপূত হইল না। তিনি ঐরূপ রূঢ় ব্যবহারের ঘোর প্রতিবাদ করেন। মোহন সিং বলেন "আমি সেনাবাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক, তাহাদের প্রতি আমার যথেচ্ছ ব্যবহার চলিবে, এবং তাহাতে অপর কাহারও কথা বলিবার নাই"। বসু এবং রাঘবন বলেন স্বাধীনতাসঙ্ঘের (Independence League) সভাপতি (President) এবং কর্ম্মপরিষদের ও সভাপতি মোহন সিংএর এইরূপ অন্যায় ব্যবহারেও প্রতিবাদ করিবেন না, তাহা কিরূপে সম্ভব? সেনাবাহিনীর তাহার (বসুর) নির্দ্দেশমত কাজ করাই উচিত হইবে। এইরূপ মত-পার্থক্য ও মনোবাদ থাকা অবস্থায় এমন একটী ঘটনা ঘটে যে মোহন সিং রাসবিহারীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার করিতে সাহসী হন। সে সম্বন্ধে একটু ইঙ্গিত করিতেছি।

জাপানীরা বর্ম্মার রণক্ষেত্রে ভারতীয় সৈন্য পাঠাইতে চাহিলে কর্ণেল গিল উত্তর করেন, "ভারতীয়গণ সম্বন্ধে জাপানীদের যুদ্ধ-উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে বিঘোষিত না হইলে আমরা সৈন্য পাঠাইব না।"

অতঃপর ৮ই ডিসেম্বর (১৯৪২) জাপানীগণ কর্ত্তৃক কর্ণেল গিল ধৃত হন। ইহাতে রাসবিহারী খুব ক্ষুন্ন হন, কিন্তু মোহন সিংহের প্রচার কার্য্যে সুবিধা হয়। মোহন সিং সর্ব্বত্র প্রচার করেন, "রাসবিহারী ইহার ভিতরে নিশ্চয়ই আছেন, এতদিন হইতে জাপানীদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া তাহাদের অনুগ্রহ লাভ করিয়া আছেন, তিনি কি জাপানীদের স্বার্থ না দেখিয়া আমাদের স্বার্থ দেখিবেন?"

মোহন সিংহের অপপ্রচারে ক্রমে দল ভাঙ্গিয়া যায়। মোহন সিং অন্যান্য সকলকে প্ররোচিত করেন যে "কর্ম্মপরিষদকে না জানাইয়াই কর্ণেল গিলকে গ্রেপ্তার করা হইল—সুতরাং সেনাবাহিনী ভাঙ্গিয়া দাও।" সকলেই দল ছাড়িয়া দিলেন। কেবল একজন রহিলেন—তিনি স্বয়ং রাসবিহারী বসু।

দেশপ্রেমিক রাসবিহারী আবার নূতন উদ্যমে দল গঠনে প্রয়াস পাইলেন। এদিকে মোহন সিং-এর প্ররোচনায়—আবার অনেকে বলিলেন 'কাজ কি ইংরাজের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া, ইংরাজতো আমাদের শত্রু নয়।'

অতঃপর পুনর্গঠন করিবার জন্য রাসবিহারী ভারতীয় সৈন্যগণের নিকট একটী বিজ্ঞপ্তি পাঠাইলেন। তাহাতে লেখা ছিল—"স্বাধীনতার জন্য ইংরাজের বিরুদ্ধে ভারতের যুদ্ধ এক সঙ্কট অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে। আমাদের পশ্চাৎ অপসরণের আর সময় নাই। ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস্ কিছুতেই আমাদের আকাঙ্খিত হইতে পারে না। প্রকারান্তরে উহা ইংরাজের দাসত্ব বই আর কিছুই নয় (**a watch-dog of Britain**)।
এখনও দেখিতেছি এখানে চারি রকমের লোক আছেন—

(১) যাহাদের জাতীয় কংগ্রেসে পূর্ণ আস্থা নাই—

(২) আস্থা থাকিলেও যাহারা ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে ভীত—

(৩) ইংরাজের অধীনে ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস চায় অর্থাৎ ইংরাজের জয়াকাঙ্খী—

(৪) অনেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের বর্ত্তমান অবস্থায় এখানে থাকিতে চায় না।

রাসবিহারীর আপ্রাণ চেষ্টায় স্বতন্ত্রভাবে এবার আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠিত হইল। এবার সমর-পরিষদে ভাল ভাল লোক আসিলেন—লেঃ কর্ণেল সা-নওয়াজ, ক্যাপটেন সাইগল, গুরবক্সি সিং ধীলন প্রভৃতি পঞ্চনদের বীরগণ উৎসাহের

সহিত যোগদান করিলেন। সা-নওয়াজ হইলেন উক্ত পরিষদের প্রধান ও সাইগল হইলেন সামরিক সেক্রেটারী। সা-নওয়াজ বজ্র নির্ঘোষে প্রচার করিলেন :—

"স্বাধীনতার সংগ্রামে সকলেই আসিয়া এই বাহিনীতে যোগদান করুন। ভাই সব, যাহারা আসিবেন, দেশপ্রীতির বলেই আসিবেন, স্বার্থত্যাগ করিয়াই আসিবেন, কেহ কখনও অর্থ প্রাপ্তির লোভে আসিবেন না, সম্মান পাইবেন বলিয়া আসিবেন না, বিরক্তিবোধ থাকিলে আসিবেন না · দেশকে বৃটিশ কবল-মুক্ত করিতে চাহিলেই আসিবেন। সকলে আসিয়া সৈন্যশ্রেণী ভুক্ত হউন।"

কিন্তু হায়, মোহন সিংহের অপচেষ্টায় যে ক্ষতি হইল, রাসবিহারী এবং উক্ত বীরগণের বিপুল চেষ্টায়ও তাহা সম্পূর্ণভাবে ফলবতী হইল না। দূরদর্শী রাসবিহারী বুঝিলেন গলদ কোথায়—দেশহিতকল্পে অচিরেই সেই ত্রুটী সংশোধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং করিয়াও ফেলিলেন। তিনি মনে মনে বলিলেন—

"আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার সেই যৌবনের তেজ আর নাই। ভারতের স্বাধীনতাই আমার একমাত্র কাম্য—স্বাধীনতা আমার নিদ্রার স্বপ্ন, জাগরণের সাধনা, জীবনের আশা, প্রাণের উৎসাহ। কিন্তু উৎসাহ থাকিলেও, উৎসাহ দেহকে সমানে বহন করিয়া লইতে পারেনা—বিশেষতঃ বহুদিন জাপানে আছি, আমার এই উৎসাহ দেখাইবার সুযোগও জাপানেরই প্রসাদে, নতুবা কবে ব্রিটিশের কবলে পড়িয়া জীবনের পরপারে চলিয়া যাইতাম। আমিও থাকিব কিন্তু জন্মভূমির উদ্ধারকল্পে এই সঙ্কট সময়ে এমন একজন লোকের দরকার, যাহার উৎসাহ আছে, সাহস আছে, জ্বলন্ত দেশপ্রীতি আছে—যিনি বহু দুঃখ কষ্ট স্বেচ্ছায় সাদরে বরণ করিয়াছেন, দেশে যাঁহার অনুচরের অভাব নাই, বিদেশে সর্ব্বত্র যিনি সম্মানিত। এমন লোক পাইলে তাঁহারই শরণাপন্ন হই—নতুবা জন্মভুমির আশা বিলুপ্ত"—

রাসবিহারীকে অধিক ভাবিতে হইল না। বার্লিনে যে ভারত-রত্ন আজাদহিন্দ ফৌজ গঠন করিয়া ভারত উদ্ধার কল্পে সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন—তাঁহার কথাই সর্ব্বাগ্রে তাঁহার মনে হইল—রাসবিহারীর আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসেন। যে আলাপ আলোচনা হয় উহা বড় মর্ম্মস্পর্শী। সাক্ষাৎকারীগণ জিজ্ঞাসা করেন—

"আপনি কি আশা করেন, ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে?"

রাসবিহারী—আমার ধ্রুব বিশ্বাস ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য্য শীঘ্রই সমুদিত হইবে। অরুণোদয় হইয়াছে!

প্র ঃ—আপনি বহুদিন হইতে স্বাধীনতার যুদ্ধ লড়িয়া আসিয়াছেন, আপনিইতো সর্ব্বাধিনায়ক হইবেন।

রাস—আমি নই. আমি অশক্ত, বার্দ্ধক্যের দ্বারে আসিয়া পৌছিয়াছি, দেহ আর বয় না, যে শ্রেষ্ঠরত্ন সেই ভার গ্রহণ করিতে এখানে সমাগত হইয়াছেন, তিনিই সমগ্র প্রাচ্য-জগতে বিস্ময় উৎপাদন করিবেন।

প্রঃ—আপনি কাহার কথা বলিতেছেন? সুভাষ বসুই কি সেই মহাজন? না আর কেহ?

উঃ—হাঁ, আমি সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধেই বলিতেছি। তাঁহাকে দেখিয়াই আপনারা চক্ষু সার্থক করিবেন।

প্রঃ—দেখুন, জাপান সম্বন্ধে আপনার কি একটু দুর্ব্বলতা আছে?

রাস—কিছুমাত্র নয়। জন্মাবধি আমি ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া জীবনাতিবাহিত করিয়াছি। আজ জাপানের ভ্রুকুটিতে কেন ভয় পাইব? তাহাদের অনুগ্রহেই বা কেন বিগলিত হইব? জাপানে বাস করিলেও আমি ভারতবাসীই বটে। আমার যৌবনের স্বপ্ন সফল করিবার উদ্দেশেইতো আমি সুদীর্ঘকাল এই নির্ব্বাসিত জীবন বহন করিয়া আসিয়াছি।

প্রঃ—কিন্তু জাপানীদের সঙ্গে আজাদ হিন্দ সৈন্যদের গোলযোগে তাহাদের বিরুদ্ধে আপনি অঙ্গুলি হেলন করেন নাই?

রাস—একথা ঠিক নয়। কর্নেল গিল্ যে ধৃত হন সে মোহন সিংহের জন্য। তিনিই নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাকে বর্ম্মায় পাঠাইতে চাহিয়াছিলেন। আবার ইহারই ১৫।১৬ দিন পরে মোহন সিংহের ব্যবহার দেশীয় সৈন্যদের প্রতি

এমন রূঢ় হয় আর আজাদ হিন্দ ফৌজ ও ভারতীয় স্বাধীনতা সংঙ্ঘের এমন্ বিরোধী হয় যে মোহন সিংকে বাধ্য হইয়া গ্রেপ্তারের আদেশ আমাকেই দিতে হইয়াছিল।

প্রঃ—কিন্তু লোকে বলে আপনি জেনারেল তোজোর পরামর্শ অতিমাত্রায় লইতে চাহিয়াছিলেন।

রাস—চাহিয়াছিলাম—সে আমাদেরই সুবিধার জন্য। আমাদের কি আছে বলুন—আমাদের না আছে অর্থবল, না আছে অস্ত্রবল—জাপানাধিকৃত স্থানে না আছে অন্য কোনরূপ সুবিধা। স্বাধীনতার জন্য লড়িব, তবে লড়িব কি দিয়া? তবে স্বার্থের জন্য জাপানের সাহায্য লইলেও ইংরাজের স্থানে জাপানের প্রভুত্ব কেন চাহিব? চাই না বলিয়াইতো পূর্ব্ব এসিয়ার সমস্ত ভারতবাসীগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। কিন্তু তাহাদের সঙ্ঘবদ্ধ করিতে জাপানের সহায়তা ব্যতীত কিরূপে সম্ভব? তাহাদের সহায়তা ব্যতীত এতগুলি ভারতবাসীকে কি বিভিন্ন স্থান হইতে সম্মিলিত করা সম্ভব হইত? এই ধরুণ আমাদের ভাবী নেতা সুভাষবসুই কি জাপানের সহায়তা ব্যতীত এখানে আসিতে সমর্থ হইতেন? বন্ধুভাবে—ঝগড়া করিয়াও নহে নূতন দাসত্বের জন্যও নহে—জাপানের সহায়তা গ্রহণ করা খুবই সমীচীন। একবার যদি আমরা তৈযার হইতেপারি, তখন তাহাদের সাহায্য ব্যতীতও আমাদের কার্য্য আমরাই করিয়া উঠিতে পারিব।

প্রঃ—জাপানীরা যদি ভারত আক্রমণে সুবিধা না পায়, তবে কোন্ স্বার্থে তাহারা আমাদিগকে সহায়তা প্রদান করিবে?

রাস—নিশ্চয়ই করিবে। এতেওতো তাহাদের স্বার্থ আছে। আমরা যদি ভারতবর্ষের দিকে ইংরাজ শক্তিকে ব্যাপৃত রাখিতে পারি, জাপান নির্ভয়ে আমেরিকার বিরূদ্ধে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিতে সুবিধা পাইবে। এতদ্ব্যতীত জাপানের এত বেশী জায়গা অর্জ্জিত হইয়াছে যে, সে গুলিই সুপরিচালনা করা তাহাদের সাধ্যাতীত হইয়া উঠিয়াছে।

প্রঃ—আপনি সুভাষচন্দ্রের উপর ভার দিয়া কি অবসর গ্রহণ করিবেন?

রাস—দেশ সেবকের অবসর নাই। তিনি থাকিবেন সর্ব্বময় কর্ত্তা; আমি সৈনিকের ন্যায় নেতার আদেশ সর্ব্বদা পালন করিব। আর তিনি দরকার বোধ করিলেই সাধ্যমত সুমন্ত্রণা দিতে বিরত থাকিব না। দেখিতেছেন তো আমার জীবনসন্ধ্যা এখন ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে, দেহে আর শক্তি নাই। এখন একমাত্র আকাঙ্ক্ষা যে এ জীবনদীপ জন্মভূমি ভারত মাতার শান্তিময় ক্রোড়ে যেন নির্ব্বাপিত হয়। সেই আশায়ই জীবন ধারণ করিতেছি, আশাপূর্ণ হইবার সম্ভাবনাও দেখিতেছি, তবে শেষ পর্য্যন্ত সেদিন প্রকৃতই আসিবে কিনা একমাত্র বিশ্বনিয়ন্তাই জানেন—

বলিতে বলিতে রাসবিহারীর চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল, তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন আর কথা বলিতে পারিলেন না।—আগন্তুকগণ বৃদ্ধ নেতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা লইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

পরদিন ৪ঠা জুলাই, কি আশা ও আনন্দের দিন! প্রভাত সূর্য্য নবালোকে সমুদিত হইল, মেঘাবৃত গগন সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত হইল, ধরণী যেন নবসাজে সজ্জিত হইল। চারিদিক হইতে ভারতীয়গণ আসিয়া সিঙ্গাপুরের কেথেয় বিল্ডিংএ সম্মিলিত হইয়াছেন, সকলেরই উৎসাহ প্রদীপ্ত মুখমণ্ডল উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে। সেই বিশাল জনমণ্ডলী যেন কাহার উপদেশ ও আশা বাণীর প্রতীক্ষা করিতেছে। সকলেই নিস্তব্ধ, কাহার উপদেশ ও আশার বাণী শুনিবার জন্য, কাহার নির্দ্দেশে মাতৃভূমি উদ্ধারের সঙ্কল্প পাঠ করিবার জন্য সকলেই যেন উৎকণ্ঠিত হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। অকস্মাৎ সকলের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া রাসবিহারী বসু ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—

"বন্ধুগণ, বৎসরাধিক পূর্ব্বে যে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘ গঠিত হয় আপনারাই তাহাতে আমাকে নেতৃত্বপদে বরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি এখন বৃদ্ধ, শক্তিহীন, সেই গুরুতর দায়িত্ব সম্পাদনে অশক্ত। এই সঙ্কট সময়ে আমাদিগকে পরিচালিত করিবার জন্য একজন যোগ্য নেতার প্রয়োজন। ভগবানের কৃপায় আমরা সেই দেবদুর্লভ যোগ্য নেতার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। ভারতের ইনি একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি,

ইনিই আমাদিগকে বিজয়ের পথে লইয়া যাইবেন, ইনিই আমাদিগকে মুক্তির সন্ধান দিবেন, ইনিই আমাদের একমাত্র অধিনায়ক। আজ আমি ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের সমস্ত ভার আমার অশক্ত হস্ত হইতে তাঁহার শক্তিশালী হস্তে অর্পণ করিতেছি। আজ হইতে ইনিই আমাদের নেতাজী, আমাদের পরিচালক, আমাদের একমাত্র অধিনায়ক। আমার ধ্রুব বিশ্বাস, আমরা অচিরেই স্বাধীনতার দিব্যালোক প্রাপ্ত হইব।"*

তখন সেই বিশাল জনসমুদ্র সমস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল—"নেতাজী সুভাষচন্দ্র কি জয়!" সেই জয়ধ্বনি সাগরসৈকতে, আকাশে, বাতাসে, দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইল, আর নবোৎসাহে, নব আশায়, নব জাগরণে সকলে যেন নূতন জীবন প্রাপ্ত হইল।

প্রতিনিধিগণ সুভাষচন্দ্রের আকৃতি, তেজস্বিতা ও দৃঢ়সঙ্কল্প ব্যঞ্জক মুখশ্রী দেখিয়া অত্যন্ত উল্লসিত হইল। তিনিও সকলের প্রীতিপূর্ণ ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। অতঃপর স্বাধীনতা সঙ্ঘের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করিয়া সুভাষচন্দ্র উত্তর করেন—

"ভারতের বাহিরের ত্রিশলক্ষ ভারতবাসী যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারে, তবে স্বাধীন ভারত সরকার আমরা অচিরে প্রতিষ্ঠিত করিব। আশা করি ভারতবাসী আসিয়া দলে দলে এই সঙ্গে যোগদান করিবেন, আর অচিরেই আমরা আজাদহিন্দ সরকার স্থাপন করিতে পারিব। আমি আপনাদের সর্ব্বাঙ্গীন সহযোগিতা ও সহায়তা কামনা করি।"

* "I am leaving charge of the Indian Independence League to Subhas Chandra. I am old. For this task we require a leader who can take the nation on the way to victory. Fortunately for us Subhas Chandra is amongst us. From this day he is our leader. Under the leadership of Netaji Subhas Chandra Bose, India will be able to throw off her shackles."

পরদিন ৫ই জুলাই আজাদ হিন্দ ফৌজের সমস্ত সেনানী শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। অনেকেই সমবেত হইলেন। এই কয়েক মাসের গোলযোগে যাহারা ছাড়িয়া গিয়াছিল তাহারাও সোৎসাহে ছুটিয়া আসিল।

সুভাষচন্দ্র তখন সেই বিশাল জনসঙ্ঘের সমীপে ঘোষণা করিলেন—

"আজ হইতে আজাদ হিন্দ ফৌজ পুনর্গঠিত হোক্"। তখন একটা তরঙ্গ বহিয়া গেল। রণবাদ্য বাজিল্, প্যারেড্ হইল, তারপর যখন সকলে নিস্তব্ধ হইল, নেতাজী সুভাষচন্দ্র ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ়ভাবে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"ভারতীয় মুক্তিফৌজের সেনানীগণ, আজ আমার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের দিন। আজ বিধাতা আমাকে সর্ব্বোচ্চ সম্মানে সম্মানিত করিয়াছেন যে আমিই ভারতের স্বাধীনতাকল্পে স্বাধীন ভারতবাহিনীর অস্তিত্ব ও গঠনের কথা সমগ্র জগতের কাছে ঘোষণা করিতে সমর্থ হইলাম। একদিন এই সিঙ্গাপুরই ছিল ব্রিটিসের প্রধান ঘাঁটি, ব্রিটিস দর্পের প্রধান কেন্দ্র, ব্রিটিস সাম্রাজ্যবাদের দুর্ভেদ্য দুর্গ। আজ এই সিঙ্গাপুরেই ব্রিটিস অপসরণ কল্পে এই জাতীয় বাহিনী পুনগঠিত হইল। এই বাহিনীই সাম্রাজ্যবাদের উচ্চসৌধ ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিবে, ভারতমাতাকে ইংরাজের শৃঙ্খলা-মুক্ত করিতে সমর্থ হইবে।

"বন্ধুগণ, সৈনিকগণ, সহযাত্রীগণ, আজ একমাত্র সমরনিনাদ গগন বিকম্পিত করিয়া ধ্বনিত হোক—দিল্লী চলো, দিল্লীর লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উড্ডীয়মান কর, আর সেখানে সাম্রাজ্যের সমাধিক্ষেত্র রচনা কর। নিশ্চয় জানিবে এই সংগ্রাম আমাদের জীবনমরণের সংগ্রাম—আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এই সংগ্রামে আমাদের 'হয় মন্ত্রের সাধন কিংম্বা শরীর পাতন'। আমরা এই সংগ্রামে কে বাঁচিব কে মরিব, একমাত্র ভাগ্যনিয়ন্ত্রাই জানেন, কিন্তু একথা নিশ্চিত যে আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যে পর্য্যন্ত পুরাতন লালকেল্লা না আমাদের অধিকৃত হয়, যে পর্য্যন্ত না উহার উপরে জাতীয় পতাকা উড্ডীন করি, যে পর্য্যন্ত না আমরা সাম্রাজ্যবাদ শ্মশানে পরিণত করিতে পারি, আমাদের কর্ত্তব্য

শেষ হইবে না, আমরা কখনও যুদ্ধে বিরত হইব না, কখনও পশ্চাদ্‌পদ হইব না। বস্তুতঃ যেদিন আমরা ইতিহাস প্রসিদ্ধ দিল্লী অভিযান স্বরু করিব, যেদিন দিল্লীর সরকারী ভবনে আমাদের জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিতে সমর্থ হইব, যেদিন প্রাচীন লালকেল্লার অভ্যন্তরে আমাদের স্বাধীনতার সৈনিকগণ বিজয় উৎসবে মাতুয়ারা হইয়া উঠিবে, কেবলমাত্র সেইদিনই আমাদের অভিযান সম্পূর্ণ হইবে।

"বন্ধুগণ জীবনে আমি বরাবর অনুভব করিয়াছি, ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের উপযোগী কোন বিষয়েরই অভাব নাই। অভাব ছিল কেবল জাতীয় মুক্তি-বাহিনীর। এই জাতীয়বাহিনী লইয়াই গ্যারিবল্ডি ইটালী স্বাধীন করিয়াছিলেন, জর্জ ওয়াসিংটন আমেরিকার স্বাধীনতা লাভ করেন, শিবাজী মাউলী সৈন্য লইয়া স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। আজ আমাদেরও জাতীয় বাহিনীর অভাব পূর্ণ হইল। বস্তুতঃ এই পুনগঠিত বাহিনীই ভারতের মুক্তি আনয়ন করিবে। ভাবিয়া দেখুন আমরা কত ভাগ্যবান যে আমাদের দ্বারাই সেই মহাকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে চলিল।

"বন্ধুগণ, ভ্রাতাগণ, সহকর্ম্মীগণ—ভারতবর্ষের জাতীয়গৌরব, জাতীয় সম্মান, জাতীয় প্রতিষ্ঠা আপনাদের হস্তেই ন্যস্ত; তাই আপনারা এমনভাবে আপনাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবেন যেন আপনাদের ভবিষ্য বংশধরগণ আপনাদিগকে স্মরণ করিয়া গৌরব বোধ করিতে পারে, যে কতবড় স্বার্থত্যাগী, স্বাধীনতাপ্রিয় মহিমান্বিত বীরপুরুষগণের বংশধর তাহারা। আপনাদের সুখে দুঃখে, জয়ে পরাজয়ে, দুঃখে আনন্দে, আপনাদের সঙ্গে সঙ্গেই আমি আছি ও থাকিব। দুর্দ্দিনের ঘনান্ধ-কারেই হৌক, বিজয়ের গৌরবআভায়ই হৌক, আপনাদের সহকর্ম্মী হিসাবে আমাকে আপনারা সর্ব্বদাই কাছে কাছে পাইবেন। কিন্তু আপাততঃ আমাদের কিছুই নাই। এমন কিছু আমাদের নাই, যাহা দিয়া আপনাদের মনে কোনরূপ আনন্দ দান করিতে পারি। আমাদের পথ দুর্গম, অর্দ্ধাশন বা অনশনেই হয়তো অনেকদিন আমাদিগকে অতিবাহিত করিতে হইবে। এমন অবস্থা হইবে যে আমরা হয়তো ক্ষুধায় অন্ন পাইব না, তৃষ্ণায় জল পাইব না, আমাদের কষ্টের

অবধি থাকিবে না। কখন কোথায় আমাদিগকে যাইতে হইবে নিশ্চয়তা নাই, মৃত্যু আসিয়া কখন আমাদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইবে কেহই বলিতে পারে না, তবু আমাদের গৌরব যে ভারতের মুক্তি-বাহিনীর আমরা সৈনিক। স্বাধীনতা যখন আসিবে—নিশ্চয়ই আসিবে, আপনারা বাঁচিয়া থাকিতেও পারেন বা সংসার হইতে চির বিদায় লইতেও পারেন, কিন্তু যাহাই হৌক না কেন যে অবস্থাই আসুক না কেন, আপনাদের জীবনে বা মৃত্যুতে সর্ব্বদাই এই আশ্বাস, এই সুখচিন্তা, এই শান্তিই বিরাজ করিবে যে আমাদের জন্মভূমি স্বাধীনতা লাভ করিবে আর সেই স্বাধীনতার সংগ্রামে আপনারাই প্রথমে সর্ব্বস্ব পণ করিতে, নিজেদের বলিদান দিতে—বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। আপনারই প্রথমে সমস্ত ঝড় ঝঞ্ঝা, নিপীড়ন সহ্য করিয়া সেই যুদ্ধে আত্মাহুতি দিয়া-ছিলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের জাতীয় বাহিনী—ইহার কার্য্যকলাপ নীতি পদ্ধতি ভারতীয়গণই নিয়ন্ত্রিত করিবে। কোন বিদেশীর ইহাতে বিন্দুমাত্র হাত বা সংস্রব থাকিবেনা, আমরা কখনই একজন বিদেশীকেও ভারতভূমিতে প্রবেশ করিতে দিব না।

"জাপান ভারতের স্বাধীনতা আনিতে পারে এই বিশ্বাস আমার নাই। ভারতীয় বাহিনীই ভারতে প্রবেশ করিয়া ভারতের স্বাধীনতা আনয়ন করিবে, জাপানীদের সেখানে স্থান নাই, সেখানে তাহাদিগকে আমরা ঘেঁসিতেই দিব না। যদি তারা আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের জন্মভূমিতে প্রবেশ করে, আমরা জানিব তারা আমাদের শত্রু, আর শত্রুর ন্যায়ই তাহাদের সঙ্গে ব্যবহার করিব। নিশ্চয় জানিবেন, ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে পারে একমাত্র ভারতবাসী। ভারতবাসীরই কর্ত্তব্য সেই স্বাধীনতা অর্জ্জন করা, আর ভারতবাসীর পক্ষেই তাহা সম্ভবও। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ভারতবাসী সেই স্বাধীনতা লাভ অর্জ্জনই করিবে। ভগবান আমাদের সহায়।"

সুভাষচন্দ্রের কথায় আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনানীগণের মধ্যে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হইল।

৪ঠা ও ৫ই জুলাইর পরে ৯ই জুলাই (১৯৪৩) আবার এক বিরাট জনসঙ্ঘের সম্মুখে সুভাষচন্দ্র দণ্ডায়মান হন। বীরবেশে সুভাষচন্দ্র মধ্যস্থানে আর চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি, প্যারেড, রণবাদ্য ও জয়হিন্দ ধ্বনি। সে দৃশ্য কল্পনায়ও দেহ শিহরিয়া উঠে, হৃদয় স্পন্দিত হয়, চিত্ত আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। নেতাজী সুভাষ বলেন—

"বন্ধুগণ, ভ্রাতাগণ, সঙ্গীগণ, জানেন কেন আমার জন্মভূমি ও গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আমি ভয়ঙ্কর বিপদ সঙ্কুল পথে পদক্ষেপ করিয়াছিলাম? ১৯২১ সালে চাকুরী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া ছাড়িয়া বিশ বৎসর পর্য্যন্ত আমি প্রত্যেকটি সত্যাগ্রহ সংগ্রামেই আত্মনিয়োগ করিয়াছি। উপরন্তু গুপ্ত বিপ্লবী অন্দোলনে সংশ্লিষ্ট সন্দেহে ব্রিটিস গভর্ণমেণ্ট যে কতবার আমাকে অন্তরীণে আবদ্ধ করিয়াছে,তাহা সংখ্যাতীত। পূর্ব্ব অভিজ্ঞতায় আমি বুঝিয়াছি ভারতের ভিতর হইতে যে আন্দোলনই করা যাউক না কেন, আমাদের জন্মভূমি হইতে ব্রিটিসকে বিতাড়িত করিবার পক্ষে তাহা মোটেই যথেষ্ট নয়। যদি দেশেই আমাদের অনুষ্ঠিত অভিযান যথেষ্ট হইত, তবে কি মূর্খের ন্যায় প্রাণ যাইবে নিশ্চিত জানিয়াও আমি দেশ ছাড়িয়া মৃত্যুপথ যাত্রী হইবার জন্য বিদেশে আসিয়া অভিযান করিতে সচেষ্ট হইতাম? আমার উদ্দেশ্যই ছিল দেশে যাহা করিবার আছে তাহা করা হউক কিন্তু বাহির হইতেও অন্যভাবে ইংরাজকে পর্যুদস্ত করা একান্ত আবশ্যক। তাই এই পথে বিচরণ করিতে আমি বাধ্য হইয়াছি। ইংরাজ এখন হতবল, হৃত সর্ব্বস্ব, চতুর্দ্দিকে বিপর্য্যস্ত, তাই আমাদের কাজও যেন সহজ হইয়া আসিয়াছে।

"একটা প্রশ্ন উঠিয়াছে বাহিরের সাহায্য গ্রহণ করা সঙ্গত কিনা? যদি শক্তিশালী বৃটেনই আমেরিকা ও অপরাপর শক্তিশালী জাতির সাহায্য গ্রহণে বিরত বা কুণ্ঠিত না হয়, তবে দেশের স্বাধীনতার জন্য আমাদেরইবা অপরাপর শক্তির সাহায্য গ্রহণ করায় কি বাধা বা দোষ থাকিতে পারে? আমাদের জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক অবস্থার সুযোগ আমরা কেন লইব না?

দ্বিতীয়তঃ আমাদের ভারতের বাহিরস্থ এই ত্রিশলক্ষ সৈন্যই কি স্বাধীনতা

অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইবে? হাঁ হইবে। আয়ার স্বাধীনতা লাভ করে কেবলমাত্র পাঁচ হাজার সিনফিন স্বেচ্ছাসেবকের আপ্রাণ চেষ্টায়, প্রতাপ সিংহ স্বাধীনতা লাভ করেন অত্যল্প সংখ্যক ভীল সৈন্য লইয়া, শিবাজীও স্বরাজ্য লাভ করেন অত্যল্প মাওলী সৈন্য লইয়া। আর আমাদের ত্রিশলক্ষ দৃঢ়সঙ্কল্প সৈন্যরাজি পারিবেনা হৃত রাজ্যের পুনরুদ্ধার সাধন করিতে?"

অতঃপর স্থভাষচন্দ্র অর্থবল ও লোকবলের জন্য সকাতরে অথচ দৃঢ়ভাবে সকলের নিকট আবেদন করেন। স্ত্রীবাহিনী গঠন সম্বন্ধেও এখানেই আলোচনা হয়।

এই সভাতেই নেতাজী স্থভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্ব্বাধিনায়ক ও পরিচালক হন। তাঁহার সেখানকার নাম হয় সিপাসালার। ২৫ আগষ্ট (১৯৪৩) স্থভাষচন্দ্র ঘোষণা করেন—

"ভারতের স্বাধীনতার অর্থই ৩৮ কোটি নরনারীর স্বাধীনতা লাভ। জগতের লোক সংখ্যার পাঁচভাগের একভাগ লোক ভারতবাসী এখন দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ, তাহাদিগকে শৃঙ্খল মুক্ত করিতেই হইবে, আর সেকাজের ভার আসিয়াছে আমাদের এই আজাদ হিন্দ ফৌজের উপর। চল, দিল্লী চল, অগ্রসর হও, জানিবে বিজয়লক্ষ্মী নিশ্চয়ই আমাদের কণ্ঠে জয়মাল্য পরাইয়া দিবে। চলো চলো, ঐ সম্রাট—প্রতিনিধি লিংলিথগোর স্থরম্য হর্ম্ম্যে জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিতেই হইবে, লাল কেল্লা দখল করিতেই হইবে"।

অতঃপর সমাগত হইল ২১ অক্টোবরের সেই জাতীয় গৌরবময় দিবস। ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের এক সভা বা সম্মিলন হয় ঐ তারিখে সিঙ্গাপুরের কেথেয় বাড়ীতে। নেতৃবৃন্দ সকলেই উপস্থিত ছিলেন এবং ইন্দোচীন, বার্ম্মা, স্থমাত্রা, জাভা, হংকং, শ্যাম, হইতে বহুপ্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেই সম্মিলনে প্রায় দশহাজার লোক সমাগত হয় আর কি যে তাহাদের মধ্যে উৎসাহ আশাও উদ্দীপনা! পূর্ব্বে কেহ তাহা দেখেনাই, স্বপ্নেও ভাবেনাই। প্রথমেই কর্ণেল অনিল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অভিভাষণ দেন, তারপর সমগ্র জনসঙ্ঘকে স্তব্ধ করিয়া স্থভাষচন্দ্র

যখন প্রত্যেকটি কথা বলিতে থাকেন, শ্রোতৃবৃন্দ যেন চিত্রার্পিতের ন্যায় মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া শুনিতে থাকে, আর মাঝে মাঝে অবিশ্রান্ত হর্ষধ্বনি উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক বিকম্পিত হয়।

সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ সরকার গঠন সম্বন্ধেই বলিতে থাকেন—

"আমাদের স্বাধীনতা প্রায় আগত, এখনই সময় যে অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার (গভর্ণমেণ্ট) প্রতিষ্ঠা করিয়া আমরা স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিচালনা করিব। কিন্তু ভারতের মধ্যে যে সমস্ত নেতা রহিয়াছেন তাঁহারা সকলেই কারাবাস করিতেছেন। ভারতের অসংখ্য নরনারী বিয়াল্লিসের সংগ্রামে নিহত, প্রহৃত, হৃতসর্ব্বস্ব। যাঁহারা আছেন তাঁহাদেরও কোনরূপ অস্ত্রই নাই।

"ইংরাজ তাহাদিগকে একেবারে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছে! পূর্ব্ব এসিয়া বাসী ভারতীয় বীরগণই যুদ্ধ করিয়া ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবেন আর সেই উদ্দেশ্যেই এই স্বাধীন সরকার সংগঠিত হইল"!

দৃঢ় কণ্ঠে তিনি তৎপরে শপথ পাঠ করেন—

"ভগবানের নামে আমি সুভাষচন্দ্রবসু এই পবিত্র শপথ গ্রহণ করিতেছি যে, ভারতবর্ষকে শৃঙ্খল মুক্ত করিতে ও উহার ৩৮ কোটি নরনারীর দাসত্ব মোচন করিতে, দেহে এক বিন্দু রক্ত থাকা পর্য্যন্ত, একেবারে প্রাণবায়ু বহির্গত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত—আমি স্বাধীনতার সংগ্রাম হইতে কখনও বিরত হইবনা।"

শপথ পাঠ করিবার সময় তাঁহার ধীর নিশ্চল দীর্ঘদেহ এবং তাঁহার আবেগময় স্বর সমাগতজনসঙ্ঘকে আনন্দে পরিপূর্ণ করিয়া তোলে। সুভাষচন্দ্র আরও বলেন—

"আমি আমরণ ভারতবর্ষের সেবক হইয়াই থাকিব। ৩৮ কোটি নরনারীর সুখশান্তিই আমার জীবনের ব্রত হইবে, আর শেষ রক্তবিন্দু দানেও ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে আমি কখনও দ্বিধা করিবনা বা নিশ্চেষ্ট রহিবনা।"

শপথ পাঠ করিবার পরে গগন বিকম্পিত করিয়া ধ্বনি উঠিল—

"সুভাষচন্দ্র বসু কি জয়! ভারত মাতাকি জয়। আর্জ্জি হুকুমত আজাদ হিন্দ কি জয়"—

সেই ধ্বনিও আবার প্রতিধ্বনিত হইল

"আজাদ হিন্দ কি জয়!"

অতঃপর আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের ঘোষণা সুভাষচন্দ্র নিজেই পাঠ করেন :—

"১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিসের হস্তে পরাজিত হইবার সময় হইতে ভারতবর্ষবাসীগণ শতবর্ষব্যাপী যে সংগ্রাম চালাইয়া আসিয়াছেন তাহা বীরত্ব ও স্বার্থত্যাগের কাহিনীতে পরিপূর্ণ, আর সেই গৌরবময় যুগের ইতিহাসে সিরাজদ্দৌলা ও মোহনলাল, হায়দার আলি ও টিপু সুলতান, আপ্পাসাহেব ভোন্‌সলা, বাজীরাও পেশোয়া, অযোধ্যার বেগম প্রভৃতির নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবে। আর ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাই, তাঁতিয়া টোপী, কুমার সিংহ, নানাসাহেব প্রভৃতির নামও কম স্মরণীয় নয়।

"আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই যে ইংরাজ সমগ্র ভারতের কতবড় শত্রু। শতবর্ষ পরে একবার বুঝিতে পারিয়া ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সমবেত প্রয়াসে উদ্যত হয়—"বাহাদুর সাহার শাসনকালে, তাঁহারই পতাকাতলে দাঁড়াইয়া স্বাধীনতার জন্য তাঁহারা প্রচণ্ড যুদ্ধ চালাইয়াছিল এবং প্রথমে যদিও অনেক স্থানে সাফল্য লাভ করিতে সমর্থ হয় কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ও উপযুক্ত নেতার অভাবে শেষ পর্য্যন্ত পর্যুদস্ত হয় এবং তাহাদের সেই প্রচেষ্টা বিফলতায়ই পর্য্যবসিত হয়। পরাজিত হইলেও ঝাঁসির রাণী, তাঁতিয়া টোপি, কুমারসিং ও নানাসাহেব যে সাহস ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের আদর্শ জাতির পক্ষে আলোক বর্ত্তিকার ন্যায় আমাদের হৃদয়ে চিরকার জ্বলন্ত ভাবে জাগ্রত হইয়া থাকিবে"।

"সেই বিপ্লবের পরিণামেই ভারতবাসীর দুর্গতির চরম হইল, ইংরাজ তাহার হাতিয়ার বন্দুক সবই কাড়িয়া লইল, আত্মরক্ষার জন্য স্বেচ্ছায় তাহার সামান্য বন্দুকটিও রাখিবার উপায় রহিল না। অতঃপর ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে জাতীয় সভাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়, আবার নব জাগরণের সূত্রপাত হয়। তারপরে দীর্ঘ ত্রিশবৎসর পর্য্যন্ত কত ভাবে তাহারা আত্মনিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করিয়াছে, আন্দোলন

প্রচার, স্বদেশী গ্রহণ, বিলাতীবর্জ্জন, সন্ত্রাসবাদ, গুপ্ত ক্রিয়া কলাপ, প্রকাশ্য সমর. কিন্তু সবই প্রায় ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। যখন প্রথম মহাসমর আরম্ভ হয় আমাদের দিক্ হইতে সহযোগিতার কোন ত্রুটি হয় নাই কিন্তু তাহাতেও ভারতের ভাগ্যেতো বিন্দুমাত্র লাভ হয় নাই। অতঃপর মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব হইল এক অভিনব অস্ত্র সঙ্গে লইয়া। এই অস্ত্র হাতিয়ার তলোয়ার নয়,—অস্ত্র অহিংস সত্যাগ্রহ আর অসহযোগ।

"গত কুড়ি বাইশ বৎসর এই ভাবেই কংগ্রেসের কার্য্য চলে, আর পল্লীতে নগরে প্রতি গৃহে কংগ্রেসের বার্ত্তা পৌছিতে পারায় সমগ্র জাতি সববেত কণ্ঠে স্বাধীনতার দাবী উপস্থিত করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। কয় বৎসরের জাগরণে যে শক্তি সঞ্চিত হইয়াছে, তাহারই ফলে ও বলে কংগ্রেস আটটি প্রদেশে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিয়া নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে।"

"তারপরে আসিল দ্বিতীয় মহাসমর। এবার ভারতবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অধ্যায় আসিয়া সমাগত হইয়াছে। দেখিতেছি জার্ম্মাণী ব্রিটেনকে নানাস্থানে বিপর্য্যদস্থ করিতেছে। জাপান ও আমেরিকাকে পূর্ব্ব এশিয়ায় ও প্রশান্ত মহাসাগরে নাজেহাল করিয়া ছাড়িয়াছে। ভারতবাসীর পক্ষে এইতো শুভ সুযোগ, এ সুযোগ ছাড়িলে আর ইহা কখনও আসিবে না।"

"জগতের ইতিহাসে এই প্রথম যে ভারতবাসী বিদেশে এমনি ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে সমর্থ হইয়াছে। পূর্ব্ব এশিয়ায় অন্যূন বিশ লক্ষ ভারতবাসী সমস্বরে দাঁড়াইয়া নেতার আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছে। অচিরেই তাহারা সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হইবে, আমরা অচিরেই চক্ষুর সম্মুখে দেখিব এই ভারতীয় সুগঠিত মুক্তিফৌজ! ইহার এক লক্ষ্য স্বাধীনতা, উদ্দেশ্য মুক্তি আর গন্তব্য পথ "দিল্লীর লালকেল্লা"। মনে রাখিও দিল্লী অধিকার না করা পর্য্যন্ত, লালকেল্লায় সৈন্যগণের বিজয়োৎসব না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের অভিযানের শেষ নাই। অগ্রসর হও, অগ্রসর হও, দিল্লী চলো, মুখে প্রতিধ্বনিত হৌক, ভগবান তোমাদের শক্তি দিন, আর অচিরেই তোমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।"

"ভারতবাসী আর ইংরাজের স্তোক বাক্যে প্রলোভিত হইবে না। সেই প্রবঞ্চনা, শঠতা ধ্বংস করিবার জন্য সকলে একত্রিত হইয়াছে। আমরা স্বদেশের সহায়তা পাইব। ইংরাজ অধীনস্থ বিদেশস্থ ভারতবাসীরও সহায়তা পাইব। আমাদের এক উদ্দেশ্য ভারতের মুক্তি, ইহা ভিন্ন আর অন্য কোন চিন্তা নাই, অন্য কোন ধ্যান নাই, অন্য কোন কাজ নাই। আমরা নিশ্চয়ই ভারতের দাসত্ব শৃঙ্খল মোচন করিতে পারিব। আমাদের সমরায়োজনও তেমনি কার্য্যকরী হওয়া চাই, পূর্ণ হওয়া চাই, ষোল আনা হওয়া চাই।"

"স্বাধীনতার আলোকের উন্মেষেই আমাদের 'স্বাধীন ভারত' ঘোষণা করিয়া স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করা উচিত, যেন স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম স্বাধীন গভর্ণ-মেণ্টের অনুশাসনেই পরিচালিত হয়। কিন্তু ভারতের নেতৃবৃন্দ আজ সকলেই কারা-রুদ্ধ, ভারতের কোন ব্যক্তির লাঠিটি পর্য্যন্ত হাতে লইবার অধিকার নাই। সুতরাং ভারতের অভ্যন্তরে কোন স্বাধীন সরকার স্থাপন করা একেবারে সম্ভব নাই। তাই ভারতের বাহিরে, ভারত ও বাহিরস্থ ভারতবাসীর সহযোগিতা অবলম্বনে পূর্ব্ব এশিয়ার এই স্বাধীন ভারত সঙ্ঘেরই কর্ত্তব্য ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করা। যেন এই স্বাধীনতা সঙ্ঘের নির্দ্দেশেই স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম পরিচালিত হয়।"

"এই অস্থায়ী সরকার —প্রতি ভারতবাসীর আনুগত্য লাভ করিবার যোগ্যতা উহা দাবী করে। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ইহা প্রদান করিবে, আর ইহাতে প্রতি নাগরিকের সমান সুবিধা ও সুযোগ থাকিবে। বিদেশী গভর্ণমেণ্ট কৌশলে যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছে, ভেদ বুদ্ধি অতিক্রম করিয়া সাম্য স্থাপন এবং সকল ভারতবাসীর সুখ সমৃদ্ধি ও শান্তি বিধানই ইহার একমাত্র কাম্য। ভগবানের নামে সকল ভারতবাসীকেই বীরত্ব ও আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া ভারত উদ্ধার ব্রত গ্রহণ করিতে আমি অনুরোধ করি। আসুন আমরা সকলে মিলিয়া দৃঢ়পণে ভারত ভূমি হইতে ইংরাজ শত্রু বিতাড়িত করিয়া জন্মভূমির প্রতি কর্ত্তব্য সাধন করি, আর যে পর্য্যন্ত আমাদের সেই কর্ত্তব্য সাধিত না হয়, সেই

সংগ্রামে আমরা যেন কখনও বিরত না হই। ভগবান মাতৃভূমি উদ্ধার কল্পে আমাদের এই প্রয়াস সাফল্য মণ্ডিত করুন—জয় হিন্দ।”

অতঃপর সুভাষচন্দ্র আজাদ সরকার ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্ব্বাধিনায়ক হন। **Head of the State, Prime Minister and Minister for War Minister for foreign Affairs, Supreme Commander of the Indian National Army** আর রাসবিহারী বসু হন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা। মহিলা বিভাগের অধিনায়িকা হন কাপ্টেন লক্ষ্মী নাথন। প্রচার বিভাগের কর্ত্তা হন এস,এ, আয়ার, অর্থ সচিব হন **Lieut Col A. C. Chatterjee.**

আজাদ হিন্দ সরকার ঘোষিত হইবার পরে নিম্নলিখিত জাতীয় সঙ্গীতটি গীত হয়ঃ—

“—সদা সুখ চায়েন কি বরষা বরষে
ভারত ভাগ হায় জাগো
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারঠা দ্রাবিড় উৎকল বংগ
সব মিল কর হিন্দু পুকারে, জয় আজাদ হিন্দ কি সবে,
পিয়ারে দেশ হামারে—ইত্যাদি”

অস্থায়ী আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর সব কাজই শৃঙ্খলার সহিত অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে যে স্বাধীনতা সঙ্ঘ ও আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যে মত পার্থক্য চলিতেছিল, যে মত পার্থক্যের ফলে আজাদ হিন্দ বাহিনী একরকম ভাঙ্গিবারই উপক্রম হইয়াছিল, গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় উভয়ই সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হইল; আর সর্ব্বোপরি রহিলেন নেতাজী সুভাষ। তিনি তিনটির উপরে সর্ব্ব প্রধান রহিলেন—আজাদ হিন্দ সরকার, আজাদ হিন্দ ফৌজ ও পুনর্গঠিত স্বাধীনতা সঙ্ঘ (**Indian Independence League**)।

স্বাধীনতা সঙ্ঘের কাজ হইল সৈন্যশ্রেণী ভুক্ত করা, অর্থ সংগ্রহ করা, সামাজিক শৃঙ্খলা বিধান করা, প্রচার ও শিক্ষা ব্যবস্থা, সেবা ধর্ম্ম প্রসার। মহিলা বিভাগ ও রাজনৈতিক বিভাগ স্থিরীকৃত হইল। আজকাল ভারতে নিখিল

ভারত কংগ্রেস কমিটির ওয়াকিং কমিটি ও গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে যেরূপ সম্পর্ক, স্বাধীনতা সঙ্ঘ ও আজাদ হিন্দ সরকারের সেইরূপ সম্বন্ধ ছিল। তবে নেতাজী সুভাষ লীগকে আরও জীবন্ত ও কার্য্যকরী করিতে চাহিয়াছিলেন। ইহার প্রধান আফিস আসিল সিঙ্গাপুরে আর পূর্ব্ব এশিয়ার সমস্ত স্থানেই ইহার শাখা রহিল। ইহার সংবাদ বিভাগ এবং আজাদ হিন্দ গেজেট পরিচালনা করেন আর, এস, রাওয়াল।

সুভাষ চন্দ্র গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিয়াই চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন না। জাপানী ইম্পিরিয়াল গভর্ণমেণ্ট দ্বারা উহা স্বীকার করাইয়া লইলেন। অতঃপর উক্ত গভর্ণমেণ্ট ঘোষণ করিল যে আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট যেন স্বাধীনতা লাভে সমর্থ হয় তজ্জন্য জাপান গভর্ণমেণ্ট উহাকে সর্ব্ব প্রকার সাহায্য করিতে বিরত হইবে না। ২১ অক্টোবরের দুইদিন মধ্যেই তোজো আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট স্বীকার করেন। ইহার পরেই নেতাজী তাহার গভর্ণমেণ্টকে দিয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। সমগ্র প্রবাসী ভারতবাসীকে তিনি সাগ্রহে আহ্বান করিলেন। ভারত উদ্ধার কল্পে যে যেখানে ছিল ভারত বাসী আসিয়া সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হইতে লাগিল; দ্রুতগতিতে সৈন্যদের শিক্ষা চলিল। এক বৎসরের মধ্যে সৈন্য সংখ্যা হইল প্রায় ষাট হাজার। আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার সংখ্যা ছিল ১৫০০ শত।

যেমন তিনি আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলকে সৈন্য শ্রেণী ভুক্ত হইতে অনুরোধ করেন, আবার অর্থ সংগ্রহেও বিশেষ ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ভারতীয় বণিক ও ব্যবসায়ী যে যেখানে ছিলো সকলকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, সকলে সাহায্যার্থ অগ্রসর হইতে লাগিল, পূর্ব্ব এশিয়ায় স্বাধীনতা লাভের স্পৃহার প্রবল বন্যা প্রবাহিত হইল। সকলের মুখে শ্রুত হইত এক কথা "জয় হিন্দ ও দিল্লী চলো"।

নেতাজীর প্রধান আর একটি কাজ মহিলা সৈন্য সংগ্রহ। ২২সে অক্টোবর তিনি প্রথমে একটি সভা করিয়া মহিলাগণকে আহ্বান করেন। একাজ নেতাজীর নূতন নহে। ১৯২৭ সালে অনেক মহিলা সভায় গিয়া মহিলাদিগকে সংগঠন কার্য্যে

লাগাইতে সহকর্ম্মীরা দেখিয়াছে। আর ১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেস অধিবেশনের সময়ে শ্রীমতী লতিকা ঘোষ, অরুসেন প্রভৃতির নেতৃত্বে তিনি যে মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী গঠন করেন, এবার তাহাই প্রকৃষ্টভাবে দেখা দিল। ক্যাপ্টেন লক্ষীর অধিনায়কত্বে তিনি পরিপুষ্ট মহিলা কর্ম্মীগণকে যুদ্ধ কার্য্যের জন্য তৈয়ার করেন। মহিলা ফৌজ গঠনের দিবস (২২ অক্টোবর) তিনি যে অভিভাষণ দেন তাহাও বড় মর্ম্মস্পর্শী :—

"আজ পূর্ব্ব এশিয়ার সমস্ত ভারতবাসী স্বাধীনতা লাভের জন্য বদ্ধ পরিকর, আমাদের মহিলা বৃন্দ কি এই সঙ্কট সময়ে নিদ্রিতা থাকিবেন ? তাঁহারাও সমভাবে আমাদের সাহায্য করিয়া নারীজাতির গৌরব রক্ষা করুন। ভারতের নারীরা জাতীয় সংগ্রামে কখনও পরান্মুখ নয়, ধনুকের ছিলা করিবার জন্য তাঁহারাই কেশ কাটিয়া দিতেন, গোলাগুলির জন্য দেহাভরণ খুলিয়া দিতেন, ঝাঁসির রাণী বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাই একদিনেই সমুদ্ভুত হন নাই। অহল্যাবাই যেমন যুদ্ধ করিতে পারিতেন, রাজ্যশাসনেও তেমনি পারদর্শিনী ছিলেন। ভারতের একমাত্র মহিলা সাম্রাজ্ঞী সুলতানা রিজিয়া যুদ্ধক্ষেত্রেও যেমন নির্ভীকা, শাসন ব্যাপারেও তেমনি অনমুকরণীয়া, বাঙ্গলার রাণী ভবানী কেবল দানেই প্রাতঃস্মরণীয়া নহেন, শাসন ব্যাপারেও ছিলেন আদর্শ শাসনকর্ত্রী ; বেগম নুরজাহানের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং রাজ্য পরিচালনা ক্ষমতার সহিত কে না পরিচিত ?

"আর এই 'ঝাঁন্সি কি রাণী' বিশ বৎসর বয়সে ঘোড়ায় চড়িয়া অবলীলাক্রমে যেরূপ তলোয়ার চালাইতেন, জগতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বড়ই বিরল। ইংরাজ সেনাপতিগণও বলিতে বাধ্য হন ভারতের বিদ্রোহীগণের মধ্যে ইনিই একমাত্র প্রকৃত যোদ্ধা। লক্ষ্মীবাঈ প্রথমে নিজ দুর্গ হইতে যুদ্ধ করেন। পরাস্থ হইয়া কাল্পীতে পলায়ন করিয়া সেখানে যুদ্ধে অগ্রসর হন। অতঃপর সেখান হইতে পলাইয়া তাঁতিয়া টোপির সঙ্গে একতাবদ্ধ হইয়া গোয়ালিয়ার দুর্গ অধিকার করিতে সমর্থ হন।

"এখান হইতে বীরপুরুষের ন্যায় কয়দিন ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া বীরের শয্যা

গ্রহণ করেন। মৃত্যুতে কি তাঁহার যশ ম্লান হইয়াছে? তাঁহার এই পরাজয় ভারতের পরাজয়। তিনি মরিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার আত্মাতো মরে নাই, আদর্শও মরে নাই, আবার তাঁহার আদর্শে আপনারা অনুপ্রাণিত হইয়া সমরে অগ্রসর হউন। বিজয় লক্ষ্মী আপনাদের কণ্ঠেই জয়মাল্য পরাইয়া দিবেন।"

১৯২৮ সালের কংগ্রেস সেবিকা গঠনে তিনি যে বক্তৃতা দেন, তাহারই পরিপুষ্টি ও কার্য্যকারিতা পরিলক্ষিত হয়, ১৫ বৎসর পরে এইখানে।

নারী সেবিকাগণকে লইয়া এই ঝাঁন্সি রাণী রেজিমেণ্ট গঠিত হয়। ইহার তাৎপর্য্য ও ব্যাপকতা খুব বেশী। কালে আমাদের দেশেই একদল নারী, রাজপুত রমণীগণের ন্যায়, সুলতানা রিজিয়ার ন্যায় অহল্যাবাই লক্ষীবাঈর ন্যায় যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিনী হইতে পারিত। উক্ত ঝাঁন্সির রাণী রেজিমেণ্টের অধিনায়িকা হন ক্যাপ্টেন লক্ষীস্বামীনাথন। যুদ্ধের সময় নানাবিধ কর্য্যে, এই বাহিনী অপূর্ব্ব বীরত্ব ও সাহস প্রদর্শন করে। এই ঝাঁন্সির রাণী ব্রিগেডে ১২০০ মহিলা ছিলেন। ইঁহারা প্রচার কার্য্য চালাইতেন ও আহত সৈন্যগণের সেবা শুশ্রূষা করিতেন। ইহারা ফুল প্যাণ্ট, খাকি সার্ট, বুটজুতা পরিতেন।

'যুদ্ধক্ষেত্রে আজাদ হিন্দ ফৌজকে সহায্য করিবার জন্য একটি 'বাল সেনাদলও গঠিত হয়; এই বাল সৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্রে অপূর্ব্ব বুদ্ধিমত্তা, সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়া স্মরণীয় হইয়াছে।

জেনারেল তোজো আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টকে কেবল স্বাধীন ও স্বতন্ত্র গভর্ণমেণ্ট বলিয়াই স্বীকার করেন নাই, সুভাষচন্দ্রের সাহস, বীরত্ব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখিয়া তিনি পূর্ব্ব এসিয়ার জাতি সাম্মলনে (Assembly of Greater East Asiatic Nations) ৬ই নভেম্বর তারিখে (১৯৪৩) ভারতের আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ দুইটি আজাদ হিন্দ সরকারকে উপহার দেন। দিল্লীর লাল কেল্লায় জেনারেল সা নাওয়াজ, প্রভৃতির বিচারের সময় জাপানের

পররাষ্ট্র বিভাগের সাবুরা ওহাটা, জেনারেল তোজোর ঘোষাণাটি আনিয়া দাখিল করেন। সেটি এই—

"Now that the foundation of the Provisional Government of Azad Hind has been solidified still further and the Indian patriots under the same Government are firmly determined to accomplish their steadfast aim, I take this occasion to declare that the Imperial Government of Japan is ready shortly to place the Andamans and Necobar Island of Indian territory, now under the occupation of Imperial Japanese forces under the jurisdiction of the Provisional Government of Azad Hind as the initial evidence of her readiness to help in India's struggle for freedom. Japan was determined to extend all possible Co-operation to India in her fight for freedom. Japan was anxions that the Indians, on their part, should redouble their efforts in that direction."

সুভাষচন্দ্রের স্বাধীন ভারত গভর্ণমেণ্ট ও জাপানী গভর্ণমেণ্টের মধ্যে রাজনৈতিক কথাবার্ত্তা চালাইবার জন্য **Mr Hachiya** জাপানের প্রতিনিধি নিযুক্ত হন।

জাপানের পররাষ্ট্র বিভাগের আর একজন মন্ত্রী স্থনিচি মাট্‌সুমটোও উক্ত মোকদ্দমার সাক্ষ্য দেওযার সময লাল কেল্লায কোর্টে বিবৃতি দেন,—

"কেবল জাপান নয, অন্যান্য সবকারও—প্রধানতঃ ক্রোসিয়া, মাঞ্চুকো, জার্ম্মাণী, ইটালী, শ্যাম, ন্যানকিন, বর্ম্মা প্রভৃতি জাপানের মিত্রশক্তি সমুহ সকলেই আজাদ হিন্দ সরকারকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

"সুভাষচন্দ্র বসু যে জার্ম্মাণী হইতে জাপানে আসেন, জাপান গভর্ণমেণ্টই জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট দিয়া ইহা করাইয়াছিলেন।"

"জাপান যুদ্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল প্রাচ্য দেশে ভারতের স্বাধীনতা। ভারত সম্বন্ধে জাপান যাহা কিছু করিয়াছে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই করিয়াছে,

আহাদের যুদ্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য করিয়াছে। সুভাষচন্দ্র স্বর্ব্বাধিনায়কতার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়াই তাহাকে সহায়তা করিয়াছে।"

আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্ট ঘোষিত হইবার পরে, আর জাপান ও অন্যান্য জাতি কর্ত্তৃক শীঘ্র শীঘ্র স্বীকৃত হওয়ায় সুভাসচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত ভারত সরকারের অন্তর্গত দলে দলে লোক আসিয়া স্বাধীন ভারতে যোগদান করিল, আর সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থানে স্বাধীন ভারতের লোক বলিয়া এখন তাহাদের সম্মান বাড়িয়া গেল। স্বাধীনতা সঙ্ঘেরও সর্ব্বত্র শাখা প্রতিষ্ঠিত হইল—এক বার্ম্মায়ই হইল শতাধিক, মালয়ে ৭০টি, শ্যামে ২৪টি, সুমাত্রা বোর্ণিও দ্বীপপুঞ্জে, ইন্দোচীন, চীনদেশে সর্ব্বত্রই শাখা প্রতিষ্ঠিত হইল।

দ্বীপপুঞ্জের শাসন পরিচালনার ভার ন্যস্ত হয় কর্ণেল লোকনাথনের উপরে, আন্দামানের নাম হইল শহীদদ্বীপ, আর নিকোবরের নাম হইল স্বরাজ দ্বীপ। ২৭ ফেব্রুয়ারী (১৯৪৪) হইতে উভয় দ্বীপে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্থিত হয়।

পোর্টব্লেয়ারেও শাখা স্থাপিত হয়। আন্দামান ও নিকোবরের ভারতীয়গণকে ট্যাক্স দিতে হইত জাপানকে, নয় ভারত গভর্ণমেণ্টকে। ইংরেজ যখন ভারতীয়গণকে জাপানীদের হাতে দিয়া যায়, তাহাদের ধন সম্পত্তি, বাড়ীঘর সবই ছিল বিপদাপন্ন। এখন স্বাধীন গভর্ণমেণ্টের প্রজা বলিয়া সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট থাকায় সৈন্যশ্রেণীভুক্ত করাও সহজ হইয়া আসিল।

গভর্ণমেণ্ট চালাইতে সর্ব্বাগ্রে অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু অর্থ আসিতে লাগিল অজস্র। সকলে স্বেচ্ছায় টাকা, জহরত, সোনা দাণা দিতে লাগিল।

সুভাষচন্দ্রের একমাত্র কাজ ভারতের স্বাধীনতা, তাই তিনি ভারতের নিকটস্থ বলিয়া ১৯৪৪ সালের ৭ জানুয়ারী সিঙ্গাপুর হইতে রেঙ্গুনে আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ভারতীয়গণ জন্মভূমির কাছে আসিয়া আরও সোয়াস্তি বোধ করিতে লাগিলেন।

রেঙ্গুণে জাতীয় ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইল। এপর্য্যন্ত স্বেচ্ছায় দানে গভর্ণমেণ্ট চলিয়াছে,

এখন চলিল ব্যাঙ্কেব সহয়াতায। ব্যাঙ্কেব মূলধন দবকার। কিন্তু রেঙ্গুনের গণি নামক মুসলমান ধনী ব্যবসায়ী একাই দিলেন ৬৩ লক্ষ টাকা। সুভাষচন্দ্রকে তিনি জিজ্ঞাসা কবিযাছিলেন :—

"কত টাকাব দবকাব আপনাব ?"

সুভাষ—পঞ্চাশ লক্ষ।

গণি—আচ্ছা ভাবিবেন না, আজ ত্রিশলক্ষ নিন, এ সপ্তাহেই বাকী টাকা পাইবেন।

গণি সাহেব বাকী কুডি লক্ষ তো দিলেনই, অনেক জহবতও দিলেন, আব একটী জমিদাবী ষ্টেটও দিলেন। গণি যাহা কবিলেন কৃতজ্ঞতা স্বরূপ। তাহাব সম্বন্ধে জাপানী গভর্ণমেণ্টেব সন্দেহ হওযায তাহাকে কিছুদিন জেলে থাকিতে হইযাছিল, তবে নেতাজীব সাহার্য্যেই তাহাব মুক্তিলাভ হয।

এই ব্যাঙ্কেব বার্ষিকী অনুষ্ঠানে উপহাব হিসাবে অনেকেই আজাদহিন্দ গভর্ণমেণ্টকে লক্ষ টাকা উপহাব দিযাছেন। সময সময় সুভাষচন্দ্রেব মালা এক লক্ষ টাকা হইতে ১২ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রী হয়। এইরূপ বহু লোক টাকা দিযাছিল। মিসেস হীবালাল বেতাইও অনেক টাকা দেন।

ব্যাঙ্কে প্রায ৮কোটি টাকা জমিযাছিল, এবং ইহা হইতেই যাবতীয যুদ্ধ সবঞ্জাম গোলাগুলি ক্রয কবা হইত।

সুভাষচন্দ্র নিজেব উদ্দেশ্য, সেখানকাব কাজ ও ভবিষ্যতেব আশা সবই বেতাবযোগে বিবৃত কবিযা মহাত্মাজীব আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা কবিতেন।

সুভাষচন্দ্র যে জাতীয সৈন্যদল গঠন কবেন, তাহাদেব মধ্যে কোনরূপ জাতি-ভেদ বা বর্ণ বৈষম্য ছিলনা। খাইতে শুইতে বেডাইতে সকলেই পবস্পব পবস্পবকে পবমাত্মীয় জ্ঞান কবিতেন। তাহাবা যে সহোদব নয, এরূপ কেহ মনে কবিতনা। বামকৃষ্ণদেব, বিবেকানন্দ ও দেশবন্ধুব অনুপ্রেবণা সর্ব্বত্র সুভাষচন্দ্রকে সফলকাম কবিয়াছিল।

আজাদ হিন্দ ফৌজেব বিভিন্ন অংশ—গান্ধী ব্রিগেড, নেহরু ব্রিগেড, আজাদ

ব্রিগেড, সুভাষবসু ব্রিগেড, প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার রৌদ্র তাপ জল বায়ু, অনসন অর্দ্ধাসনে অভ্যস্ত হইয়াছিল। তাহাদের পোষাক ছিল ইউরোপীয় ধরণেরই।

এইরূপে সুভাষচন্দ্র যখন গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতাভিযানে তৈয়ার হইবেন, দুইবার তাহার জীবনের উপরে আক্রমণ হয়। একবার রক্ষীদের মধ্যে একটি আততায়ী ঢুকিয়া যায়। রক্ষী সর্দ্দার বিশ্বম্ভর সকল সৈন্য fall in করিতে বলিলে উক্ত ব্যক্তি ধরা পড়ে। টের পাওয়া গেলে সে পিস্তল ছুড়িতে উদ্যত হয়। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধরিয়া ফেলা হয়। গোলমাল শুনিয়া উপর হইতে নেতাজী জিজ্ঞাসা করেন—"গোলমাল কিসের"?

সমস্ত শুনিয়া নেতাজী সেই ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিতে আদেশ দেন।

আর একবার একজন লোক রাসবিহারী বসু সাজিয়া মোটরে করিয়া আসিয়া বলে "আমি রাসবিহারী বসু। টোকিও হইতে অসিয়াছি। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করিতে চাই।"

কিন্তু রাসবিহারী বসু যে তখন টোকিওতেই ছিলেন, সুভাষচন্দ্র জানিতেন। ধরা পড়িবার আগেই লোকটা সরিয়া পড়ে।

অতঃপর ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আরাকান ও পরে মণিপুর রাজ্য আক্রমণ করাই স্থিরীকৃত হইল। স্থির হয় আজাদ হিন্দ ফৌজ জাপান সাম্রাজ্যের নিপুন বাহিনীর সহিত একত্র মিলিত হইয়া অভিযান করিবে। এই শুভ অভিযান উদ্বোধনে সুভাষচন্দ্র যে প্রাণস্পর্শী অভিভাষণ দেন তাহাতে সৈন্যগণের মধ্যে উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। তিনি বলেন—

"ঐ দূরে নদীর অপরপার হইয়া প্রান্তর জঙ্গলের অপর দিকেই ঐ পাহাড় পর্ব্বতের অপর দিকেই আমাদের দেশ, আমাদের জন্মভূমি দেখা যাইতেছে। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য আমাদের ভারতভূমি। ঐ দেশেই আমরা জন্মিয়াছি। ঐ দেশেই আবার আমাদের ফিরিয়া যাইতে হইবে। ঐ শোন মাতৃভূমির ক্রন্দন ধ্বনি—শোন ভারতের রাজধানী দিল্লীর আহ্বান---শ্রবণ কর ৩৮ কোটি নরনারীর কাতর আকূতি, ঐ শোন স্বজনের আকুল আহ্বান। ভারতবাসী আজ

বুবুক্ষিত, অত্যাচার প্রপীড়িত, মৃত্যুর দশায় পতিত—তাহাদের সাহায্যার্থেই আমাদের আত্মাহুতি দিবার সময় আসিয়াছে।

"উঠো—বীরবৃন্দ, যেমন সুপ্তসিংহ জাগরিত হয়। অবকাশের সময় নাই, যোদ্ধাগণ, অস্ত্র ধারণ কর। ঐ দেখ সম্মুখে পথ, আমাদেরই অগ্রগামীগণ আমাদের জন্য পথ রচনা করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ পথ ধরিয়া আমরা অগ্রসর হইব। আমরা ঐ শত্রুসেনার মধ্য দিয়াই পথ আরও সুগম করিয়া লইব। আমাদের উদ্দেশ্য সার্থক করিব। আর যদি ভগবানের ইচ্ছায় ঐ মহাকার্য্যে জীবনও বিসর্জ্জন করিতে হয়, বীরের ন্যায় আমরা মৃত্যু আলিঙ্গন করিব।

সুভাষচন্দ্রের জার্ম্মাণীতে বক্তৃতা ঃ—(২০২ পৃষ্ঠার পরে পড়ুন)

আমি চাহিনা তোমরা ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই আজাদহিন্দ বাহিনীতে যোগদান কর। যদি জন্মভূমির প্রতি তোমাদের অনুরাগ থাকে, যদি জন্মভুমির স্বাধীনতা তোমরা কামনা কর, যদি জন্মভুমির উদ্ধারকল্পে তোমরা প্রাণবিসর্জ্জনেও প্রস্তুত থাকো, তবেই এসো, নতুবা আমার কথাতেই কেহ আসিবে না, কোন লোভের আশায় আসিবেনা, বরাবর এই ব্রত পালন করিতে না পারিলে আসিবে না।"

জার্ম্মাণীতে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠিত হয়। জার্ম্মাণগণ ভারতীয়দিগকে নাগরিক হিসাবে সব সুবিধাই প্রদান করিয়াছিলেন। সেখানে আজাদ হিন্দ ফৌজের একটী নাট্য সম্প্রদায়ও ছিল। হিটলার সুভাষচন্দ্রকে ড্রেসডেনে একটী প্রাসাদোপম অট্টালিকা আজাদ হিন্দের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র হিসাবে দিয়াছিলেন। সুভাষচন্দ্র সেখানে মোটরে আসিতেন যাইতেন, তবে তিনি বার্লিনেই থাকিতেন। ঐ গাড়ীতে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা থাকিত। আজাদ হিন্দ সৈন্যগণ এই গানটি গাহিতেন ঃ—

"আগে আও কদম বঢ়ে
মিলকর সবে বীর
তোর মুকাও মোর মুকাও
গুলামী কি জনজির।"

আর জন্মভূমির ক্রোড়ে একবার মাতৃস্তন্য পান করিবার মত ঐ পবিত্র ভূমি শেষ চুম্বন করিয়া লইব। কারণ ঐ পথেই স্বাধীনতাযুদ্ধের সৈনিকগণ আসিয়া পৌছিবে। দিল্লীর পথই স্বাধীনতার পথ। সেই স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হও, বীরগণ দ্রুতপদবিক্ষেপ কর---অগ্রসর হও, দিল্লী চলো, দিল্লী চলো। সাম্রাজ্যবাদের শ্মশানক্ষেত্র তথায় রচনা করো।"

সুভাষচন্দ্রের বজ্রনির্দ্দোষ বাণীতে ভারতীয় সৈন্যগণ জন্মভূমির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। মাতৃভূমিতে পৌছিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হইল। সাম্রাজ্যবাদের সমাধি রচনাই তাহাদের মন্ত্র ও সাধনা হইয়া উঠিল।

ইহার পরে রণদামামা বাজিল। একদিন যুবকগণ গাহিয়াছিল (১৯০৫)

"চল চল রে চল সবে ভারত সন্তান
জীবন আহবে চল,"

চল্লিশ বৎসর পরে আবার তাহাদেরই দেশবাসী সকল ভারতীয় সৈনিকগণ সমর-সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে দিল্লীর পথ লক্ষ্য করিয়া অভিযান করিল—

"কদম কদম বাঢ়ায়ে জা,
খুসী কে গীত গায়ে জা
এ জিন্দ্‌গী হৈ কৌমকী
তো কৌমপর লুটায়ে জা

তু সেরে হিন্দ আগে বঢ়
মরণেসে ফির ভী তুন ডর,
আস্‌মান্ তক্ উঠাকে শির
জোসে বতন বঢ়ায়ে জা

তেরি হিম্মত বঢ়তী রহে
খুদা তেরে শুনতা রহে
জো সামনে তেরে চঢ়ে
তো থাকমে মিলানে জা!

চলো দিল্লী পুকারকে,
কৌমী নিশান সম্ভারকে
লাল কিলে পো গাড়কে
লহ্ রায়ে জা, লহ্ রায়ে জা।"

ভারতীয় সৈন্যগণ চারিভাগে বিভক্ত হয়—(১) সুভাষ ব্রিগেডে ছিল ৩২০০ সৈন্য, ইহার নেতা ছিলেন কর্ণেল সা নওয়াজ, (২) গান্ধী ব্রিগেডে, ছিল ২৮০০ সৈন্য, ইহার নেতা ছিলেন কর্ণেল কিয়ানী (৩) আজাদ ব্রিগেডেও ছিল ২৮০০ সৈন্য। এই তিনটি ব্রিগেডের পশ্চাতে ছিল নেহরু ব্রিগেড সেখানে নেতা ছিলেন গুরুবক্স সিং ধীলন। আরও স্থির হয় যে সেনাবাহিনী ব্রহ্মপুত্রের তীরে উপস্থিত হইলেই নেতাজী সুভাষচন্দ্র স্বয়ং আসিয়া যুদ্ধ পরিচালনা করিবেন।

১৮ই মার্চ্চ (১৯৪৪) তারিখে ভারতীয় বীরগণ ভারত ব্রহ্মসীমান্ত অতিক্রম করিয়া পবিত্র ভারত ভূমিতে প্রবেশ করে। এবং ক্রমে টামু হইয়া মণিপুরের অধিত্যকায় প্রবেশ করে ও নাগাহিল আক্রমণ করে—ভারতীয় সৈন্যগণ অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শন করে এদং মোরাই ও কহিমার উপত্যকার ব্রিটিশ বাহিনীকে এপ্রিল মাসে পরাজিত করিয়া মণিপুরে উপস্থিত হয় এবং ইম্ফল আক্রমণ করে।

এখানে ভারতীয় সৈনিকগণ এমন বীরত্ব প্রদর্শন করিতে থাকে যে সকলেরই বিশ্বাস হয় সমগ্র মণিপুর অধিকৃত হইবে এবং পরে মণিপুরের সৈনিকগণ সহ সুভাষ আসাম ও চট্টগ্রাম আক্রমণ করিবেন। আর সেখানকার ভারত-বাসীগণ সমস্বরে সুভাষচন্দ্রের জয়ধ্বনি করিবে। সব স্থির, সাফল্য প্রায় জয়মাল্য পরাইয়া দিবার উপক্রম করিয়াছে, কিন্তু হঠাৎ বাদ সাধিলেন স্বয়ং প্রকৃতি দেবী। এপ্রিল মাস হইতেই এমন প্রবল বর্ষা আরম্ভ হইল যে সৈন্যগণের যাতায়াতের সম্ভাবনা রহিল না, সরবরাহ বন্ধ হইয়া হইয়া গেল, বিমান সাহায্য পাওয়া অসম্ভব হইল। সুতরাং বাধ্য হইয়াই নিতান্ত অনিচ্ছায় ভারতীয় সৈন্যগণকে পশ্চাদপসরণ করিতে হইল।

এই সময় তাহাদের খাদ্যাভাব হইত, ঘাস খাইয়া পর্য্যন্ত তাহারা জীবন

ধারণ করিয়াছে. তথাপি এই বীর সৈনিকগণের মনোবল কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। বস্তুতঃ ভারতীয়গণ স্বল্প অস্ত্র লইয়া খাদ্যাভাবে অসুবিধা ভোগ করিয়া, রণ-সম্ভার যথাসময়ে না পাইয়াও যেরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া কয়মাস যুদ্ধ করিয়াছে, তাহাতে স্বাধীনতার নূতন ইতিহাস রচিত হইবে। এই দুঃসময়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র ১৪ই আগষ্ট এক মর্ম্মস্পর্শী ঘোষণা করেন :—

"এত অসুবিধা, দুঃখকষ্ট, বিপদ বরণ করিয়া আপনারা যে ইতিহাস রচনা করিলেন তাহাই হইবে ভবিষ্য মুক্তি বাহিনী সৈনিকগণের অপূর্ব্ব আদর্শ।"

এদিকে উত্তর বার্ম্মার পথে ইংরাজগণ বার্ম্মার আওঙ্গসানের ফ্যাসিষ্ট বিরোধী দলের সহায়তাক্রমে বার্ম্মা আক্রমণ করিল। জাপান চারিদিকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া তোয়াঙ্গু লাইনে আর প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইল না, তাই ইংরাজকে বার্ম্মা-দেশে বাধা না দিয়া অন্য দিকে রওনা হইল, মিত্রশক্তি প্রায় পেগুতে আসিয়া পড়ায়, রেঙ্গুনও পরিত্যাগের সঙ্কল্প করিল। সুভাষচন্দ্রও ২৪শে এপ্রিল (১৯৪৫) রেঙ্গুন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। যাইবার পূর্ব্বে 'ঝান্সির রাণী বাহিনী"র মেয়েদের সব ব্যবস্থা করিয়া যান। বার্ম্মী মেয়েদের বাড়ী পাঠাইয়া দেন, ও শ্যাম ও মালয়ের কয়েজনকে তাহার সঙ্গে পোনরখানি লরীতে করিয়া লইয়া যান। রাসবিহারী বসু ইতিপূর্ব্বে ১৯৪৫, ২১ জানুয়ারী গতাসু হন।

যে সমস্ত ভারতবাসী রেঙ্গুনে ছিল, ইংরাজ আসিলেই তাহাদের উপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার হইতে পারে বা ইতিমধ্যে গুণ্ডারা সমস্ত লুণ্ঠন করিয়া ও মারধর করিয়া না নেয়, তজ্জন্য সুভাষচন্দ্র ৬০০০ আজাদ হিন্দ সৈন্য বার্ম্মায় রাখিয়া যান। ব্রহ্মদেশ পরিত্যাগের সময় তিনি সকলকে সম্বোধন করিয়া বলেন :—

"বৎসরাধিক হইতেই বর্ম্মাদেশে অনেকবার আপনারা যুদ্ধক্ষেত্রে সাহস শৌর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন, বীরের ন্যায় শত্রুর সঙ্গে সংগ্রামে রত রহিয়াছেন এখনও করিতেছেন কিন্তু আজ হৃদয়ে গভীর মর্ম্মবেদনা লইয়া আমাকে এই দেশ হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইতেছে। বন্ধুগণ, স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম পর্ব্বে আমরা জয়লাভে সফলকাম হইনাই সত্য, কিন্তু ইহা প্রথম পর্ব্বই। আমাদের এখনও

অনেক কাজ অসমাপ্ত আছে, অনেক যুদ্ধ আমাদের লড়িতে হইবে। সম্মুখে এখনও আমাদের দুস্তর পথ। সুতরাং ইহাতেই হতোদ্যম হইবার আমাদের কিছুই নাই। কোন অবস্থায়ই পরাজয় আমার নাই, উহার নৈরাশ্যও নাই, জয়ের আশায় আমার বক্ষ সর্ব্বদাই স্ফীত। সুতরাং জয়ের আশায়ই আবার আমি শত্রুর সম্মুখীন হইব। আপনাদেরও নিরাশ হইবার কিছুই নাই। আপনারা প্রকৃত যোদ্ধা, আপনারা সত্যই জয়ী। জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রাম আপনারা লড়িয়াছেন—ইম্ফলের সমতল ভূমিতে, আরাকানের পাহাড় জঙ্গলে, বার্ম্মাদেশের তৈলখনি অঞ্চলেও অন্যান্য স্থানের যুদ্ধক্ষেত্রে যে অতুলনীয় বীরত্ব আপনারা প্রদর্শন করিয়াছেন, অগণিত শত্রুর বিরুদ্ধে অপর্য্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্রেও যে প্রশংসনীয় রণকৌশল আপনারা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সত্যই অপূর্ব্ব, জগদ্বাসী মুগ্ধ নয়নে তাহা নিরীক্ষণ করিতেছে, আর সর্ব্বকালে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে, স্বর্ণাক্ষরে তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

"বন্ধুগণ—

আজ এই সঙ্কট সময়ে আপনাদিগকে দেওয়ার একটী মাত্র আদেশ আছে—সেই আদেশ এই যে যদিচ সাময়িকভাবে আপনারা পরাজিত, কিন্তু পরাজয়েও যেন আপনাদের বীরত্বের বিন্দুমাত্র লাঘব না হয়। যুদ্ধ করিয়াছেন আপনারা বীরের ন্যায়, জয়লাভ করিলেও বিনয়ী হইতে হইত আপনাদিগকে বীরের ন্যায়, আর এই সাময়িক পরাজয়েও বীরের ন্যায়ই সুশৃঙ্খলাভাবে সেই পরাজয় মানিয়া লইতেও যেন আপনারা বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ না করেন। পরাজয়েও যেন আপনাদের গৌরব ও শৃঙ্খলাশক্তির বিন্দুমাত্র লাঘব না হয়। আপনাদের এই মহান ত্যাগের ফলেই আপনাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা কখনও দাসত্ব স্বীকার করিতে জন্মগ্রহণ করিবেন না, জন্মগ্রহণ করিবে স্বাধীন বীরের ন্যায়! তাহারা আপনাদের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদানে জগদ্বাসীর সমক্ষে সগৌরবে ঘোষণা করিবে যে কতবড় মহিমান্বিত বীরপুরুষগণের বংশধর তাহারা, যাহারা মণিপুর আসাম ও বর্ম্মায় যুদ্ধ করিয়াছিল বীরের ন্যায়, কিন্তু যদিও তাহাদের বিরাট

অভিযান জয়লাভে সমর্থ হয় নাই কিন্তু সেই পরাজয়ই তাহাদের (ভবিষ্য বংশধরের) গৌরব ও সাফল্যের পথ সুগম করিয়া দিয়াছে। আমার সম্বন্ধেও আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করিতেছি যে, যে শপথ আমি ২১শে অক্টোবর নিয়াছিলাম, ৩৮কোটি নরনারীর দুঃখকষ্ট, দাসত্ব মোচনের জন্য যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম তাহা, যেপর্য্যন্ত মৃত্যু আসিয়া কেশস্পর্শ না করে, আমি অবিচলিত ভাবে পালন করিয়া ভারতের স্বাধীনতার জন্য অবিশ্রান্ত সংগ্রাম চালাইব। উপসংহারে আমার নিবেদন এই আপনারাও মন হইতে সংশয় বিদূরিত করিয়া আমার মত আশা পোষণ করুন, দেখিবেন অন্ধকারাচ্ছন্ন অমানিশার অবসানেই উষালোক! ঐ অরুণোদয় হইয়াছে, উষার দিব্য আলোকে নয়ন উদ্ভাসিত। ভারত নিশ্চয়ই স্বাধীন হইবে, নিশ্চয়ই অচিরেই হইবে—ভগবান আপনাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন। আপনাদের হৃদয়ে বল দিওন্। ইনক্লাব জিন্দাবাদ,আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ, জয়হিন্দ।

"ভারতের স্বাধীনতা লাভ সম্বন্ধে আমার অদম্য বিশ্বাস আজও অটল রহিয়াছে। আপনাদের যোগ্য হস্তেই আমি আমাদের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা, আমাদের জাতীর সম্মান, প্রবাদের ন্যায় ভারতীয় বীরগণের কীর্ত্তি-কাহিনী ন্যস্ত করিতেছি। আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে আপনারা ভারতের মুক্তিবাহিনীর অগ্রদূত হিসাবে আপনাদের সর্ব্বস্ব, এমনকি জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়াও ভারতের জাতীয় সম্মান রক্ষা করিবেন, যেন আপনাদেরই অপরাপর সঙ্গীগণ যাহারা অন্যত্র যুদ্ধকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন, আপনাদের জ্বলন্ত আদর্শে তাহারাও বীরের ন্যায় যুদ্ধ চালাইতে অনুপ্রাণিত হয়েন।

"আমার নিজের ইচ্ছায় চলিতে পারিলে আপনাদের সঙ্গে থাকিয়া সমভাবে বর্ত্তমান বিপদ ও সাময়িক পরাজয়ের গ্লানির অংশ গ্রহণ করিতাম, কিন্তু আমার উর্দ্ধতন সামরিক কর্ম্মচারীগণের ও মন্ত্রীগণের পরামর্শে স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিচালনার জন্য আমাকে অন্যত্র যাইতে হইতেছে। আমি আমার স্বদেশস্থ পূর্ব্ব এসিয়ার ভারতীয়গণের মনোভাব সম্পূর্ণ অবগত। তাই দ্বিধাহীন চিত্তে আপনাদিগকে আশ্বাস দিতেছি যে সর্ব্বাবস্থায়ই আপনারা স্বাধীনতার সংগ্রাম

চালাইয়া যাইবেন, সকলে দেখিবে যে আপনাদের মহাত্যাগ ও দুঃখকষ্ট কিছুতেই নিস্ফল হইবে না।

রেঙ্গুন হতে মৌলমীন হইয়া নেতাজী যান ব্যাঙ্ককে, তারপর জুনের প্রথমভাগে যান মালয়ে। কিন্তু তখন যুদ্ধ করিতে হয় নাই বটে, কিন্তু অবশিষ্ট সৈনিক গণের ও মহিলা সেবিকাগণের সুবিধা স্বচ্ছন্দ বন্দোবস্ত করিবার আগে নিজের জন্য তিনি কিছুই করিতেন না। সৈন্য সংগঠন ও পরিচালনেও যেমন ছিলেন অকুতোভয় ও অক্লান্ত কর্ম্মী, আর সর্ব্ব বিষয়ে নেতা, বিপদেও ছিলেন আবার তাহাদের প্রধান সহায়। জুন হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত মালয়ে আজাদহিন্দ ফৌজের বিক্ষিপ্ত বাহিনী পরিদর্শন করাও তাহাদের সুখশান্তির বিধান করাই ছিল তাহার সর্ব্বপ্রধান কাজ। নেতাজী যখন এইরূপ কার্য্যে ব্যস্ত, লর্ড ওয়াভেলের সভাপতিত্বে সিমলার বৈঠক হয়। উহা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত যওয়ায় তাঁহার আনন্দের পরিসীমা ছিল না। ক্রীপস প্রস্তাবের উহাই যে দ্বিতীয় সংস্করণ, তাহা সকলেই জানেন।

অতঃপর ১৬ আগষ্ট (১৯৪৫) তিনি বিমান যোগে সিঙ্গাপুর হইতে রওনা হইয়া ব্যাঙ্ককে আসেন। সেখান হইতে সকলে বিমান যোগে রওনা হন্। নেতাজী কর্ণেল হবিবুর রহমানকে লইয়া বিমান যোগে টোকিও যাত্রা করেন। বিমান-খানি কিসের আঘাত পাইয়া পাহাড়ে পড়িয়া যায় ও আগুন লাগে। হবিবুর রহমান নেতাজীকে জ্বলন্ত মোটর হইতে টানিয়া বাহির করেন। উভয়েই খুব আহত হন। নেতাজীর মাথায় খুব আঘাত লাগে, তিনি অজ্ঞান হইয়া যান। পরে দুই জনেই হাসপাতালে স্থানান্তরিত হন। ইহার পর নেতাজীর সম্বন্ধে

---

* একবৎসর পূর্ব্বে ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৪—যতীন দাসের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে নেতাজী যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে একটি কথা বড় উল্লেখযোগ্য ছিল—

"তুম হাম্‌কো খুন দো
মেয় তোম্‌কো আজাদী দেওঙ্গী"

২৮শে সেপ্টেম্বরে তিনি ডাক্তার বা, ম, বর্ম্মার গভর্ণর সহ স্বাধীন ভারতের শেষ নরপতি বাহাদুর শার সমাধিক্ষেত্রে শ্রদ্ধার্পণ ও মাল্যদান করেন।

হবিবুর রহমানের উক্তি ভিন্ন বিশ্বাসযোগ্য কিছু পাওয়া যায় না। হবিবুর রহমন বলেন নেতাজীর দুর্ঘটনার পরে ৬।৭ ঘণ্টামধ্যেই প্রাণবিয়োগ হয়। তিনি পণ্ডিত জওহরলাল ও মহাত্মাজীর কাছেও এইরূপই বলিয়াছেন। যদি পূর্ব্ব ব্যবস্থা মত হবিবুর একথা বলিরা থাকেন, তবে মৃত্যু হইয়াছে এমন বিশ্বাসযোগ্য কোন প্রমাণ নাই। হবিবুর সত্যও বলিতে পারেন, আর পূর্ব্ব বন্দোবস্ত মত এরূপ অলীক কাহিনীও বিবৃত করিতে পারেন। সুতরাং সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে একথা আমাদের বিশ্বাষ হয় না। আমাদের আশা আছে তিনি আবার আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইবেন। ভগবান করুণ, আমাদের আশা যেন অপূর্ণ না থাকে। সুভাষচন্দ্র যে লোকেই থাকুন, তিনি আমাদের কাছে অমর। আজ আমরা সকলেই যুক্তকরে এই নিবেদন করি—

"হে বীরশ্রেষ্ঠ ভারত গৌরব সুভাষচন্দ্র, তুমি যে বীরত্ব দেখাইয়াছ তাহাতে বাঙ্গালীকে কোন জাতি উপহাস করিয়াও ভীরুতা আরোপ করিতে পারিবে না, তুমি যে যুদ্ধ করিয়াছ, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কেহ তাহা করে নাই। তুমি যে সাহস ও অকুতোভয়তা প্রদর্শন করিয়াছ, পৃথিবীর ইতিহাসেও এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। তোমার-ই-জাতীয়তার গুরু, 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রসিদ্ধ, অপ্রমেয় ত্যাগব্রতপূত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তোমাকে পাইয়া যে আশা পোষণ করিয়াছিলেন, 'যাও বীর যুদ্ধ কর' বলিয়া যে নির্দ্দেশ তোমায় দিয়াছিলেন, তুমি সর্ব্বদিক্ হইতে অক্ষরে অক্ষরে তাহা পালন করিয়াছ, গুরুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিষ্যের কাজ করিয়াছ, ভারতমাতার যোগ্য সন্তানের পরিচয় দিয়াছ। জীবনে মরণে তুমি ভারতীয় যুবকগণের আদর্শ হইয়া থাক, তোমার বীরত্বগাথা সকলের কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হয়, ভারত মাতা আবার তোমার ন্যায় বীর সন্তানের প্রসূতা হন, দীনের ইহাই একমাত্র প্রার্থনা—

বন্দে মাতরম্

তৃতীয় অধ্যায়

আজাদহিন্দ মোকদ্দমা ও ছাত্র-শহীদ

আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বিদেশে বিপাকে ভারত-মাতার স্বাধীনতার জন্য আপ্রাণ এবং সর্ব্বশক্তি প্রয়োগে মৃত্যুপণে যুদ্ধোদ্যম সম্বন্ধে দেশবাসী সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত থাকিত। কেবল তাঁহার কয়েকজন অনুচর দেশে আসিয়া যাহা বলিতেন, তাহা কেহ কেহ বিশ্বাস করিত। আবার অনেকে হয়তো অতিরঞ্জিত বা অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিত। সুতরাং ঐরূপ স্মৃতিকথায় কিছুতেই ইতিহাস রচিত হইত না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে গভর্ণমেণ্ট আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈনিকবর্গের বিরুদ্ধে গুরুতর রাজদ্রোহ ও সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অভিযোগ প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়া সমস্ত অবস্থা এবং নেতাজীর কার্য্যাবলী উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট তরফ হইতে যে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি, তাহাতে প্রকৃত ঐতিহাসিকের লেখনীতে যে ইতিহাস রচিত হইবে, ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে উহা একটী গৌরবতম অধ্যায়। আমার ক্ষুদ্র লেখনীতে সামান্য পরিচয় দিতে মাত্র প্রয়াস পাইব।

কর্ণেল শা নওয়াজ, কাপ্টেন পি, কে, সাইগল ও লেঃ গুরুবক্স সিংহ ধীলন একটী সামরিক আদালতে অভিযুক্ত হন এবং দিল্লীর লালকেল্লায় তাহাদের বিচার হয়। বিচারক নিযুক্ত হন মেজর জেনারেল এ, বি, র‍্যাক্সল্যাণ্ড প্রমুখ চারিজন শ্বেতাঙ্গ অফিসার আর তিনজন ভারতীয় সামরিক অফিসার। ইহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (দণ্ডবিধি আইনের ১২১ ধারা) খুন বা খুনের সহায়তা। সরকার পক্ষে মোকদ্দমা পরিচালনা করেন স্যার নৌসীরন পি ইঞ্জিনিয়ার, আর আসামীদের পক্ষে থাকেন ভুলাভাই দেশাই, স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রু, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, মিঃ পি, কে, সেন, শ্রীযুক্ত আসফ আলী ও শ্রীকৈলাশ নাথ কাট্‌জু প্রভৃতি।

স্যার নৌসীরন ৫ই নভেম্বর (১৯৪৫) প্রাথমিক অভিভাষণে বলেন—

"মালয়, সিঙ্গাপুর, শ্যামরাজ্য ও ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থান জাপান কর্তৃক অধিকৃত হইবার পরে উক্ত সা নওয়াজ প্রমুখ কতিপয় বৃটিশ সেনানায়ক বন্দী অবস্থায় ভারত আক্রমণ করিবার জন্য বিপ্লবী বীর রাসবিহারী বসুর সহায়তায় আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন করেন। সেই সময়ে নেতাই ছিলেন রাসবিহারী বসু পরে ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে সুভাষচন্দ্র বসু মহাশয় নেতাজীর আসন গ্রহণ করেন। অতঃপরে দলে দলে ভারতীয় সৈন্যগণ এই আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগঠনে যোগদান করে এবং মার্চ্চ মাস হইতে তাহারা আরাকান, মণিপুর, কহিমা, প্রভৃতি স্থান আক্রমণ করিয়া কয়েকটি স্থান দখল করে। বর্ষার অতিবৃষ্টি হেতু এই অভিযান সেই সময়ে সাফল্য লাভ করিতে না পারিলেও পরে আবার সুযোগ মত অভিযান করা হইবে বলিয়া "নেতাজীর" আদেশে বাহিনীটিকে অপসারণ করানো হয়।"

স্যার নৌসিরণের এই বক্তৃতার পরে লেপ্টেনাণ্ট নাগের সাক্ষ্য হয়। তারপরে ২১ নভেম্বর ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত মোকদ্দমাটি মুলতুবী রাখা হয়। এই ২১ নভেম্বর তারিখটি পাঠককে বিশেষ স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি।

এই মোকদ্দমায় ভারত, জাপান এবং বিদেশ হইতেও অনেক সাক্ষী প্রমাণ উপস্থিত করা হয়। মোকদ্দমায় বোম্বাইর ভূতপূর্ব্ব এড্ভোকেট জেনারেল ও পরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর মেম্বর ভুলাভাই দেশাই মহাশয় বিশেষ মনীষা ও পাণ্ডিত্যের সহযোগে আসামীদের পক্ষে মোকদ্দমা পরিচালনা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন—

"যেই গভর্ণমেণ্ট স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে, যদি সেই গভর্ণমেণ্ট অন্যান্য স্বাধীনরাজ্য কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয়, তবে সেই গভর্ণমেণ্ট সাময়িক (Provisional) হইলেও, তাহার স্বাধীন জাতীয়ত্ব অর্জ্জিত হইয়াছে। যদিও সেই গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু তাহার কর্ত্তৃপক্ষের ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন বা অন্যকোন দেশ-বিদেশের ঘরোয়া আইনের সহায়তায় তাহাদের বিচার হইতে পারে না। কেবলমাত্র

আন্তর্জ্জাতিক আইন (International Law) অনুসারেই তাহাদের বিচার হইতে পারে।”

ভুলাভাই প্রমাণস্বরূপ দুইটি উদাহরণ দেন (১) ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগালের রাণী ডনার বিরুদ্ধে ডনমিওয়েনের অনুষ্ঠিত যুদ্ধ (২) ইটালী শাসন-শক্তির বিরুদ্ধে গ্যারিবল্ডির যুদ্ধ।

স্যার নৌসীরণের যুক্তি ছিল দুর্ব্বল। তিনি পূরাতন কথা বলিয়া উড়াইযা দিতে চাহেন। তাহার কথার অর্থ এই যে—

“ভারতীয় সৈন্যের অপরাধ আন্তর্জ্জাতিকের মধ্যে পড়েনা। যেখানে কোন রাজ্য এবং উক্তরাজ্যের প্রজা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠে এবং যেখানে সেই প্রজা সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য, সেখানে ভারতীয আইনই প্রযোজ্য।”

শ্রীভুলাভাই উত্তরে বলেন :—

“ভারতে থাকিলে সে কথা খাটে। কিন্তু ইহারা ছিল বিদেশে। যখন যুদ্ধে বন্দী হয, ইংরাজ ইহাদিগকে জাপানের করে সমর্পণ করিয়া যায। এই নিঃসহায অবস্থায জাপানীরা যাহাতে ভারত অধিকার করিতে না পারে, তাই দেশের মুক্তির জন্য ইহারা সেনাবাহিনী গঠন করিযা, অবস্থার তাড়নায পড়িযা,—ইহারা রাজার প্রতি কর্ত্তব্য ছাড়িয়া (তখন সে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবাব সুযোগ ছিল না) দেশের প্রতি কর্ত্তব্য করিতেই সঙ্কল্প করিয়াছিল। যদি ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে আমেরিকানগণ ব্রিটেনের কবলমুক্ত হইবার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করিযা নিজ দেশ স্বাধীন করিতে সমর্থ হয, তবে ইহারা ভারতের বাহির হইতে যুদ্ধ করিযা কি অপরাধ করিয়াছে?” তথাপি বিচারকগণ এই মোকদ্দমায় তিনজনকেই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত করেন। কিন্তু প্রধান সেনাপতির স্যার ক্লড্ অচিনলেকের (ভারতের কম্যাণ্ডার ইন চীফ) অনুমোদন সাপেক্ষ থাকায়, তিনি তিনজনকেই দণ্ড হইতে অব্যাহতি দেন।

এই মোকদ্দমা চলিবার সময় কাপ্তেন বারহানুদ্দিনেরও বিচার হয়। কিন্তু

ভুলাভাই বলেন চিত্রলবাসী বলিয়া ভারতে বিচার হইতে পারে না। তাহারও সাত বৎসরের দণ্ড হয়।

যে ২১ নভেম্বর তারিখে মোকদ্দমা আবার হইবার কথা হয়, সে দিন কলিকাতায় এক অভূতপূর্ব ঘটনা হয়। আমরা আগষ্ট বিপ্লবান্দোলনের ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা করিয়াছি। তাহা হইতে বুঝিতে পারি যে হিংসাত্মক কার্য্য হিংসাত্মক গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এমনভাবে চূর্ণীকৃত হয়, যে কিছু সময়ের জন্য মাথা তুলিবার সম্ভাবনা থাকেনা। তবে প্রতিরোধ যদি সঙ্ঘবদ্ধ ও নিরুপদ্রব বা অহিংসাত্মক হয়, তবে কাহারও সাধ্য নাই, তাহা দমন করিয়া রাখে। বরাবর দেখিয়াছি ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট হিংসাত্মক আন্দোলন দমন করিবার জন্য নানারূপ আইনকানুন, লাঠি, গুলি, জেল, অন্তরীণ প্রভৃতি হিংসাত্মক উপায় অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু যখনই অহিংসাত্মক আন্দোলন হইয়াছে, গভর্ণমেণ্ট নানারূপ কৌশলে উহা হিংসাত্মক কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। কারণ একবার হিংসাত্মক হইলেই আন্দোলন তাহাদের হাতের মধ্যে আসিয়া পড়ে। কিন্তু উক্ত ২১শে নভেম্বরের ঘটনায় গভর্ণমেণ্টের কোনরূপ প্রয়াস বা কৌশলই ছাত্রগণকে উত্তেজিত করিতে পারে নাই।

২১ নভেম্বর আজাদ হিন্দ ফৌজের মোকদ্দমার তারিখ বিধায় ছাত্রদের একটি শোভাযাত্রা (Students' Demonstration) হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হয় এবং তাহাতে ষ্টুডেণ্টস কংগ্রেস, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র সংসদ ও ষ্টুডেণ্টস ফেডারেশন সংশ্লিষ্ট ছাত্রগণ যোগদান করে। ইতিপূর্ব্বে নেতাজীর মধ্যম সহোদর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় দেশবন্ধু পার্কে এক বিরাট জনসভায় জ্বলন্ত ভাষায় যে উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা করেন, ছাত্রগণ তাহাতে বিশেষ উৎসাহিত হন। কেবল তাহাই নয়, আজাদ হিন্দ বাহিনীর ব্যাপারই তখন আবাল বৃদ্ধ বনিতার মুখে মুখে আলোচিত হইত। বস্তুতঃ এতদুপলক্ষে যে জাতীয়তাবোধের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা একটা প্রবল ও দুর্ব্বার বন্যার ন্যায় সমস্ত ভারতভূমিকে—এমনকি ভারতের বাহিরের

অন্যান্য স্থানও—প্লাবিত করিয়া ফেলিতে সমর্থ হয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর চেষ্টায়ই এই আজাদ হিন্দ ডিফেন্স কমিটি গঠিত হইয়াছে। আর তাঁহার, সর্দ্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল, মিঃ আসফআলী প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের বক্তৃতায় ছাত্র ও যুবকগণের মধ্যে অসম্ভব উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছে। লাক্ষ্ণৌ দিল্লী প্রভৃতির ছাত্রগণও ইতিপূর্ব্বে সভা শোভাযাত্রায় নিজেদের উৎসাহের পরিচয় দিয়াছে। এবার আসিল বাংলার ছাত্রদের পালা।

লালদিঘী (Dalhousie Square) তখনও নিষিদ্ধ স্থান (protected area) বলিয়া পরিগণিত ছিল। তবে ঐ সময়ে নিষিদ্ধ থাকিবার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ছাত্রগণই নিজেদের সভায় স্থিরীকৃত সিদ্ধান্তানুসারে ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট হইতে বাহির হইয়া ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, এসপ্লেনেড, ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট হইয়া ড্যালহৌসী স্কোয়ার বহুবাজার ষ্ট্রীট দিয়া কলেজ ষ্ট্রীটে যাইবে স্থির করে। এতদনুসারে শোভাযাত্রাটি যখন ধর্ম্মতলা হইয়া ম্যাডেন ষ্ট্রীটের মোড়ে নিউ সিনেমার সম্মুখে যায়, পুলিশ তখন তাহাদিগকে বাধা দেয়। ছাত্রগণ প্রতিহত হইয়া আর সেখানেই বসিয়া পড়ে। তাহারা অতঃপরে কয়েকজন নেতার উপদেশ চাহিয়া সাক্ষাৎলাভ প্রার্থনা করে, কিন্তু ইতিমধ্যেই ঐ নিরস্ত্র নিতান্ত সংহত, সম্পূর্ণ অহিংস ছাত্রদের উপরে গুলি বর্ষিত হয়। রামেশ্বর বানার্জ্জী প্রমুখ তিনজন ছাত্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ছাত্রগণের শোভাযাত্রা আটক হয় বুধবার অপরাহ্ন ৪টায়। পরে প্রায় দেড়ঘণ্টা তাহারা ঐ ভাবে নীরবে বসিয়া থাকে। তখন আফিসগুলি ছুটি হইয়াছে। আফিস প্রত্যাগত কেরাণীবাবুর দল এবং চতুর্দ্দিকস্থ দর্শককবৃন্দ স্থানটিকে জন-কোলাহল করিয়া তুলিয়াছে। এদিকে ট্রাম বাস বন্ধ হইয়া যাওয়ায় লোকের ভিড় ক্রমেই বাড়িয়া উঠে।

জনতা বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, কিন্তু ছাত্রগণতো উপবিষ্ট, নিতান্ত শান্ত। বাঙ্গালী ডেপুটি কমিশনার গুলি করিবার কোন কারণ পাইল না বলিয়া গুলি করিতে বিরত হয়। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ পুলিশ শোভাযাত্রীগণের মধ্যে আসিয়া

তাহাদিগকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলে—একদল থাকে পশ্চিম দিকে, একদল থাকে পূর্ব্বদিকে। ইহারা সম্মিলিত হইতে প্রয়াস পাওয়ামাত্রই তাহাদের উপরে লাঠি চালনা হয়। অনেকে আহত হয়, তথাপি তাহারা সম্মিলিত হয়। শোভা-যাত্রাটিকে হিংস্র করিবার পক্ষে শ্বেতাঙ্গ পুলিশের প্রথম চেষ্টা বিফল হয়। কিন্তু যখন ছাত্রগণের উপর লাঠি চলিয়াছিল, দূর হইতে কয়েকটি ঢিল আসিয়া পড়ে। সে ঢিল কাহারা নিক্ষেপ করে, ঠিক বলা যায় না। কোন ছেলে ছোকরা ফেলিতে পারে, কেহ ছাত্রদের উপর সহানুভূতি বশতঃ ফেলিতে পারে, আবার শত্রুপক্ষের চরও ফেলিতে পারে। যাইারাই ফেলুক, উক্ত ছাত্রগণ নিশ্চয়ই মারে নাই, কারণ তাহারা তো উপবিষ্ট, ঢিল কোথায় পাইবে? তথাপি পুলিশ বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ঐ শান্ত ছাত্র দের উপর গুলিবর্ষণ করে, আর তাহাতেই কয়েকটি সোণার প্রাণ বিনষ্ট হইয়া যায়; গুলিবর্ষণের পরে শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়, ডক্টর শ্যামাপ্রাদ মুখোপাধ্যায়, ভাইস চ্যানসেলার রাধাবিনোদ পাল, শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ভদ্রমহিলাগণ হাঙ্গামাস্থলে উপস্থিত হন। রাত্রি ১১টার সময় গভর্ণর মিঃ কেসিও উপস্থিত হন। সকলেই ছাত্রগণকে চলিয়া যাইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু ছাত্রগণ তাহাদের সঙ্কল্পচ্যুত হয় নাই। পরদিন (বৃহস্পতিবার) সকাল ৮টা পর্য্যন্ত একই ভাবে সেইখানে তাহারা উপবিষ্ট ছিল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত ছাত্রগণ যে অহিংস ও অবিচলিতভাবে ধৈর্য্য সহকারে বসিয়া রহিল, নিজেদের বুকে বুলেট উপহার পাইয়াও নির্ব্বাক রহিল, ইহাতেই মিঃ কেসি এবং সাম্রাজ্যবাদীগণ বিচলিত হইয়া পড়িলেন। সমগ্র বাঙ্গালার ছাত্রগণ অহিংসভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হইলে গভর্ণমেণ্ট যে অচল হইতে বাধ্য, কেসি ইহা বুঝিলেন বলিয়াই ইঁহার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। কেসির সঙ্গে মহাত্মাজীর সাক্ষাৎ ও ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গে মহাত্মাজীর কথোপকথন ঘটনা পরম্পরায় হইলেও, উক্ত ঘটনার প্রত্যক্ষ ফল স্বরূপ যে হইয়াছে এই বিষয়ে মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

এই গুলিবর্ষণ এমনই নৃশংস যে, বহু ইংরাজ ও আমেরিকানও জিজ্ঞাসু হন—

"নিরস্ত্র নিরীহ শোভাযাত্রীগণের প্রতি পুলিশের গুলিবর্ষণ কি কাহারও অনুমোদিত ?"

কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আজাদও বলেন—"এইরূপ শোভাযাত্রা করিয়া ছাত্রগণ কিছু অন্যায় করে নাই—**They were justified in taking procession as a protest against,—I. N. A. Trial".** কিন্তু ঐ দিন (বৃহস্পতিবার ২২শে) আবার ১টার সময় ড্যালহৌসী স্কোয়ারের দিকে শোভাযাত্রাটি আসে; এবার লোকসংখ্যা হয় প্রায় দুইলক্ষ। পুলিশ প্রথমে দুই একবার গুলি করে, তারপরে অজ্ঞাত কারণে পুলিশ বাহিনী অপসারিত হইয়া যায়। ছাত্রদের সেই বিপুল জনতা ড্যালহৌসি স্কোয়ার হইয়া কলেজ ষ্ট্রীট হইয়া প্রতিজ্ঞা অটুট রাখিতে সক্ষম হয়। পরে সেই জনতা নিহত রামেশ্বর ব্যানার্জ্জীর শবানুগমন করিয়া কেওড়াতলায় উহার দাহকার্য্য সমাপন করে। সর্ব্বত্রই তাহারা ছিল সংহত ও অহিংস।

এই বৃহস্পতিবার ২২শে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানহমূহে যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত হরতাল হয়, তাহা নিতান্তই উল্লেখযোগ্য। ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি গাড়ী, রিক্সা, সাইকেল সর্ব্বপ্রকার যানই বন্ধ হইয়া যায়, দোকানপাট, স্কুল আফিস থিয়েটার সিনেমা সবই বন্ধ ছিল। এই সবই বুধবার রাত্রির শ্বেতাঙ্গ পুলিশের অত্যাচার হেতু স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিক্ষোভের অভিব্যক্তি। দুই এক স্থানে ট্রাম পোড়ান প্রভৃতি অনাচারও হয় বটে, কিন্তু নেতৃবৃন্দ বুঝাইয়া তাহা বন্ধ করিয়া দেন। কিন্তু একটি অত্যন্ত শোকাবহ ঘটনা ঘটে। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী শান্তি স্থাপন উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া নিহত হন। জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী শান্তিবার্ত্তা ও সেবার কাজই করিয়া বেড়ান, কিন্তু পুলিশের অবিমৃশ্যকারিতায় ও দোষী নির্দ্দোষী নির্ব্বিশেষে গুলি চালাইবার জন্যই এই নিদারুণ অনর্থ ঘটে।

আজাদ হিন্দের ইতিহাসের বর্ণনায় এই ছাত্র আন্দোলন সমধিক ভাবে উল্লেখনীয়। তখন আজাদ হিন্দ ব্যাপার লইয়া জাতীয়তার শ্রেষ্ঠ নেতৃগণ খুবই ব্যস্ত ছিলেন। এবং ছাত্র সংহতিও তাহাদের কাছে উপেক্ষণীয় বলিয়াই

মনে হইয়াছিল। তবে জাতীয় ইতিহাসে ছাত্রগণের এই অবদান সর্ব্বথা স্বীকার্য্য হইলেও পরিতাপের বিষয় নেতৃবৃন্দ এতবড় শক্তির সুবিধা গ্রহণ করিতে কোনরূপ প্রয়াস পান নাই। উহা কাজে লাগাইতেও কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই।

চতুর্থ অধ্যায়

নৌ-বিদ্রোহ

১৯৪৬ সালের নৌ-বিদ্রোহ ও 'কুইট' ইণ্ডিয়ার অন্য এক অধ্যায়।—বহুদিন হইতে ভারতীয় পদাতিক সৈন্য এবং নৌ-সৈন্যগণের মধ্যে অসন্তোষের মাত্রা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। পূর্ব্বে ইহাদিগকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া সামরিক বাহিনীতে টানিয়া আনা হইয়াছিল। যুদ্ধাবসানে সব আশ্বাসই ভা'ওতায় পরিণত হইল। সাদা কালোর পার্থক্য নৌসৈন্যগণ বড় বেশী পরিমাণে অনুভব করিতে লাগিল। অনেক সময় তাহাদিগকে কুলীর ন্যায় ব্যবহার করা হইত. কোন কোন শ্বেতাঙ্গ তাহাদিগের 'কুলির বাচ্চা' বলিয়া গালিও দিত। খাদ্য সম্পর্কে তো জঘন্য রকমের পার্থক্যই বিদ্যমান ছিল।

১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রথমে দুই একটি কেন্দ্রে ধর্ম্মঘট আরম্ভ হয়। ক্রমে উহা বহু কেন্দ্রে ছড়াইয়া পড়ে। বোম্বাই সহরে ধর্ম্মঘটকারীদের একটি বিরাট শোভাযাত্রা হইল। ধর্ম্মঘটকারীদের দখলে যে সমস্ত লরী ছিল, তাহার উপরে কংগ্রেস, লীগ ও কিষাণ মজদুরদের বিভিন্ন পতাকা উড়াইয়া দেওয়া হইল। বিক্ষুব্ধ জনতা মাঝে মাঝে সংযমের সীমাও অতিক্রম করিয়া ফেলে। কোন কোন শ্বেতাঙ্গ পুলিশ ও সৈনিক আক্রান্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক শোভাযাত্রা ও হরতাল আরম্ভ হয়, পুলিশও বাধা দিতে থাকে। ক্রমে দেখা গেল নিবসত ও কলবাদেবী প্রভৃতি অঞ্চলে ট্রাম বাস ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। রাস্তা বন্ধ করা

হইয়াছে, সরকারী আফিস দোকানপাট লুন্ঠিত হইয়াছে। ক্রমে সমস্ত নৌ ঘাঁটিতে ধর্ম্মঘট হইল এবং সহানুভূতিপূর্ণ অনেক স্থানের বৈমানিকেরাও তাহাতে যোগ দিল। কলিকাতার নৌশিক্ষাকেন্দ্র ও নৌসৈন্যেরাও এই ধর্ম্মঘটে যোগদান করে। মান্দ্রাজেও কিছু হইল, আর ব্যাপকভাবে হইল করাচীর নৌঘাঁটিতে। 'হিন্দুস্থান" জাহাজের সৈন্যরা একেবারে সরাসরিভাবে দাবী করিয়া বসিল, সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে তাহাদের দাবী মানিয়া না নিলে সৈন্যদের উপরে তাহারা গুলি চালাইবে। অমনি সামরিক পুলিশ তাহাদের উপর গুলি চালাইতে লাগিল, তাহারাও প্রত্যুত্তর দিতে বিরত হইল না ঃ

২১শে ফেব্রুয়ারী নৌসৈন্যেরা বিদ্রোহ করিয়া অনেকগুলি জাহাজ জখম করিয়া ফেলিল। ঐ তারিখেই রাত্রে ব্রিটিশ সরকারের প্রধান মন্ত্রী এট্‌লি বিবৃতি দেন ঃ "বৃটিশ নৌবহরের কতকগুলি জাহাজ বোম্বাই অভিমুখে রওনা হইয়া গিয়াছে। আর ভারতের প্রধান নৌ-সেনাপতি গড্‌ফ্রে একেবারে সোজাসোজি ধর্ম্মঘটিদিগকে বিদ্রোহী বলিযা ঘোষণা করিলেন আর ভয়ও দেখান যে বিদ্রোহ দমনে তাহারা কোনরূপ শৈথিল্য করিবে না, এমনকি আবশ্যক হইলে ইহাদের দণ্ড স্বরূপ তাঁহাদের ভারতীয় নৌবহর ধ্বংস করিয়া ফেলিতেও দ্বিধাবোধ করিবে না। অতঃ পরেই জঙ্গী বিমান ও টহলধারী বিমানের আমদানী হইল, ভাযতীযগণও অলস হইয়া বসিয়া রহিলেন না। ২১শে ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে উভয় পক্ষে অবিশ্রান্ত গোলমাল চলিতে লাগিল। ফলে ভারতীয়গণের মধ্যে ৬৯টি ব্যক্তি প্রাণ হারাইল আর প্রায় ৬০০ ছয়শত আহত হইল। এই বিক্ষোভে বোম্বাই সহরের সর্ব্বশ্রেণীর লোক যোগদান করিলে—বহুস্থানে অনেক ব্যক্তি হতাহত হইল। একদিকে জনতা অন্যদিকে পুলিশ ও কর্ত্তৃপক্ষ একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের পরামর্শে ভারতীয় নৌ-সৈন্যগণ আত্মসমর্পন করিল বটে, কিন্তু আগষ্ট বিপ্লবের ও ২১ নভেম্বরের মতই গভর্ণমেণ্ট বুঝিতে পারিল তাহাদের বড় সাধের, এত গর্ব্বের বৃটিশ শাসন-সৌধ এমন ভীষণভাবে বিকম্পিত হইয়াছে যে, উদ্ধারের ভরষা বড়ই কম।

উপসংহার

উপসংহারে আমরা এই বলিতে পারি ভারতীয় কংগ্রেসই মূলতঃ—আমাদের স্বাধীনতা অর্জ্জনের পক্ষে প্রধান প্রতিষ্ঠান, কিন্তু তাই বলিয়া কংগ্রেস বহির্ভূত আন্দোলন গুলির গুরুত্ব আমরা যদি লাঘব করিতে চেষ্টা করি বা উক্ত আন্দোলনের বীরগণের উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হই, তাহাহইলে জাতির প্রকৃত ইতিহাস উপস্থিত করা হইবে না বলিয়া আমার বিশ্বাস। এই হিসাবেই মহারাজা নন্দকুমার, ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মী বাই, টিকেন্দ্রজিত, শ্রীঅরবিন্দ, বারীন্দ্র, উল্লাসকর, পুলিনবিহারী, প্রফুল্ল, ক্ষুদিরাম, কানাই, সত্যেন্দ্র, রাসবিহারী যতীন্দ্রনাথ, ধিঙ্গরা, পিংলে, কর্ত্তার সিং, নলিনী বাগচী, রাজেন্দ্র লাহিড়ী, ভগতসিং, যতীন দাস, সূর্য্যসেন, প্রভৃতি অগণিত শহীদ এবং সর্ব্বোপরি শিবাজীর ন্যায় স্বাধীনতাকামী নেতাজী সুভাষচন্দের উপযুক্ত স্থান নির্ণয়ে যদি পশ্চাদ্‌পদ হই, বা সঙ্গত প্রচেষ্টায় বিরত হই—তবে জাতির পক্ষে কৃতঘ্নতা ও অজ্ঞতার চরম নিদর্শন হইবে। আজ স্বাধীনতা লাভের সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠানে এই সমস্ত বীর শহীদ এবং অপরাপর যাবতীয় শহীদগণের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়া ভারতের যুবকবৃন্দ যেন তাহাদের সাহস ও দেশভক্তি লইয়া সর্ব্বত্র বন্দিত হয়, যেন সৎকার্য্যে মৃত্যুভয় উপেক্ষা করিতে তাহারা সর্ব্বদা অনুপ্রাণিত হয়, স্বাধীনতারক্ষা-কল্পে অকুতোভয় হইয়া যেন তাহারা আক্রমণকারীর সম্মুখীন হয়, আজ শুভদিনে দীনের তাহাই ঐকান্তিক প্রার্থনা।